ছবি : সুধীর মৈত্র

উপন্যাস

মোক্ষ

রূপক সাহা

ভোর বেলায় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল রাজার। কোথায় যেন ফ্যাচ করে একটা শব্দ হল। তারপরই পোড়া পোড়া গন্ধ। ইলেকট্রিকের তার পুড়লে গন্ধটা যেমন হয়। চোখ খুলে ও দেখল, মাথার উপর পাখাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফের বোধহয় লোডশেডিং হল। বৃন্দাবনে এই গরমের সময়টায় দিনে পাঁচ সাতবার লোডশেডিং হয়। একেকবার ঘন্টা খানেকের জন্য কারেন্ট চলে যায়। গা সওয়া হয়ে গেছে। বিরক্তিতে রাজা পাশ ফিরে শুল। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আরও ঘন্টাখানেক ঘুমোতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে লাগত। কিন্তু আর একটু পরেই এমন ঘাম হবে, বিছানায় পড়ে থাকা যাবে না।

পাশ ফিরে টেবলের দিকে তাকাতেই রাজা দেখতে পেল, ঘড়িতে প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। মাম্মি বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে উঠে পড়ত। মাম্মির সব কিছু একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। ঠিক চারটের মধ্যেই উঠেই স্নান। পাঁচটায় গোবিন্দ জিউর বিগ্রহের সামনে বসে পুজো আচ্চা। চলে ঘন্টা খানেক। তারপরই মাম্মি চলে যায় রঙ্গনাথজির মন্দিরে। বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। মন্দির প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসার সময় গো-সেবা করে আসে। এর মধ্যে বাড়ির অন্যরাও উঠে পড়ে। নবীন ভাইয়া আর সঙ্গীতা ভাবি স্নান আর পুজো সেরে নেয়। এ বাড়িতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর বিছানায় পড়ে থাকাটা অপরাধ। বড়রা তো বটেই, এমন কী দু'বছরের ভাতিজা সমীরও উঠে পড়ে। তখন থেকে ভাবির পাশে ঘুরঘুর করে সারাক্ষণ।

মাম্মি অবশ্য আজ বাড়িতে নেই। সপ্তাহ খানেক আগে কলকাত্তায় গেছে। ছোড়দির শ্বশুর বাড়িতে। ছোড়দির বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক বিয়ের পর এই প্রথম মাম্মি ওখানে যাওয়ার সময় পেল। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, ছোড়দির বিয়ে কলকাত্তায় হোক। বড়দিদির শ্বশুর বাড়ি দিল্লিতে। বড়দিদিও অনেক চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয়।

এখানকার লক্ষীনারায়ণ পাণ্ডা হঠাৎ একটা সম্বন্ধ আনল। হুট করে পনেরো দিনের মধ্যেই ছোড়দির বিয়েটা হয়ে গেল। জিজাজি চাকরি করে ব্যাঙ্কে। ছোড়দি বেশ সুখেই আছে।

কাল রাতে রাজা ফোন করেছিল কলকাত্তায়। মাম্মি কবে ফিরবে তা জানার জন্য। একটা উদ্দেশ্য ছিল এর পিছনে। মাম্মি কলকাত্তায় যাওয়ার পরদিনই ও আগ্রায় গিয়ে একটা ইন্ডিকা বুক করে এসেছে। এয়ারকন্ডিশন্ড। প্রায় চার লাখ টাকার মতো লাগল। আগ্রার সেই অশোক এজেন্সি গতকাল খবর দিয়েছে, গাড়িটা যে কোনও দিন ডেলিভারি নিতে পারেন। রাজার খুব ইচ্ছে, মাম্মি যখন ট্রেনে করে আগ্রায় এসে নামবে, তখন ওই দুধ সাদা ইন্ডিকায় চাপিয়ে ও নিজে ড্রাইভ করে বৃন্দাবনে নিয়ে আসবে। নতুন গাড়িটা দেখলে সত্যি সত্যি মাম্মি চমকে যাবে। নির্ঘাত বলবে, তিনটে গাড়ি তো তোর ছিলই। আরেকটা কেন আবার কিনতে গেলি?"

তখন মাম্মিকে রাজা কী বলবে, তা ঠিক করে রেখেছে। টাকা.... মাম্মি, টাকা। জীবনে বহুত টাকা রোজগার করতে হবে। আর দু'তিন বছরের মধ্যেআমি হাফ ডজন গাড়ি কিনে ফেলব। ভাড়া খাটাব। তারপর পায়ের উপর পা তুলে বসে বসে খাব।"

গলার কাছটায় ঘাম জমতে শুরু করেছে। পিঠের দিকে বিছানা ভিজে গেছে। নাহ্, আর শুয়ে থাকা যাবে না। চিত হয়ে রাজা একবার হাই তুলল। ডিভানের পিছন দিকটায় ও একটা কুলার লাগিয়েছে। এখন সেটাও বন্ধ। উঠে প্রথমেই কুলারের সুইচটা অফ করতে হবে। পাখার হাওয়ায় ঘর ঠাণ্ডা হয় না। ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য বৃন্দাবনের প্রায় বাড়িতে এখন সস্তার কুলার। নিজের ব্যবসাটা ভাল করে জমুক। তারপর রাজা ঠিক করেই রেখেছে, পরে একটা এয়ারকন্ডিশন্ড মেশিন লাগিয়ে নেবে।

গরমের চিটপিটানিতে রাজা বাধ্য হয়েই উঠে বসল। বাড়িতে অন্যদের মতো সাত সকালে স্নান করার ধাত নেই ওর। মুখ ধুয়ে ভেজানো চানা কাপড়ের ঝোলাতে ভরে ও একটু পরেই যাবে আখড়ায়। সেই যমুনা নদীর কাছে মালধারীর কাছে রামানন্দজির আখড়ায়। তদনুরূপ জন্য। অনেকদিনের অভ্যেস। রাজার বুকের ছাতি এখন প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। হাতের গুলি কুড়ি। আখড়ার কাছেই জগন্নাথ ঘাট। বারিশ কা মৌসমে, অর্থাৎ বর্ষার মরসুমে, যমুনার জল যখন উপছে পড়ে, তখন ওই জগন্নাথ ঘাটেই ও স্নান সেরে নেয়। বছরের অন্য সময়ে যমুনা নদীতে জল থাকে না। শুকনো কাঁটা ঝোপের জঙ্গল বলে মনে হতে থাকে। মাঝে হয়তো সরু জলের ধারা চিকচিক করে। তখন জল থাকে একমাত্র কুশী ঘাটে। ওখানেই তীর্থ যাত্রীরা স্নান করে অথবা পবিত্র জল মাথায় ছিটিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে যায়। ব্রজধাম, মানে এই বৃন্দাবনে তো মন্দিরের অভাব নেই। দু'পা এগোলে একটা করে মন্দির। ধর্ম নিয়ে পাগলামিরও শেষ নেই।

মাম্মির কথা মনে হতেই রাজার মাথায় খট করে একটা চিন্তা এসে ঢুকল। আগ্রার অশোক এজেন্সির মালিক গাড়ির কাগজপত্তরগুলো সব ঠিক করে রেখেছে তো? অনেক ক্ষেত্রে ওরা কথা ঠিক রাখে না। এমনও হতে পারে, বৃন্দাবন থেকে আগ্রা—প্রায় ষাট কিলোমিটার রাস্তা ও গেল, অথচ কাগজ হাতে পেল না। অতদূর যাওয়াটা তখন বেকার হয়ে যাবে। গেল বার টাটা সুমোটা কেনার পর রাজা বেশ ভুগেছিল। এজেন্সির লোকেরা প্রায় এক মাস লাগিয়ে দিয়েছিল কাগজপত্তর দিতে। রাস্তায় নামানো গেল না, ওই ক'দিন গাড়িটা বসে রইল। দিনে দু'হাজার টাকা লোকসান। না, না আজ আখড়া থেকে ফিরেই আগ্রায় একবার ফোন করতে হবে। পাঁচ দিন আগে ড্রাফট দিয়ে এসেছে। এতদিনে গাড়ির কাগজ পত্তর তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত নিশ্চয়।

রাজা বিছানা ছেড়ে নেমে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাড়িতে দশ-এগারোটা ঘর। মাঝে বিরাট উঠোন। তার মধ্যিখানে বড় তুলসী মঞ্চ। তুলসী অর্থাৎ বৃন্দা। যার নামে বৃন্দাবন। ঘরে ঘরে তো থাকবেই। দক্ষিণ দিকে ছোট একটা মন্দির আছে। গোবিন্দজির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবা। এখানকার বাঁকেবিহারী মন্দিরের সামনে চল্লিশ বছর আগে মিষ্টির দোকান দিয়েছিলেন উনি। সেই দোকানের রসগুল্লা একটা সময় খুব বিখ্যাত ছিল। বাবার নামই হয়ে গিয়েছিল হরিদাস রসগুল্লাওয়ালে। কোনও মন্ত্রী বা সরকারি অফিসার বৃন্দাবনে কোনও কাজে এলে, রসগুল্লা কেনার জন্য প্রথমেই বাবার দোকানে লোক পাঠাতেন। সেই দোকানের টাকায় গাদি বিহারে এই বাড়ি। দোকান এখনও আছে। সেটা চালায় নবীন ভাইয়া। দোকানটা এখনও বেশ চালু।

দোকান নিয়ে অবশ্য রাজার কোনও মাথাব্যথা নেই। মথুরা ল'কলেজ থেকে পাশ করার পর কোর্টে গিয়ে বেশ কিছুদিন ও প্র্যাকটিস করেছিল। ওকালতিতে তেমন পয়সা কড়ি নেই। তাই ওর ভাল লাগল না। মথুরা কোর্টে হাজার-বারোশো উকিল। সেই তুলনায় ক্রাইম রেট কম। একটা মামলা নিয়ে কাড়াকাড়ি। তারপর উকিলদের বসার ভাল জায়গা পর্যন্ত নেই। দু'তিন বছরের মধ্যেই রাজা হাঁফিয়ে উঠেছিল।

তারপরই ও ব্যবসার দিকে ঝোঁকে। রামন রেতিতে সাহেবদের মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে রাজা একটা দোকান করেছে। ও নিজে অবশ্য বলে, শো-রুম। পাথরের মূর্তি বিক্রির। রাধাকৃষ্ণ, বাঁকেবিহারী, গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, লক্ষ্মী এইসব। বেশ ভাল বিক্রি হয়। সাহেবদের মন্দিরে যারা আসে, তারা কিনে নিয়ে যায় মূর্তিগুলো। দোকান ছাড়াও ওর কয়েকটা গাড়ি আছে। বৃন্দাবন থেকে আগ্রা, দিল্লি এমন কী, সেই গাড়ি ট্রিপ মারে হরিদ্বার পর্যন্ত। একটা অ্যাম্বাসাডর দিয়ে শুরু করেছিল। এখন লাইনটা ধরে নিয়েছে। গাড়ি খাটানোর ব্যবসা থেকে ওর মন্দ আয় হয় না। রাজার খুব ইচ্ছে, মালখণ্ডী বাজারের দিকে ও একটা জায়গা কিনবে। বড় গ্যারাজ বানাবে।

উঠোনের এক ধারে একটা টিউবওয়েল আছে। হ্যান্ডেল টিপে চোখ মুখে জল দিয়ে রাজা ঘরের দিকে এগোতেই দেখল, সঙ্গীতা ভাবি ছাদের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে আসছে। চোখাচোখি হতেই ভাবি বলল, "রাজা ভাইয়া, একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেছে।"

সঙ্গীতা ভাবি কৃষ্ণ নগরের মেয়ে। এখনও হিন্দিটা ভাল রপ্ত করতে পারেনি। ব্রজভাষা বলতে পারে না বললেই চলে। ওরা দাদা আর ভাই, যখন ব্রজভাষায় কথা বলে, তখন তা শুনে সঙ্গীতা ভাবি মিটিমিটি হাসে। এ বাড়িতে বাবা মারা যাওয়ার পর মাম্মি ছাড়া আর কেউ বাংলায় কথা বলত না। ভাবিকে পেয়ে মাম্মি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সঙ্গীতা ভাবির চোখমুখে বেশ উদ্বেগের ছাপ। সেটা লক্ষ্য করে রাজা বলল, "ক্যা হুয়া ভাবী?"

"আরে, ছাদে কাপড় মেলতে উঠেছিলাম। নীচে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সদর দরজার সামনে একটা বাঁদর মরে পড়ে আছে। কী হবে এখন রাজা ভাইয়া?"

সদর দরজা কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারল না রাজা। বৃন্দাবনে বাংলা পড়ার চল নেই। চলতি বাংলা ও বুঝতে পারে। কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই মুসকিলে পড়ে যায়। তাই জিজ্ঞাসা করল, "সদর দরওয়াজাটা কী ভাবি?"

"মেন গেট। খুলে একবার দেখো কী কাণ্ড। মরা বাঁদরটা ঘিরে আরও দশ পনেরোটা বাঁদর ওখানে বসে আছে। বেরোতে গেলেই কামড়ে দেবে। মারাত্মক অবস্থা।"

মারাত্মক কথাটার মানে মাথায় ঢুকল না। তবে রাজা বুঝতে পারল, একটা কিছু সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে। বৃন্দাবনে প্রচুর বাঁদর। ওদের অত্যাচারে রাস্তায় নিশ্চিন্তে হাঁটা যায় না। প্রায় বাড়িই গ্রিলের খাঁচায় ঘেরা। রাস্তায় কখনও কখনও লাফ মেরে এসে বাঁদর হাতের জিনিস কেড়ে নিয়ে যায়। চোখ থেকে সানগ্লাস ছিনিয়ে নেয়। খাবারের প্যাকেট হাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসা যায় না। এত অশান্তি করে, তবু বাঁদরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। ওরা আঁচড়ে কামড়ে দিলেও না। কারও দোষে বাঁদর মারা গেলে, বহুত ঝামেলা। বাড়িতে এসে চড়াও হবে পাণ্ডারা।

ভাবির কথা শুনে রাজা গেটের দিকে গেল। কী হয়েছে, আগে নিজের চোখে দেখতে হবে। নবীন ভাইয়া এখন বাড়িতে নেই। ভোর চারটে নাগাদ দোকানে গেছে। ওই সময় যমুনার ওপার থেকে যাদবরা দুধ দিতে আসে। ভাইয়া মিষ্টি বানানোর কাজ চালু করে, ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি থেকে স্কুটারে দোকানে যেতে লাগে বড়জোর মিনিট সাতেক। রাজা প্যাসেজে এসে দেখল, স্কুটারটা নেই। তার মানে বাইরে যা হয়েছে, তা ভাইয়া বেরিয়ে যাওয়ার পর।

দরজার ছিটকিনি খুলে পাল্লাটা অল্প ফাঁক করতেই রাজা দেখল, ভাবি যা বলেছে, ঠিক। মুর্দা বাঁদরটাকে ঘিরে রয়েছে একদল বাঁদর। দরজা খুলে কেউ বেরোলেই ওরা আক্রমণ করবে। ছিটকিনি খোলার শব্দে কয়েকটা বাঁদর এদিক ওদিক লাফিয়ে ইতিমধ্যেই কার্নিশে পজিশন নিয়েছে। বাড়ি থেকে এখন বেরনো মানেই অস্পাতালের দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া।

ফের ছিটকিনি দিয়ে রাজা দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে এল। এ এক অদ্ভুত মুশিবত। আখড়ায় যাওয়ার বারোটা বেজে গেল। একটু পরে ওদের সরু গলিতে লোক যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। বাঁদরদের অত্যাচার বাড়বে। আরও লোক জানাজানি হয়ে যাবে। খবর পৌঁছে যাবে রঙ্গনাথজির মন্দিরের সামনে বসা পাণ্ডাদের আড্ডায়। তারপর দল বেঁধে ওরা আসবে। কথাটা মনে হতেই টেনশন শুরু হয়ে গেল রাজার।

খবর পেলেই চলে আসবে বাঁদর সংকার সমিতি। মৃত বাঁদরের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দাহ করার জন্য ওরা কীর্তন করতে করতে যাবে যমুনার ধার পর্যন্ত। সেখানে রামায়ণ পাঠ হবে। বাঁকে বিহারীজির মন্দির থেকে খাবারের প্যাকেট নিতে হবে। নিধু বনে গিয়ে সেই প্যাকেট বিলি করতে হবে বাঁদরদের মধ্যে। ব্রজবাসি পাণ্ডাদের কয়েকজন ইদানীং খুব চটা স্থানীয় বাঙালিদের উপর। সামান্য খুঁত পেলে হাল খারাপ করে দেবে ওরা আর নবীন ভাইয়ার। কত টাকা গচ্চা দিতে হবে কে জানে? নবীন ভাইয়া ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কোনও ঝুট ঝামেলায় যায় না। সারাদিন দোকানদারি করে। সুতরাং পুরো ঝামেলা ওর কাঁধে এসে পড়বে।

সমীরকে কোলে তুলে নিয়ে সঙ্গীতা ভাবি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাঁদরটা দেখলে রাজা ভাইয়া?"

মুখ শুকনো করে রাজা ঘাড় নাড়ল। আজ সারা দিনে ওর অনেক কাজ। সব বরবাদ হয়ে যাবে, যদি না এখুনি কিছু করে। বাঁদরটা আর মরার জায়গা পেল না? এক হাত দূরে দ্বিবেদিদের বাড়ি। ডান দিকে শর্মাদের। ওখানে মরলেও তো পারত। কী দরকার ছিল ওদেরই গেটের সামনে মরার। কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ওর মনে হল, বাঁদরটা মরল কী ভাবে? এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে লাফ দিতে গিয়ে, রাস্তায় পড়ে কোনও বাঁদর মারা গেছে বলে রাজা কখনও শোনেনি। ইলেকট্রিক অথবা কেবল লাইনের তারে ঝুলতে ঝুলতে অনায়াসে ওরা লাফ মেরে এ বাড়ি থেকে সে বাড়িতে চলে যায়। হাত পায়ে যেন স্প্রিং লাগানো। তা হলে এই বাঁদরটা মরল কীভাবে? কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে বিশ্বাস হয় না। এমন নিষ্ঠুর মানুষ খুব কমই আছে এই বৃন্দাবনে।

নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই রাজা গিয়ে দাঁড়াল ছাদের ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে। মুর্দা বাঁদরটার দিকে তাকাতেই ও অবাক হয়ে গেল। বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। বাঁ হাতের লোমগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ভাল করে কয়েক মিনিট দেখে রাজা এবার মরার কারণটা বুঝতে পারল। ইলেকট্রিকের কারেন্ট। ওদের বাড়ির গেটের সামনে একটা বাত্তি লাগানো আছে। সাধারণ তার দিয়ে ঝোলানো। সেই তার ভর দিয়ে বাঁদরটা বোধহয় কার্নিশে নামার চেষ্টা করেছিল। তার ছিঁড়ে কারেন্ট খেয়েছে।

রাজার মনে পড়ল, বিছানায় শুয়ে তখন ফ্যাচ করে একটা শব্দ শুনেছিল বটে। শর্ট সার্কিট হলে যেমনটা হয়। ওই কারণেই তা হলে তখন পাখা আর কুলারটা বন্ধ হয়ে গেছিল। আসলে লোডশেডিং হয়নি। রাজা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। ভাবি উঠোনে দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল, "রাজা ভাইয়া কী হবে?"

কী করবে রাজা নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। পিছনের বাড়িতে থাকে সুনীল চৌবে। কাজ করে নগর পালিকাতে। পাড়ার লোকের আপদ-বিপদে খুব আসে। হঠাৎ ওর কথাই মনে হল রাজার। ভাবিকে বলল, "সুনীল কো বুলাউ ক্যা?"

স্বস্তি ভাবির মুখে, "হ্যা হ্যা, ওকে ফোন করে দেখো। একটা রাস্তা বাতলে দেবে।"

মাস দেড়েক আগে মোবাইল ফোন নিয়েছে রাজা। ঘরে ঢুকে মোবাইল সেটটা নিয়ে এসে ফোনে ও সুনীলকে ধরল। ক্যাতায়নী মন্দিরে যাওয়ার

জন্য সুনীল তখনই বেরিয়ে যাচ্ছিল। সব শুনে বলল, "তু ফিকর না কর। ম্যায় দো মিনট মে আতা হু।"

মেন গেট দিয়ে আসতে পারবে না সুনীল। পিছনের পাঁচিল টপকে ঢুকবে। রাজাদের বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট্ট বাগান মতো আছে। তাতে শ্বেত আকন্দ, বকুল, ইমলি এসব গাছ লাগিয়েছিলেন বাবা। বাড়িতে শ্বেত আকন্দের গাছ থাকলে সাপ ঢোকে না। একটু বড় হয়ে রাজা বাগানে বাহারি ফুলের গাছ লাগাতে চেয়েছিল। বাবা তখন লাগাতে দেননি। কী কারণে কে জানে?

গেটের বাইরে বাঁদরগুলো অশান্ত হয়ে উঠেছে। উঠোনে দাঁড়িয়েই সেটা টের পেল রাজা। গলিতে দু'তিনদিন আগে কাজ করে গেছে টেলিফোনের লোকেরা। রাস্তা খুঁড়ে লাইন বসিয়ে গেছে। অসংখ্য ইট পাথরের টুকরো সারা রাস্তা জুড়ে। বৃন্দাবনের বাঁদর অসম্ভব বুদ্ধিমান। রাগ মেটানোর জন্য দরজায় ইট পাথর ছুঁড়তে পারে। যতক্ষণ না মৃত বাঁদরের সৎকার হবে, ততক্ষণে ওরা দরজা থেকে নড়বেই না। ঘড়িতে প্রায় ছ'টা বাজে। এখনই ফেরার কথা নবীন ভাইয়ার। বেচারি কিছু না জেনেই ঢুকে পড়বে। তারপর কী হবে, রাজা আর ভাবতে পারছে না।

এই সময়টায় পুজো করে ভাবি। ঠাকুর ঘরের দিকে ভাবি চলে যেতেই পিছনের দরজা দিয়ে হাজির হল সুনীল। চট করে সব ব্যাপারটা দেখে নিয়ে ও বলল, "বাত বহুত গম্ভীর হ্যায় রাজা ভাইয়া। আপ মোবাইল ফোন দিজিয়ে। ম্যায় ওয়ার্ড মেম্বার কো সাথ বাত করু।"

গাদি বিহারের ওয়ার্ড মেম্বার হলেন মনসুখ গৌতম। তাঁর কথা এতক্ষণ মনে পড়েনি রাজার। মনে মনে ও সুনীলের তারিফ করল। ফোনে মনসুখকে ধরার চেষ্টা করছে সুনীল। সেই ফাঁকে রাজা দেখতে পেল, দু'চাকার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গলিতে ঢুকছে জমাদার। শর্মাদের বাড়িতে এখনও খাটা পায়খানা। রোজ সকালে জমাদার এসে মল পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এ পাড়ায় এখন একটাই খাটা পায়খানা। যাতায়াতের পথে দুর্গন্ধ নাকে রুমাল দিতে হয়। বার বার শর্মাজিকে বলেও খাটা পায়খানাকে ও বদলাতে পারেনি। সে জন্য শর্মাজিদের সঙ্গে ওর বার কয়েক মনোমালিন্যও হয়েছে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ।

জমাদারকে রাজা চেনে—রামলখন। মরা বাঁদরটাকে ওর গাড়িতে তুলে দিলে কেমন হয়? নিয়ে একেবারে ফেলে দেবে যমুনায়। কেউ টেরও পাবে না। এর জন্য যদি রামলখনকে কিছু দিতে হয়, তাও ভাল। কিন্তু রামচন্দ্রের অনুচরকে মলের গাড়িতে করে যমুনায় ফেলা হয়েছে, এই খবরটা যদি চাউর হয়ে যায়, তা হলে রাজা আর আস্ত থাকবে না। না, না, ও সব করার কোনও দরকার নেই। বরং সুনীলের বুদ্ধিই নেওয়া ভাল। মনসুখ ভাইয়াকে ও ফোন করছে। দেখা যাক ওয়ার্ড মেম্বার কী পরামর্শটা দেয়।

ফোনের সেটটা ফেরত দিয়ে সুনীল বলল, "রাজা ভাইয়া, মনসুখ বৃন্দাবনে নেই। মথুরায় গেছে। আমি একটা কাজ করছি। গোপীনগর কলোনিতে গিয়ে কয়েকটা বাঙালি রিকশাওয়ালাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা যে কোনও কাজ করতে পারে। দেশে-টাইশো রুপিয়া ওদের দিয়ে দিও। বাঁদরটা তুলে নিয়ে ওরা যমুনায় ফেলে দেবে।"

টাকার অঙ্কটা শুনে রাজা দমে গেল। বলল, "এত টাকা নেবে?"

"তো? কমে থোড়ই করবে। পাণ্ডাদের পাল্লায় যদি পড়তে না চাও, তা হলে এ ঝঞ্ঝাট এখনই সেরে ফেলো। শালা, ঘনশ্যামের এমনিতেই রাগ আছে আমাদের উপর। তোমার মনে নেই? সেই যে পিটিয়েছিলাম। এখন এই সুযোগ পেলে ও ছাড়বে? তোমার পাঁচ হাজার রুপিয়া খরচ করিয়ে ছাড়বে?"

ও পাড়ার একটা বাঙালি বউয়ের পিছনে লেগেছিল ঘনশ্যাম। রাস্তা ঘাটে খুব বিরক্ত করত বউটাকে। একদিন নিকুঞ্জ বনের কাছে সুযোগ পেয়ে ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। তখন বউটা বুদ্ধি করে বলে, আমার বর বাড়িতে নেই। চলো, যা করার ওখানে গিয়ে করবে। ঘনশ্যাম ব্যাটার মাথা মোটা। সত্যি ভেবে, ও বউটার সঙ্গে এ পাড়ায় চলে আসে। বাড়িতে ঢুকিয়ে বউটা তখন পাড়ার লোককে খবর দেয়। রাজারা আচ্ছা করে পিটিয়েছিল ওকে সেদিন। ঘনশ্যামের সঙ্গে ওর অবশ্য অনেক পুরনো ঝামেলা। দোকানটা করার পর থেকেই। সে কথা মনে করে এখন লাভ নেই। ও বলল, "পাণ্ডারা পাঁচ হাজার রুপিয়া খরচ করিয়ে দেবে?"

দেখো ভাইয়া, তোমাদের নেকলিজেন্সির জন্য বাঁদরটা ইলেকট্রিকিউটেড হয়েছে। ঠিক কি না? খবর দিলে, পুলিশ এসে তোমাদের হ্যারাস করতেও পারে। মানেকা গাঁধীর জমানা। কী দরকার এত ঝুশিবতে পড়ার। আমি তো বাঙালিদের খবর দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।"

সকাল সকাল টাইশো রুপিয়া বেরিয়ে যাবে, রাজার সেটা মনঃপুত হচ্ছিল না। আবার ঘনশ্যামের পাল্লায়ও পড়া উচিত হবে না। পাণ্ডারা...কী বলে প্রায়শ্চিত্ত না কী, তা করিয়ে ছাড়বে। ওদের দুটো অ্যাসোসিয়েশন। একটার সেক্রেটারি আবার ওই ব্যাটা ঘনশ্যাম। তবে পয়সা খ্যাচার বদমাইসিতে সবাই এককাট্টা। যেভাবে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে ওরা পয়সা আদায় করে, দেখলে রাগ হয়। ওইরকম একটা ঘটনার জন্যই তো ঘনশ্যামের সঙ্গে ওর ঝগড়া শুরু। সে পুরনো কথা থাক। এখন বাঁদরটার কী গতি করা যায়? সেটা ভাবা দরকার।

সুনীল উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছে। নিরুপায় হয়ে রাজা বলল, "তুই যা ভাল বুঝবি তাড়াতাড়ি কর।"

ফের পিছনের দিকের পাঁচিল টপকে সুনীল ওর বাড়িতে চলে গেল। যাক, একটা ব্যবস্থা তা হলে করা গেল। মনে মনে কথাটা বলে, রাজা ভেতরে ঢুকে এল। ঘরে ঢুকেই ওর খেয়াল হল, আরে সমীর কোথায় গেল? উঠোনে তো নেই? সর্বনাশ, ছাদে চলে যায়নি তো। একতলার ছাদে মাঝে মাঝে একা একা উঠে যায় সমীর। খুব চঞ্চল প্রকৃতির। কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে বসে না। ওকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হয়। আজ যদি ছাদে চলে যায়, নির্ঘাত বাঁদরগুলো ওকে কামড়ে আঁচড়ে একশা করে দেবে।

কথাটা মনে হওয়া মাত্রই রাজা দুড়দাড় করে ছাদে উঠে গেল। না, দরজা বন্ধ। দরজা খুলে সমীর ভেতরে যেতে পারবে না। তা হলে নীচে কোথাও আছে। নীচে নামার সময় অভ্যাস মতো বাইরের দিকে চোখ দিতে রাজা অবাক হয়ে গেল। মুর্দা বাঁদরটা ওই এক ভাবে পড়ে আছে। তবে সঙ্গীরা কেউ নেই।

আশ্চর্য, বাঁদরগুলো গেল কোথায়? চট করে ওর মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। দরজা খুলে লেজ ধরে টেনে মুর্দা বাঁদরটাকে ও যদি ভেতরে নিয়ে আসে তা হলে? নীচে চিনির অনেক ফালতু বোরা পড়ে আছে। সেই বস্তার মধ্যে বাঁদরটাকে ভরে স্বচ্ছন্দে যমুনায় ধারে ফেলে আসা যায়। কেউ টের পাবে না। অথচ টাকাটাও বেঁচে যাবে।

কথাটা মনে হতেই রাজা নীচে নেমে এল। সাহস করে কাজটা করলে মন্দ হয় না। তবে যা করার এক মিনিটের ভেতর করতে হবে। নীচে নেমে উঠোনের বাঁ দিকে ঘুরতেই ও হালকা হাসির শব্দ শুনতে পেল। সমীরের হাসি। খুশিতে উচ্ছল হলে ও এমনভাবে হাসে। দরজার দিকে না গিয়ে ও নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

জানলার সামনে বসে সমীর। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ও ভেজানো চানা ছুঁড়ে মারছে রাস্তার দিকে। আর বাঁদরগুলো হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে সেই চানা খাওয়ার জন্য। পেটের দায়, বড় দায়। মুর্দা সঙ্গীর কথা আর কারও মাথায় নেই। বাঁদরদের লোভ দেখে সমীর খুব মজা পাচ্ছে। মনে মনে ভাতিজার তারিফ করল রাজা। সাবাস বেটা। আমাদের মাথায় যা আসেনি, না জেনেই তুই সেটা করে দেখালি। ভেজানো ছোলা বাঁদরদের তুই খাইয়ে যা। কাজটা ততক্ষণে আমি সেরে ফেলি।

বস্তা হাতে খুব সন্তর্পণে ছিটকিনিটা রাজা খুলতেই চমকে গেল। বাঁদিকে গলি দিয়ে ঘনশ্যাম আসছে। এত তাড়াতাড়ি খবরটা ও পেল কী করে? নিশ্চয় পাড়ারই কেউ ফোন করে জানিয়েছে। গলিটা একেবেঁকে গেছে বলে ঘনশ্যাম এখনও খেয়াল করেনি। দুটো বাড়ি পেরিয়ে বাঁক নিলেই ও বাঁদরটাকে দেখতে পাবে। দু'তিন সেকেন্ডের বেশি সময় হাতে নেই। রাজার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। এক হ্যাঁচকা মেরে বাঁদরটাকে ও টেনে আনল দরজার ভেতরে। তারপর বস্তার ভেতরে পুরে, পিছনে সুনীলদের পাঁচিল টপকে গিয়ে ও দাঁড়াল একেবারে ভুত গলিতে।

গরমে হাঁসফাঁস করছেন বিমলা। একটু আগেই ছুটি দিয়েছেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের। কয়েক পা হেঁটে নিজের বাড়িতে ঢোকার মাঝে থেমে-নেয়ে অস্থির। গীতা তাড়াতাড়ি এসে পাখাটা চালিয়ে দিল। পাখার নীচে বসে শরীর জুড়োতে লাগলেন বিমলা। কত টেম্পারেচার হবে আজ? পঁয়তাল্লিশ? না, তার চেয়েও বেশি বোধহয়। গতকাল টিভি খবরে শুনেছেন, আগ্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ছিল। মে মাসের শেষদিকে গরম আরও বাড়বে। পঞ্চাশের কাছে পৌঁছবে বৃন্দাবনে এখন তিনটে ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত। গরম ছয় মাস। শীত তিন-চার মাসের মতো। বাকি বর্ষার মরসুম। বয়স বাড়ছে। এখন আর গরম সহ্য হয় না বিমলার। স্কুলে গরমের ছুটি দিয়েই তিনি মাস

খানেকের জন্য হরিদ্বারের দিকে চলে যান। বাপের বাড়িতে।

গীতা মেয়েটা খুব কাজের। ওকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বাড়িতে এনে রেখেছেন বিমলা। বয়স আঠারো উনিশ। ভরা জওয়ানী। বিধবা মায়ের সঙ্গে ও বৃন্দাবনে এসেছিল।

ওদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়। দু'তিন বছর আগে বন্যায় ওদের বাড়ি ভেসে গেছিল। ওরা মা-মেয়ে উঠেছিল বন্যা দুর্গতদের শিবিরে। মাস খানেক কাটানোর পর কে যেন পরামর্শ দেয়, বৃন্দাবনে চলে যাও। রাধাগোবিন্দই দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপরই ওরা এখানে চলে আসে।

প্রথমে উঠেছিল এখানকার পটনাওয়ালি কুঞ্জে। কিন্তু ওখানে পাঁচমিশেলি লোকের বাস। ও সব জায়গা থেকে গীতার বয়সী মেয়েরা আজকাল আকচার উধাও হয়ে যাচ্ছে। গীতার পিছনে খারাপ লোক লেগে গেছিল। সেটা কানে আসে বিমলার। তখন ওর মা এসে গীতাকে এখানে রেখে যায়। বেলডাঙ্গায় ও ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। কখন কী করতে হয়, জানে। এই যেমন পাখাটা চালিয়ে দিয়ে গেল। চৌকিতে বসে ব্লাউজের হুক খুলে দিলেন বিমলা। এই মুহূর্তে বাড়িতে গীতা ছাড়া আর কেউ নেই। তাই শরীরে অত রাখঢাক করার দরকার নেই। বিমলা জানেন, গীতা এখন ঠাণ্ডাই বানাচ্ছে। এক ধরনের সরবত। পুদিনা পাতা, মৌরি আর গোলাপ পাঁপড়ি দিয়ে তৈরি। শরীর ঠাণ্ডা রাখে। বরফ কুচি দিয়ে সেই সরবত ও এখুনি এনে দেবে। তারপর ফিরিস্তি দেবে, সকাল থেকে কে কে বাড়িতে ফোন করেছিল।

অনেক সময় ও ফোন নম্বরগুলো টুকেও রাখে। তাতে অনেক সুবিধা হয় বিমলার। স্কুল থেকে ফিরে সবাইকে পাল্টা ফোন করতে পারেন। বৃন্দাবনে বিমলা বাসুকে লোকে এক ডাকে চেনে। রামকৃষ্ণ জুনিয়র স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে তাঁকে যত লোক চেনেন, তার চেয়েও বেশি মানুষ তাঁকে জানেন মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে। বৃন্দাবনে প্রচুর বিধবা বাস করেন। তাঁরা খুব অসহায় অবস্থায় দিন কাটান। বিমলা বেশ কয়েক বছর ধরে এঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের কাগজগুলোতে বটেই, বিমলার বড় ইন্টারভিউ এমন কী, বেরিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসেও।

এক হাতে সরবতের গ্লাস, অন্য হাতে কর্ডলেস ফোনের সেট। গীতা সামনে এসে দাঁড়াল। চৌকির ওপর গ্লাসটা রেখে ও বলল, "মামি, লালা তোমায় ফোন করেছিল।"

বিমলা ঠিক বুঝতে পারলেন না, ফোনটা কে করেছিল। বৃন্দাবনে বাচ্চা ছেলেদের আদর করে বলা হয় লালা। ছাত্রদের সবাইকে তিনি ডাকেন লালা বলে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন "কোন লালা রে?"

"ওই যে গো, গাদি বিহারে থাকে। কালো মতন। খুব সুন্দর দেখতে।"

গীতার বর্ণনায় বিমলা হেসে ফেললেন। তবে বুঝলেন। রাজা মিত্র। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। ক্লাস এইট অবধি পড়ে গেছে। এখনও দরকার-অদরকারে ডাকলে আসে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতাদর্শে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের গড়েছেন। মহিলা আন্দোলনের জন্য কখনও টাকার দরকার হলে বিমলা এদের কাছেই হাত পাতেন। গীতাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কখন ফোন করেছিলরে ও?"

"সেই ভোরবেলায়, তুমি স্কুলে চলে যাওয়ার পর পরই।"

স্কুল শুরু হয় সেই সকাল ছ'টায়। তার মিনিট দশেক আগে বিমলা বাড়ি থেকে বেরোন। তার মানে রাজা ফোন করেছিল সোয়া ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ। অত ভোরে কী দরকার পড়ল রাজার? কোনও বিপদ হল না কি? কিছু ছাত্র আছে, যাদের সঙ্গে বিমলার পারিবারিক সম্পর্ক। রাজা তাদের মধ্যে একজন। তাই বিমলা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তখনই ফোন করে তিনি ধরার চেষ্টা করলেন ওকে। বেলা প্রায় বারোটা। রাজাকে পাওয়া যেতে পারে ওর দোকানে। কিন্তু বেশ কয়েকবার ডায়াল করেও লাইনটা পেলেন না বিমলা। তেমন জরুরি কিছু হলে রাজা অবশ্য আরেকবার ফোন করত। যখন করেনি, বুঝতে হবে গুরুতর কিছু নয়।

গীতাকে বললেন, "হ্যা রে মেয়ে, লালা ছাড়া আর কেউ ফোন করেছিল?"

"হ্যাঁ, সুষমা গৌতম।"

নামটা শুনে ভ্রূ কোঁচকালেন বিমলা। বললেন, "কী বলল?"

"কিছু বলেনি। তুমি স্কুলে আছ শুনে ফোনটা রেখে দিল।"

"ও।" বলে বিমলা শুম হয়ে গেলেন। সুষমা গৌতমকে আগে তিনি খুব পছন্দ করতেন। এখন সহ্য করতে পারেন না। মেয়েটার হ্যাজব্যান্ড মথুরার খুব নামকরা ডাক্তার। লাইফকেয়ার বলে বিরাট এক নার্সিংহোম করেছে মথুরা-বৃন্দাবন রোডের ধারে। বড়লোকের বউ। সংসারে ফোনও কাজ করতে হয় না। সুষমার হঠাৎ খেয়াল হল সমাজসেবা করবে। তখন ও প্রায়ই আসত এ বাড়িতে। বৃন্দাবনের বিধবাদের জন্য সরকারি পেনশন আদায়ের চেষ্টায় তখন বিমলা সবে আন্দোলনে নেমেছেন। সুষমা এসে সামিল হয়েছিল। পরে বিমলা বুঝতে পারলেন, মেয়েটা সুবিধের নয়। হঠাৎ একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে ও নগরপালিকা নির্বাচনে নেমে গেল। জেতার পর থেকে সুষমা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

সুষমাকে পাল্টা ফোন করার কোনও দরকার নেই। বিরক্তিটা মুখ থেকে মুছে ফেললেন বিমলা। না, এবার স্নানঘরে যাওয়া দরকার। সারা শরীর চটচট করছে। ঘাম শুকিয়ে নুন হয়ে গেছে। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে একবার স্নান করে গেছেন। এবার স্নান করে বেরিয়েই তিনি গোবিন্দজির পুজোয় বসবেন। নিত্যকারের অভ্যেস। পুজো সেরে মালা জপে ওঠার ফাঁকে এসে পড়বেন সুধাময়। তারপর স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসে আহার সেরে নেবেন।

চৌকি ছেড়ে ওঠার সময় বিমলা শুনতে পেলেন লোহার গেটে কে যেন ধাক্কা মারছে। শব্দটা বোধহয় আগেই শুনতে পেয়েছিল গীতা। রসুইঘর থেকে উঠে গিয়ে ও দরজা খুলে দেওয়া মাত্র ঢুকল ননীবালা। এখানকার সহায় সম্বলহীন বিধবাদের একজন। বয়স পঞ্চাশের কিছু কম। চুলে কদমছাঁট। পাক ধরেনি বলে বয়স আর একটু কম দেখায়। একটা সময় খুব সুন্দরী ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বৃন্দাবনে আসে। এখানে ভাল একটা ছেলে ওকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু অনেক বোঝানো সত্ত্বেও ননীবালা তখন রাজি হয়নি।

কপালে রসকলি। গলায় কণ্ঠি। পরনে সাদা থান। ননীবালাকে বেশ ঢলঢলে লাগে। দেখেই মনে হয়, একটা সময় বড় ঘরের বউ ছিল। সবথেকে বড় কথা, ও এখানকার অন্য বিধবাদের মতো নয়। লেখাপড়া জানে। ওর হাতে একটা পুঁটলি। চাতাল পেরিয়ে চৌকির কাছে এসে ননীবালা খুব সহজভাবে বলল, "মাইয়ি, এহানে থাকতে আইলাম।"

বিমলা বললেন, "কেন রে, তুই যে ঘরটা ভাড়া করেছিলি, তার কী হল?"

"ঘর থেইক্যা মুনিম আইজ বাইর কইর‍্যা দিল।"

হা করে তাকিয়ে রইলেন বিমলা। কী বলছে ননীবালা? ঘর থেকে মুনিম ওকে বের করে দিল, আর ও চুপচাপ চলে এল? সকাল সন্ধ্যা প্রচুর বিধবার যাতায়াত এ বাড়িতে। প্রায় প্রত্যেককেই তিনি নামে চেনেন। কে কোথায় থাকে, তা জানেন। এই ননীবালা ভাড়া দিয়ে থাকত শৃঙ্গারবট বলে একটা জায়গায়। পুরানা হাভেলিতে। হঠাৎ ওকে উৎখাত হতে হল কেন বিমলা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোকে একাই কি বের করে দিয়েছে? না, অন্যদেরও তুলে দিয়েছে?"

ননীবালার মধ্যে যেন কোনও তাপ উত্তাপ নেই। চাতালে বসে পড়ে বলল, "জানি না। দিলীপের বউডা কইল, মুনিম আইস্যা তোমার ঘর থেইক্যা সব ফ্যালাইয়া দিসে। নূতন ভাড়াইট্যা বসাইব।"

"তুই কি ভাড়া দিতে পারিসনি?"

"দিসি। মুনিমডা বদমাইস। দুই মাইস থইর‍্যা কইতাছিল ভাড়া বাড়াইতে অইব। কয় কী না, একশত ট্যাহার চলব না। দেড়শত দিতে অইব। কোথথন দিমু কন মাইয়ি। আমি দিমু না বইল্যা, শাসায়। আইজ পাপ্পু গোণ্ডার বহাইয়া গেসে। কয়, তরা কেউ ননীবালারে ঘরে জায়গা দিলে, তগো বাইর কইর‍্যা দিমু।"

ননীবালার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিমলা। আগে এদের কথা ঠিক বুঝতে পারতেন না। গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত এদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে এখন চট করে ধরে ফেলতে পারেন। মুনিম গুণ্ডা লাগিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে শুনে স্নান করা মাথায় উঠল বিমলার। এরা ভেবেছে কী, বিধবাদের মাথার উপর কেউ নেই? কর্ডলেসের বোতাম টিপে তিনি ধরলেন বৃন্দাবন থানার ও সি-কে, "মিঃ শ্রীবাস্তব, আমি বিমলা বাসু বলছি। আপনারা ভেবেছেন কী, সিনিয়র সিটিজেনরা হ্যারাসড হবেন আর আপনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন?"

ও সি বিনায়ক শ্রীবাস্তব ধুরন্ধর মানুষ। বিমলা বাসুকে ভাল করে চেনেন। খুব ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন, "কী হয়েছে মিসেস বাসু? ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন?"

ননীবালা চক্রবর্তীর নামটা করা মাত্রই ও সি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "ম্যাডাম, এই কেসটা নিয়ে একটু আগেই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন সুষমা গৌতম। উনি একটা সলিউশন করে দিয়েছেন।"

সুষমার নামটা শুনে বিমলা থমকে গেলেন। সুষমা থাকে সেই বৃন্দাবন মথুরা রোডে। ননীবালার খবরটা ও আগে পেল কী করে? ননীবালার ব্যাপারে নাক গলানোর ও কে? বিরক্তি চেপে তিনি বললেন, "সুষমা কী সলিউশন করে দিয়েছে?"

"ম্যাডাম, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ঝামেলা। বুঝতেই তো পারছেন। জল অনেক দূর গড়ায়। বিধবা মহিলাটিকে আপনি একটু বোঝান। সুষমাজি বিধবাদের জন্য যে আশ্রমটা করে দিয়েছেন, সেখানে একটা বেড ননীবালাকে উনি দিতে রাজি। ননীবালাকে আপনি ওখানে চলে যেতে বলুন।"

অনুরোধটা শুনে বিমলা চৌকিতে বসে পড়লেন। ব্যাপারটা এবার মাথায় ঢুকেছে। তা হলে ওকে উৎখাত করাটা একটা ষড়যন্ত্র! জ্ঞানগুদড়িতে ওঁরা সবাই মিলে একটা বড় আশ্রম খুলেছেন। বিধবাদের জন্য। অনেক ভেবে-চিন্তে বিমলা নাম দিয়েছিলেন আশ্রমটার, নব নীড়। যারা সব খুইয়ে চলে এসেছে, তাদের জন্য নতুন বাড়ি। সুষমা সেক্রেটারি নব নীড়ের। কিন্তু এখানকার বিধবাদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে! অনেকেই ওখানে গিয়ে থাকতে চাইছে না। বিশেষ করে, যারা বিমলার কাছে আসে। সুষমার ধারণা, বিমলা ওদের ভাঙচি দিচ্ছেন।

এত কথা অবশ্য জানার কথা নয় ও সি-র। তাঁকে জানানোর দরকারও নেই। তাই বিমলা বললেন, "শুনুন মিঃ শ্রীবাস্তব, ননীবালাকে আমি পাঠাচ্ছি। দয়া করে ওর অভিযোগটা নেবেন। তারপর আমি যা করার মথুরায় গিয়ে করছি।"

কথাটা বোধহয় মনঃপুত হল না শ্রীবাস্তবের। বললেন, "ম্যাডাম, এখনই আমাকে একবার মথুরার দিকে যেতে হবে। ননীবালাকে আপনি সন্ধের দিকে পাঠান।"

"তার মানে? এই ঠা ঠা রোদ্দুরে ও থাকবে কোথায়?"

"আপনার ওখানেই রেখে দিন না ম্যাডাম! একটা কথা বলব? এইসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ওদের ওয়েস্টবেঙ্গলে ফিরে যেতে বলুন না। এ লোকগুলোর জন্য এভরি ডে আমাদের প্রবলেমে পড়তে হচ্ছে।"

"কী বলছেন আপনি জানেন, মিঃ শ্রীবাস্তব?"

"কেন অন্যায় কিছু বলেছি?"

"অফকোর্স বলেছেন। যাক, ফালতু আলোচনায় আমি যেতে চাই না। সন্ধেবেলায় আমি ননীবালাকে পাঠাচ্ছি। দয়া করে থাকবেন।"

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলেন বিমলা। চাতালে বসে ননীবালা উৎসুক চোখে তাকিয়ে। ওই মুখটার দিকে তাকিয়ে ও সি-র ওপর রাগটা দমালেন বিমলা। পরক্ষণেই মনে পড়ল সুষমার কথা। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যা রে ননীবালা, তোর জিনিসপত্তর যখন মুনিম বের করে দেয়, তখন সুষমার লোকজন কেউ ধারে কাছে ছিল?"

"পাপ্পু গোণ্ডাই তো সুষমার লোক। আমারে একদিন ভয় দেখাইল, বিমলা মাইয়ির কাছে গেলে কিছু পাইব্যা না।"

"পাপ্পু কোথায় থাকে রে?"

"গোপীনগর কলোনিতে। তিনডা বিয়া করসে। তিনডাই বাঙালি মাইয়া।"

বিমলা চুপ করে গেলেন। বহুদিন আগে সাবধান করে দিয়েছিল দৈনিক জাগরণের রিপোর্টার সতীশ স্বরূপ। অল্পবয়সী ছেলে। খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে। মথুরা থেকে মাঝে মাঝেই স্কুটার চালিয়ে চলে আসে এই বাঁকে বিহারী কলোনিতে। বিধবাদের অনেক দুর্দশার কথা ও লিখেছে ওদের কাগজে। দিল্লি কর্তাদের টনক নড়িয়েছে। সতীশ একবার হাসতে হাসতে বলেছিল, "দিদি, আপনি খাল কেটে কুমির এনে ফেলেছেন। ভয় হচ্ছে, আপনিই না কুমিরের পেটে চলে যান।"

কথাটা চট করে সেদিন বুঝতে পারেননি বিমলা, "কার সম্পর্কে বলছ?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না? সুষমা গৌতম। দিল্লি থেকে সেদিন উইমেন্স কমিশনের কর্তারা এলেন। সুষমাজি এমন ভাবটি করলেন ওদের সামনে, যেন উনি একাই নব নীড় চালাচ্ছেন। আপনার কথা কিন্তু একবারও করলেন না।"

"তাতে কী হল, আমি কি নাম কেনার জন্য এসব করছি?"

"দিদি, কথা সেটা না। দিল্লি থেকে সোহিনী গিরি এসে পুরো প্রোজেক্টের ভার ওর ওপর দিয়ে গেলেন। ওটা পাওয়ার কথা তো আপনার।"

"যাক, ছাড় ওসব কথা। ওসব প্রোজেক্ট আমার ঘাড়ে দেয়নি ভালই হয়েছে। আমার স্কুল তা হলে দেখত কে?"

সতীশ সেদিন আর কথা বাড়ায়নি। তবে পরদিন ওর রিপোর্টে ওর উষ্মা চেপে রাখতে পারেনি। কেন প্রোজেক্টে বিমলা বাসুকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে এক কলম লিখেছিল। ব্যস, দু'দিন পরেই দিল্লি থেকে সোহিনী গিরির ফোন। মিসেস বাসু আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি অন্তত এক্সিকিউটিভ বডিতে থাকুন। বিমলা অনুরোধ ফেলতে পারেননি। কিন্তু দু'একটা মিটিংয়ে গিয়েই তিনি বুঝতে পারেন, সুষমার সঙ্গে বনবে না। কমিটিতে নামটা এখনও আছে বিমলার। তবে ওদের কোনও কাজে তিনি নাক গলান না।

গীতা রসুই ঘর থেকে উঠে এসেছে। ওর হাতে লম্বা একটা পাইপ। এবার জল দিয়ে ধোবে চাতালটা। দিনে তিনবার করে সিমেন্টের এই চাতালটা ভিজোতে হয়। না হলে গরমে পা ফেলা যায় না। ধুলোয় ভর্তি হয়ে থাকে। ওই চাতালে উবু হয়ে বসে আছে ননীবালা ওর পুঁটলি নিয়ে। ওই পুঁটলিতে কী আছে জানেন বিমলা। ভজনাশ্রম থেকে পাওয়া চাল-ডাল। বাড়ি ফিরে হয়তো ফুটিয়ে নিত। সেটা সম্ভব হল না। তবুও ওর মুখে উদ্বেগের কোনও ছাপ নেই। এমন অনিশ্চিত জীবন, তা সত্ত্বেও ননীবালারা নির্লিপ্ত থাকে। চোখাচোখি হতেই বিমলা বললেন, "খেয়ে-দেয়ে এখানেই একটু গড়িয়ে নে। বিকালে আমার সঙ্গে বেরোবি।"

ননীবালা ঘাড় নাড়ল। ওর মুখটা দেখে বুক মুচড়ে উঠল বিমলার। মানুষ কী নিষ্ঠুর হয়ে গেছে আজকাল। এইরকম অসহায় মানুষকে কেউ উৎখাত করতে পারে? নিজেকে সামলানোর জন্যই তিনি উঠে পড়লেন চৌকি থেকে। একেক সময় মনে হয়, বাইরের ঝামেলায় আর নিজেকে জড়াবেন না। কিন্তু ননীবালার মতো মানুষগুলো যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন ওদের তাড়িয়ে দিতে পারেন না। এইভাবে একটা ঝামেলা থেকে আর একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন।

বাথরুমে ঢুকে বিমলা শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু আগে ক্রোধ হচ্ছিল সুষমার উপর। ঠাণ্ডা জলের ধারায় শরীর ভিজিয়ে তিনি নিজেকে শান্ত করলেন। স্বামী সুধাময় একবার একটা কথা বলেছিলেন, কুড়ি থেকে তিরিশ বছর বয়সটা হল বদলা নেওয়ার। পঞ্চাশ থেকে ষাট ক্ষমা করার। কারও ওপর রাগ হলে সুধাময়ের এই কথাটা স্মরণ করেন বিমলা। নিজের বয়সটা এখন ষাটের দিকে এগোচ্ছে। এই বয়সে কারও ওপর রাগ করা পোষায় না।

বাথরুমের দরজায় টোকার শব্দ শুনে বিমলা শাওয়ারটা বন্ধ করে দিলেন। নিশ্চয়ই গীতা। মনে হয় সুধাময় এসে গেছেন। সেই কারণেই তাগাদা দিচ্ছে। বড় তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করলেন বিমলা। হ্যাঁ গীতা। কর্ডলেস সেটটা এগিয়ে দিয়ে ও নিম্নস্বরে বলল, "তোমার ফোন।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যারে, তোর মামা ফেরেনি?"

"না।"

"ননীবালাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?"

"না। আর একজন কে এসেছে। বসে বসে তার সঙ্গে কথা কইছে।"

"তুই চিনিস না?"

"চিনি তবে নাম জানি না। মাথায় জট। তোমায় মাইয়ি বলে ডাকে।"

বর্ণনা শুনে চিনতে পারলেন বিমলা। আচুকি। বালবিধবা। বাঙালি নয়, জয়পুরের মেয়ে। ওর নামটা অদ্ভুত। আচুকি। এই নামটা শুনে অনেকেই হাসে। কী ভেবে বাপ মা ওর এই নামটা রেখেছিল কে জানে? বিমলা অবশ্য একটা নতুন নাম দিয়েছেন। আনন্দী। সেই নামটা লেখা আছে শুধু সরকারি খাতায়।

কর্ডলেস কানের কাছে ধরে বিমলা বললেন, "কে বলছেন?"

"ম্যাডাম শ্রীবাস্তব। বৃন্দাবন থানার ও সি।"

"কী ব্যাপার, মথুরা কোর্টে যাননি?"

"না ম্যাডাম, আটকে গেছি। আচ্ছা, ননীবালা চক্রবর্তী এখনও আপনার ওখানে আছে?"

"কেন বলুন তো?"

"ওর এগেনস্টে একটা সিরিয়াস কমপ্লেন আছে।"

"কী করেছে ননীবালা?" বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন বিমলা। তাই সতর্ক।

"ম্যাডাম, সুরজ পান্ডে বলে একটা লোক কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে কমপ্লেন করেছে, হি ওয়াজ হিট বাই আ পিস অফ স্টোন ফ্রম বিহাইন্ড। উনি আমাদের ইনজুরি পর্যন্ত দেখিয়ে গেছেন। অ্যান্ড প্রডিউস্ মেডিকেল সার্টিফিকেট।"

বিমলা উড়িয়ে দিলেন অভিযোগটা, "এ সব কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ শ্রীবাস্তব? একটা লিমিট থাকা উচিত।"

"ম্যাডাম, বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ব্যাপার। ফ্যাক্ট রিমেন্স, মহিলাটিকে অন্তত ইন্টারোগেশনের জন্যও আমাকে ধরে আনতে হবে।"

এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিমলা, "পারলে আমার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যান। খবরের কাগজের লোকদেরও আমি ডাকছি।"

"আপনি এত সহজে উত্তেজিত হয়ে যান কেন ম্যাডাম, প্লিজ ব্লাড প্রেসারটা একবার চেক করান।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর অ্যাডভাইস।" বলে লাইনটা কেটে দিলেন বিমলা। যার একটা চিমটি কাটার ক্ষমতা নেই, তার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে একজন অ্যান্টি সোসালের? কাগজের রিপোর্টারদের যমের মতো ভয় পায় শ্রীবাস্তব। এ দিকে আর আসবে না। কিন্তু এই সুরজ পান্ডে লোকটাই বা কে? সেই মুনিম না কি, যে ননীবালাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন বিমলা। গীতা হাতের কাছেই ম্যাক্সিটা রেখে গেছে। সেটা গলিয়ে চুল মুছতে মুছতে ঘরের বাইরে এসে তিনি দেখলেন, চাতালে পাশাপাশি খেতে বসেছে আচুকি ও ননীবালা। দু'জনে দিব্যি গল্প করে যাচ্ছে।

এই আচুকিটা একটু পাগলাটে ধরনের। কাউকে পরোয়া করে না। ওকে দেখলে লোকে ভয় পায়। মাথায় জটের জন্য তো বটেই, তার উপর মুখের কাঠিন্য এবং পরনের লাল শাড়ির জন্যও। যাকে ওর পছন্দ নয়, তার দিকে খর চোখে তাকিয়ে থাকে আচুকি। ওর কথাগুলোও খিচুড়ি মার্কা। হিন্দি, বাংলা আর বাঙালদের কথা এমন মিশিয়ে বলে যে, মাঝে মাঝে বিমলা ধন্দে পড়ে যান।

"হ্যা রে ননীবালা, তুই নাকি সুরজ পান্ডেকে ইট মেরেছিস?" চুল মুছতে মুছতে খুব হালকাভাবেই প্রশ্নটা করলেন বিমলা।

ননীবালা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই আচুকি বলল, "ও মারেনি মাইয়ি। হামি মেরেচি। গিধধরটাকে হামি খুন কইরে ফেলব।"

"তুই!" বিমলা সত্যিই অবাক, " তুই ওকে মারতে গেলি কেন? ওই লোকটা তোর কী করেছে?"

"হামার দোস্তকে ঘর থিকে বাইর করে দিয়েচে। তাইলে দুষ হল কী না বলো মাইয়ি। শুনে হামার খুন গরম হইয়ে গেল। তখুন মনের ভিতর থিকে রাধা মাই বুলল, যা মুনিমটাকে তু শাস্তি দি আয়। লউ বাজারে গিয়ে গিধধরটার মাথা ফাট্টে দি আলাম।"

বিমলা হাসবেন না রাগবেন, বুঝতে পারলেন না। পাগলা আচুকিটা ননীবালাকে এত ভালবাসে, আগে তো তা জানতেন না? চুল মোছা বন্ধ করে তিনি বললেন, "মারলি তুই আর দোষ পড়ল ননীবালার উপর। পুলিশের কাছে কমপ্লেন গেছে।" পুলিশের ভয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল আচুকি, "আসুক পুলিশ আমার কাচে। তখুন দেখব। মাইয়ি, ননীবালাকে হামি হামার কাচে নি যাচ্চি। আইজ থিকে ও হামার কাচে থাকবে। তুমি কুনও চিন্তা করবে না।"

আচুকির কথা শুনে বিমলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

যমুনায় বাঁদরটার সদগতি করে রামনরেতি রোডে ঢোকা মাত্রই রাজা দেখতে পেল, ওর দোকানে বেশ ভিড়। রিকশা ভাড়া চুকিয়ে সিঁড়িতে পা রাখার পর ওর চোখে পড়ল ঝমনলাল শর্মাকে। দিল্লির এক নামী ট্র্যাভেল এজেন্সির গাইড এই ছেলেটা। রাজা এবার বুঝল, দোকানে কেন এত ভিড়। দিল্লি থেকে প্রায়ই লাক্সারি বাসে তীর্থযাত্রীরা বৃন্দাবনে আসেন। গাইডের ভরসায় ওদের পাঠায় ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলো। গাইডরা নানা মন্দিরে নিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলাক্ষেত্রগুলো দেখায়। পাণ্ডাদের খপ্পরে পড়তে হয় না বলে আজকাল তীর্থযাত্রীরা গাইডদের সঙ্গে আসাই বেশি পছন্দ করছেন।

গাইডদের সঙ্গে স্থানীয় পাণ্ডাদের সম্পর্ক একেবারেই ভাল না। পাণ্ডাদের রুটি রোজগারে টান পড়েছে। তাই বেশ কয়েকবার দু'দলের মধ্যে ঝামেলা হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য গাইডদের কোনও অসুবিধা হয়নি। ওরা রোজই বাস নিয়ে আসছে। রাজা আজকাল কয়েকজন গাইডের সঙ্গে একটা আলাদা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সাহেবদের মন্দির দেখাতে তোমরা যাদের নিয়ে আসবে, তাদের আমার দোকানেও একবার নিয়ে আসতে হবে। আমার যা মাল বিক্রি হবে তার একটা অংশ তোমার। একেকটা বাসে ষাট-পঁয়ষট্টি জন করে লোক আসে। তারা একটা ক'রে জিনিস কিনলেও অনেক টাকা। সেই লোভে ঝমনলালরা ওর দোকান সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কিছু বলে। শুনে রাজা মুচকে মুচকে হাসে।

ওকে দেখতে পেয়ে ঝমনলাল বলল, "আরে ইয়ার, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমায় সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

রাজা বলল, "সুবে সুবে একটা মুসিবতে পড়ে গেছিলাম। তা আমাকে খুঁজছিলে কেন? তুমি কিন্তু অনেকদিন পরে এলে।"

"হ্যাঁ, এবার টুরিস্টদের নিয়ে সাউথ ইন্ডিয়ায় গেছিলাম। তিরুপতি হয়ে একেবারে সেই কন্যাকুমারী। তা তোমার কী খবর বলো।"

রাজা ফালতু আলাপে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। তাই জিজ্ঞাসা করল, "আজকের পার্টি কেমন? সমান উমান কিনবে তো?"

ঝমনলাল প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "সব রহিস পার্টি। দিল্লির পঞ্চশীল মার্গের সব ফ্যামিলি। মাহেঙ্গি চিজ দিখাও। এরা দামের পরোয়া করবে না।"

আর কথা না বাড়িয়ে রাজা দোকানের দিকে পা বাড়াচ্ছে, এমন সময় ঝমনলাল ফের পিছন থেকে বলল, "রাজা ভাইয়া, আজকের পার্টিতে দু'টো মেয়ে তোমার কথা বাসে জিজ্ঞাসা করছিল আমায়। কী যেন দরকার আছে তোমার সঙ্গে।"

"ওরা আমায় চিনল কী করে?"

"তা জানি না। যাও, ভেতরেই গেছে। বাবা মায়ের সঙ্গে।"

অবাক হয়েই রাজা ভেতরে এসে ঢুকল। ওর দোকানটা আসলে সামলায় দুই কর্মচারী— লাডলা আর সুমন। লাডলা ছেলেটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু সুমনের চালচলন রাজার পছন্দ নয়। একটু হাতটান আছে। ওকে এনেছে লাডলা। তাই ওর দোষত্রুটি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে সবসময়। সুমনের উপর একবার মারাত্মক রেগে গেছিল রাজা। মিথ্যে কথা বলার জন্য। ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু লাডলা হাতে ধরে অনুরোধ করে, এবারকার মতো মাফ করে দিন।

লাডলারা দু'জন ব্যস্ত মাল দেখাতে। ওদের সব শেখানো আছে। কোনও মূর্তি কারও পছন্দ হয়েছে বুঝতে পারলে, ঢাই-তিনগুণ দাম হাঁকবে। পাঁচশো টাকা দামের একটা জিনিস, দাম তুলবে বারোশো-পনেরোশো টাকা। বি জে পি পাওয়ারে আসার পরে দেবদ্বিজে লোকের ভক্তি এমন বেড়ে গেছে, কৃষ্ণ আর রামের মূর্তি আজকাল আর দোকানে পড়ে থাকে না। দেশে যত রাম আর কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা বাড়বে, ততই সুবিধা রাজার। মূর্তি কেনার সময় কেউ দরাদরি করে না। কেউ যদি করে তা হলে লাডলা সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে এমন সব কথা বলে, তখন দোকান থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব হয় না।

ঝমনলালের এই পার্টিটাকে দেখে রাজা বুঝতে পারল, বেশ উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকজন সব। বেশিরভাগই বয়স্ক ও মহিলা। তবে দু'চারজন ইয়ং মেয়েও রয়েছে। এদের মধ্যে কোন দু'জন ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর করেছে, একটু পরেই ও তা বুঝতে পারল। রাজার দোকানটা খুব সুন্দর কাঁচ দিয়ে সাজানো। ক্যাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সব জায়গায় নজর রাখা যায়। কাঁচের ফাঁক দিয়েই ও লক্ষ্য করল, দু'টি মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বয়স বাইশ তেইশের বেশি হবে না। ঝমনলাল তা হলে এদের কথাই বলেছিল? মেয়ে দুটোকে কোনওদিন বৃন্দাবনে দেখেছে বলে রাজার মনে হল না।

লাডলা কৃষ্ণনগর থেকে আনা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখাচ্ছে কাস্টমারদের। মাটির তৈরি। কী অপূর্ব কারুকাজ! দেখলেই পছন্দ হয়ে যায়। মূর্তি দেখার জন্য ভিড়টা ডান দিকে সরে গেছে। ক্যাশ বাক্সের কাছে রাজা একা। কাস্টমারদের আগ্রহ দেখে রাজার ভাল লাগল। আগে ও জানত না, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা এত চমৎকার মূর্তি বানাতে পারেন। গেল শীতে ও কলকাত্তায় ছোড়দির বাড়িতে বেড়াতে গেছিল। তখন ছোড়দির বাড়িতেই একটা দুর্গামূর্তি দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, ওটা জিজাজি কৃষ্ণনগর থেকে কিনে এনেছে। তখনই ওর মাথায় প্ল্যান খেলে যায়। নিজের দোকানে এইরকম কয়েকটা মূর্তি রেখে দেখলে কেমন হয়?

কৃষ্ণনগর থেকে প্রথম বার রাজা এক ডজন মূর্তি কিনে এনেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলি বিক্রি হয়ে যায়। আড়াইশো টাকার জিনিস হাজারেও নিয়েছে। বুদ্ধি করে ও মূর্তিগুলো কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়েছে। পাথরের মূর্তি কেনার যাদের সামর্থ নেই তারাই মাটির মূর্তির দিকে বেশি ঝোঁকে। আশ্চর্য এই কাস্টমারগুলোকে একটু অন্যরকম লেগে মনে হচ্ছে।

"আর ইউ রাজা মিত্রা?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে তাকাল রাজা। শো কেসের একেবারে বাঁ দিকে সরে এসে প্রশ্নটা করেছে ওই দু'টি মেয়ের একজন। আরে মেয়েটা নাম জানল কী করে? অবাক হয়েই রাজা বলল, "ইয়েস।"

"আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি।"

"তাই না কি? কার কাছ থেকে?"

"রিয়া শর্মা। মানে, আমার কাজিন সিস্টারের কাছ থেকে। চিনতে পারছেন? এই দোকানের পিছনেই মেয়েদের যে বি এড কলেজ আছে, সেখানে পড়ে। আপনার দোকানে প্রায়ই আসে ফোন করতে।"

হবে হয়তো। দোকানের লাগোয়া ছোট্ট একটু জায়গা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। বছরখানেক আগে কাঁচ দিয়ে ঘিরে সেই জায়গায় এস টি ডি বুথ করেছে রাজা। এটা ওর তিন নম্বর ব্যবসা। কপাল ভাল থাকলে যা হয়। হেলাফেলা করে যা শুরু করেছিল, তা থেকেও পয়সা আসছে। বি এড কলেজের মেয়েরা রোজ আসে এস টি ডি করতে। কলেজের ফোন হোস্টেলের মেয়েরা ব্যবহার করতে পারে না। হোস্টেলে প্রায় আশি নব্বই জন মেয়ে। কেউ দিল্লি, কেউ আগ্রার, কেউ ফতেপুর সিক্রির। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ওরা প্রায়ই ফোন করতে ঢোকে রাজার বুথে, এদেরই মধ্যে কেউ হবে রিয়া শর্মা। চিনি না বলাটা ভাল দেখাবে না। রাজা আগ্রহের সঙ্গে বলল, "খুব চিনি। খুব সুন্দর দেখতে।" শেষের কথাটা ও ইচ্ছে করেই জুড়ল। তুতো বোনকে সুন্দরী বললে এরা নিশ্চয়ই খুশি হবে।

"আপনি কিন্তু একবার রিয়াদিদির খুব উপকার করেছিলেন। রিয়াদিদির বাবা, মানে আমার আঙ্কল একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দিল্লি থেকে এখানে ফোন করা মাত্র আপনি হোস্টেল থেকে রিয়াদিদিকে ডেকে দেন। না হলে খবরটা দিদি পেতেনই না। কী মনে পড়ছে আপনার?"

এইবার রাজার মনে পড়ল। ও ওই মেয়েটাই তা হলে রিয়া? মোটেই সুন্দরী নয়। ঢ্যাঙা, শ্যামলা। যাক গে, একবার যখন বলেই ফেলেছে সুন্দরী তখন কথাটা ফিরিয়ে নেওয়া উচিত হবে না। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সাবধান হয়ে গেল। মেয়ে দুটোর সঙ্গে বুঝে শুনে কথা বলতে হবে। ও বলল, "এইবার মনে পড়েছে। আমি অন্য এক রিয়ার কথা ভাবছিলাম। সে অবশ্য থাকে দরিয়াগঞ্জ সাইডে।"

"আমার নাম নেহা। নেহা শর্মা। আমার বাবা ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে আছেন। আর এ হচ্ছে পায়েল। আমার খুব বন্ধু। আমরা এখানে আসছি শুনে রিয়াদিদি বলল, সাহেবদের মন্দিরে গেলে তোরা অবশ্যই রাজার সঙ্গে দেখা করবি। দোকানটার নাম ওরিয়েন্টাল হ্যান্ডিক্র্যাফটস। দেখবি ডার্ক বাট ভেরি ভেরি হ্যান্ডসাম একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই ছেলেটাই রাজা।"

রাজা বলল, "আপনারা কি কিছু কিনবেন?"

নেহা বলল, "আমার মা ওদিকে আছেন। উনি কিনবেন।"

"আপনাদের জন্য দুটো ঠাণ্ডা আনতে বলি?"

"না, না। আমরা সফট ড্রিঙ্কস খাই না। ওজন বেড়ে যাবে।"

লাডলা আর সুমনের দিকে তাকিয়ে রাজা দেখল, বেশ ভাল মালই গছিয়েছে। হাজার কুড়ি টাকার মতো মাল তো হবেই। সুমন প্যাক করে দিচ্ছে। প্যাকেটে প্রত্যেকের নাম লিখে দিচ্ছে লাডলা। বাসে এক সঙ্গে রাখলে যাতে গোলমাল হয়ে না যায়। সামান্য যত্ন, এতেই কাস্টমাররা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। ফের বৃন্দাবনে এলে এরা এ দোকানে আসবেই। অথবা আত্মীয় পরিচিতদের পাঠাবে। সকাল সকাল এই অফ সিজনে হাজার কুড়ি টাকার মাল বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বেশ খুশি রাজা। ভোরবেলায় ওর মনে হয়েছিল, দিনটা ভাল যাবে না। এখন মনে হচ্ছে, রোজ বাড়ির সামনে একটা করে বাঁদর মরলে, মন্দ হয় না।

"রাজা ভাইয়া, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। একবার দোকানের বাইরে আসতে পারবেন?"

নেহার ফিসফিসানি শুনে ওর দিকে চমকে তাকাল রাজা। ভাইয়া শব্দটা ওর মুখে এত ভাল লাগল যে, ও বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

কাউন্টার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে ওল ও। দোকানের বাইরে একটা ফ্রুট জুসের স্টল আছে। তিনজনে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। নেহা বলল, "রাজা ভাইয়া, আপনার নেমকার্ড কি সঙ্গে আছে? একটা দেবেন?"

"সিওর।" বলে রাজা পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে দিল। এটা অবশ্য পুরনো কার্ড। যখন ওকালতি করত তখনকার। এতে দোকান ও গাড়ির ব্যবসার কথা উল্লেখ নেই। নতুন কার্ড করানো হয়নি। ইচ্ছে করেই ও উদ্যোগ নেয়নি। রাজা মিত্র, অ্যাডভোকেট ওর এই পরিচিতি যতটা ওজন পাবে, অন্য পরিচয় ততটা গুরুত্বই পাবে না।

নেহা কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, "আপনি অ্যাডভোকেট! রিয়া দিদি তো বলেনি। যাক, আমাদের পক্ষে ভালই হল। ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে।"

"কী ব্যাপার বলো তো নেহা?"

পায়েলকে দেখিয়ে নেহা বলল, "এরই একটা দরকারে আপনাকে বিরক্ত করছি। আচ্ছা, আপনি এখানে সুষমা গৌতম বলে কাউকে চেনেন?"

"খুব ভাল করে চিনি।"

"পায়েলের বড়িদিদিকে উনি খুব কষ্টের মধ্যে রেখেছেন।"

"তোমাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নেহা।"

এ বার পায়েল বলল, "আমার বড়িদিদি হলেন সুষমা গৌতমের জেঠানি। অত বড় ঘরে বিয়ে হওয়ার কথা নয় দিদির। কিন্তু দিদি খুব সুন্দরী। জিজাজি বাড়ির অমতেই আমার দিদিকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সব ঠিক ছিল। এক বছর আগে হঠাৎ জিজাজি মারা যাওয়ার পর থেকেই দিদির উপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। এই সুষমা চাইছেন, দিদি কিছু টাকা পয়সা নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে আসুন। কিন্তু দিদি তাতে রাজি নন। সুষমা প্রায়ই মারধর করে। গয়না গাঁটি কেড়ে নিয়েছে। আমার বাবা গেলে দিদির সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কী করব। তখন রিয়া দিদি আমার বাবাকে বলল, আপনার কথা।"

"তোমার বাবাকে পুলিশের হেল্প নিতে বলছ না কেন?"

"সুষমার অনেক চেনাশুনা পুলিশ মহলে। আমাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। নেহার বাবা চেষ্টা করেছিলেন দিল্লি থেকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সব সুষমা কব্জা করে রেখেছে।"

"কেন তা হলে একটা মামলা করছেন না তোমার বাবা?"

"এ ব্যাপারে আপনি একটু সাহায্য করতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই। দরকার হলে আমি নিজেই দাঁড়িয়ে যেতে পারি। তোমার বাবাকে বোলো, যেন আমার সঙ্গে একবার কথা বলেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" বলে কেঁদে ফেলল পায়েল।

"তোমরা আরও একজনের নাম নিয়ে যাও। বিমলা বাসু। এখানকার নামকরা সোসাল ওয়ার্কার। সুষমার এক নম্বর দুশমন। না, তোমার বাবা এসে যেন প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

দোকান থেকে সব কাস্টমার বেরিয়ে এসেছে। ঝমনলাল সবাইকে ডেকে বাসে তুলে নিচ্ছে। নেহা আর পায়েলও বাসে উঠে গেল। ফের ক্যাশ বাক্সের সামনে এসে হাঁফ ছাড়ল রাজা। সঙ্গে সঙ্গে এসে উদয় হল ধর্মেন্দ্র। কাউন্টারের উপর ঝুঁকে বলল, "কৃষণ ভগবান, আপনার এই নতুন গোপি দু'টিকে তো আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না?"

রাজা বলল, "আরে তোর কলি যুগে জন্ম, তুই দেখবি কী করে?"

ধর্মেন্দ্র বলল, "তোর কপাল দেখে আমি অবাক হয়ে যাইরে রাজা। সারা দিন দোকানে বসে থাকছি, অথচ একটা মেয়ের দেখা নেই। আর তোর দো কানে এলেই দেখি, সুন্দরী মেয়েরা সব তোকে ঘিরে আছে।"

"দোকানে তুই বুড়োবুড়িদের জিনিস রাখবি, এক্সপেন্ট করিস কী করে, তোর দোকানে সব ইয়ং মেয়ে আসবে?" ধর্মেন্দ্রর দোকানে নামাবলি, জপের মালা, কণ্ঠী, রুদ্রাক্ষ, তিলক মাটি—এই সব বিক্রি হয়। একটু বয়স্ক লোকেরাই এ সবজিনিস কেনে। তবে বেশ চালু দোকান। এই সব ও এক্সপোর্টও করে। রামন রেতি রোডে সবাই জানে, ধর্মেন্দ্র ওর খুব বন্ধু। সমবয়স্ক। ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ধর্মেন্দ্রর ধারণা, রাজা অন্তত পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। না হলে মেয়েগুলো এমন ছুটে ছুটে আসে কেন ওর কাছে? রাজা অনেকদিন বলেছে প্রেম করার মতো কোনও মেয়ে এখনও চোখে পড়েনি। কিন্তু ধর্মেন্দ্র কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

"দাঁড়া, তোর ভাবির কাছে আজ রাতেই আমি যাচ্ছি। এখুনি বিয়ের ব্যবস্থা না করলে তুই একেবারে বখে যাবি।"

"নিজের চরকায় তেল দে না ভাই।"

"দূর, আমার তো সব ঠিক করেই রেখেছে বাবা। ব্রজবাসীদের ব্যাপার তো তুই জানিস। নিজের পছন্দে বিয়ে করা মুশকিল।"

ধর্মেন্দ্র আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওর দোকানের ছেলেটা এসে ডাকল, একটা হেভি কাস্টমার এসেছে। ব্যাজার মুখে ও উঠে গেল। ওর মুখ দেখে হাসি পেল রাজার। এমন গোঁড়া পরিবারে জন্মেছে, বেচারি প্রেম করতেও পারবে না। ধর্মেন্দ্রকে খুব ভাল লাগে রাজার। নির্মল চরিত্রের ছেলে। ও যদি এখানে দোকান করার পরামর্শটা না দিত, তা হলে এখনও মথুরা কোর্টের চত্বরে ঠা ঠা রোদে বসে রাজাকে ভ্যারেন্ডা ভাজতে হত। পাঁচ ছয় বছর আগে এখানে যখন সাহেবদের মন্দিরটা তৈরি হচ্ছিল, তখন দোকানের এই জায়গাতে ভাঙ্গি, মানে ঝাড়ুদারদের বস্তি ছিল। এই জমিটা নিয়ে হঠাৎ একটা ব্রিফ এল ওর হাতে। যে করেই হোক ভাঙ্গিদের উচ্ছেদ করে দিতে হবে। জমিটা ওরা জবরদখল করে আছে। এক পয়সা ভাড়া দেওয়ার নাম করে না। রোজ রোজ মারামারি করে। আবর্জনা, কাদা, কাঁচা নর্দমা, টালির ঘর আর শূয়োরের পাল—সব মিলিয়ে জায়গাটা ওরা নরক করে তুলেছিল।

জমির মালকিন কলকাত্তার। সাবিত্রী বসু। বিধবা ওই ভদ্রমহিলাকে মাত্র একবারই রাজা দেখেছিল। কিছুটা মামলা লড়ে, আর কিছুটা ওর আখড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ভয় দেখিয়ে রাজা উচ্ছেদ করেছিল ভাঙ্গিদের। জমির পজেশন নেওয়ার পর হঠাৎ সাবিত্রী বসু এসে হাজির বৃন্দাবনে। কে এক ঘনশ্যাম পাণ্ডা ভয় দেখিয়েছে, জমিটা ওর পছন্দের লোককে বিক্রি করতে

হবে। না হলে কাউকেই নিতে দেবে না। রাজা এ সব নিয়ে তখন মাথাই ঘামায়নি। পারিশ্রমিক নিয়ে ও চলে এসেছিল।

হঠাৎ সাবিত্রী দেবী একদিন ওকে ডেকে পাঠালেন। "কী করা যায় বলত বাবা, যে লোক জমিটা কিনতে আসছে তাকে ভাঙচি দিচ্ছে ওই পাণ্ডাটা।" রাজা দু'চারদিন সময় চেয়ে নিয়ে খোঁজ করে দেখল, আসল কালপ্রিট ঘনশ্যাম না। সাহেবরা। ওরা রাস্তার এ পারও কিনে নিতে চায়। মন্দিরের উল্টো দিকে এমন ভাল জায়গা আর কোথাও পাবে?

নিজেরা কিনতে চাইলে মালিকরা যদি তিনগুণ দাম হেঁকে বসে, তাই সরাসরি কথা না বলে স্থানীয় একজনকে লাগিয়েছে। ঘনশ্যামকে নিশ্চয় কিছু কমিশন দেবে।

ওর আশঙ্কার কথা সাবিত্রী দেবীকে রাজা বলেছিল। ভদ্রমহিলা হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন। রাজাকে বললেন, "দশ লাখ টাকা পেলেই আমি এই জমি লিখে দেব। তুমি লোক দেখো।"

এখন সে সব কথা ভাবলে হাত কামড়ায় রাজা। ইস, সেই সময় যদি সাহস করে জমিটা কিনে ফেলত, তা হলে আজ রাজার হালে থাকত। দশ একর জমি। এর দাম এখন ঢাই কোটি টাকা। রাজা তখন সাহসই সঞ্চয় করতে পারল না, কারও কাছ থেকে লোন ফোন নেওয়ার। তখন মেয়েদের এই প্রাইভেট কলেজের মালিকদের সঙ্গে গিয়ে ও কথা বলল। ভাগ্যিস, সেই সময় বুদ্ধিটা দিয়েছিল ধর্মেন্দ্র। "তুই মিডিয়েটারের কাজটা করে গিছিস, তুই কিছু বাগিয়ে নে।"

রাজা আঁতকে উঠে বলেছিল, "না না, বিধবা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নিতে পারব না।"

"আরে, ভদ্রমহিলার কাছ থেকে তোকে কে সুবিধা নিতে বলেছে? তুই কলেজের ওদের বল, মেয়েদের কলেজে আপনারা তো একটা বাউন্ডারি ওয়াল দেবেনই। রাস্তারদিক থেকে তিরিশ ফুট করে ছেড়ে দিন। শপিং কমপ্লেক্স করার জন্য। আউটরাইট বিক্রি করতে হবে না। নিরানব্বই বছরের লিজ দিন। ব্যস। না হলে বলুন অন্য পার্টি দেখছি। ওদের বলেই দ্যাখ না।

আশ্চর্য, কলেজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু রাজি হয়ে গেছিল এই শর্তে। পঁচিশটা প্লট বেরিয়েছিল সামনের দিকে। ধর্মেন্দ্র দুটো প্লট নিয়েছিল। রাজার জন্যও রেখেছিল দুটো। রাজা তখন বলেছিল, "আমার জন্য নিয়ে কী হবে?"

"রেখেই দে না। পরে কাজে লাগবে। নিজে ব্যবসা না করিস, অন্য কাউকেও তো ভাড়া দিতে পারবি দোকানটা। সাহেবদের এই মন্দিরটা বৃন্দাবনে একটা দেখার মতো জিনিস হবে। প্রচুর লোক এদিকটায় মন্দির দেখতে আসবে। দেখবি, তখন এখানে দোকান খুব চলবে।" সত্যিই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে ধর্মেন্দ্রর কথা।

লাডলা দোকানের ভেতর উঠে এসেছে। ওর মুখে একগাল হাসি। বলল, "রাজা ভাইয়া এই ঝমললাল সত্যিই কাজের ছেলে।"

"ওর কমিশনটা দিয়েছিস?"

"বাসে ওঠার আগেই চেয়ে নিয়েছে, সেদিকে ব্যাটা সেয়ানা। বলল, আবার আসবে পরশুদিন। জার্মান টুরিস্টদের নিয়ে। কিছু ভাল মাল আনিয়ে রাখতে হবে বাড়ি থেকে। এই দেখো, বাড়ির কথায় মনে পড়ে গেল। সঙ্গীতা ভাবি তোমায় ফোন করেছিল।"

এতক্ষণ মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছিল। সঙ্গীতা ভাবির কথায় আবার দুশ্চিন্তাটা ফিরে এল। সেই বাঁদর প্রসঙ্গ। বাড়িতে কিছু হল না কি? সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়িতে ফোন করল। একটু উদ্বিগ্ন হয়েই ও জিজ্ঞাসা করল, "ফোন করেছিলে?"

ও প্রান্তে ভাবি বেশ উত্তেজিত, "আরে, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরই দেখি ঘনশ্যাম পাণ্ডা শর্মাদের বাড়িতে ঢুকছে। কোনও ঘোঁট পাকাবে না তো?"

"ঘোঁট মানে?"

"ঝামেলা। আমার তো বুক টিপটিপ করছিল। তোমার নবীন ভাইয়া যখন বাড়ি থেকে বেরল তখন ভাবলাম, ঘনশ্যাম বুঝি বেরিয়ে এসে ধরবে।"

"ছাড়ো তো ভাবি। এখন কেউ কিছু করতে পারবে না। বসে বসে তুমি নিশ্চিন্ত মনে রসুই পাকাও। ছাড়ি তাহলে?"

"দাঁড়াও। দাঁড়াও। কথা আছে। এত তাড়াতাড়ি করছ কেন? দোকানে কি সুন্দরী কাস্টমার দাঁড়িয়ে আছে না কি?"

"দাঁড়িয়ে ছিল, এখন চলে গেছে। কী বলবে বলো।"

"ছোটা বাবার আশ্রম থেকে চরণদাস বাবাজি ফোন করেছিলেন। তোমাকে একবার ফোন করতে বলেছেন। বোধহয় তোমার গাড়ি ভাড়া নেবেন।"

"ঠিক আছে। আমি যোগাযোগ করে নিচ্ছি। আমার প্যায়ারে ভাতিজা কী করছে এখন?"

"ওর যা কাজ। বসে বসে সংস্কার চ্যানেলে ভজন শুনছে।"

"ছাড়ি তা হলে? খেতে যেতে প্রায় একটা হয়ে যাবে।"

টি ভি-র এই চ্যানেলটা ভাবিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সারাটা দিন সংস্কার চ্যানেলে ধর্মীয় আলোচনা, ধর্মীয় গান বাজে। সব পৌরাণিক ফিল্ম দেখানো হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, এই চ্যানেলটা দেখার জন্য সমীর পাগল। কোনও কারণে জেদ ধরলে বা কান্নাকাটি শুরু করলে ভাবি ওকে ওই চ্যানেলের সামনে বসিয়ে দেয়। ব্যস, অমনি সমীর চুপ। মাম্মি বলে তোর বাবাই ওর মধ্যে ফিরে এসেছে।" বাবার মৃত্যুর এক বছর পর সমীর জন্মেছে। হতেও পারে। বাবা খুব ধর্মভীরু লোক ছিলেন। বৃন্দাবনে এসে আর পূর্ব বাংলায় ফিরে গেলেন না, ব্রজভূমিতে দেহ রেখে মোক্ষ লাভ করবেন বলে।

ভাবির কথা মতো ছোটা বাবার আশ্রমে ফোন করতে গিয়ে রাজা দেখল রাস্তায় একটা মারুতি ভ্যান থেকে চরণদাস বাবাজি নেমে আসছেন। তা দেখে ও তাড়াতাড়ি দোকান থেকে নেমে এল। নিশ্চয়ই খুব জরুরি দরকার। নাহলে উনি এখানে আসতেন না। ছোটা বাবার আশ্রমের সেক্রেটারি হলেন চরণদাস বাবাজি। ওদের আশ্রমে প্রচুর ভক্ত আসেন বাইরে থাকে। তাঁদের জন্য যখনই গাড়ি দরকার হয়, ওরা রাজার কাছ থেকে নেন। প্রায় রাস্তায় নেমে এসে চরণদাস বাবাজির চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে রাজা বলল, "আমাকে ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বেটা, একটা এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি, এখুনি একবার টুনডলায় পাঠাতে পারবে? খুব বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে হবে কিন্তু।"

রাজা মনে মনে ছকে নিল, হাজার-বারোশো টাকা। তিন ঘন্টা যাওয়া আর তিন ঘন্টা আসা। মন্দ কী? ও বলল, "কাউকে নিয়ে আসতে হবে।"

"হ্যাঁ। বাবার খুব ধনী এক শিষ্যা। তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসছেন। বেলা সাড়ে তিনটের সময় টুনডলাতে ট্রেন পৌঁছবে। দেখো, যেন ওদের কোনও অসুবিধা না হয়।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বলে রাজা ফের দোকানে উঠে এল। সুমো গাড়িটা টিপ মারতে গেছে। আর একটাই এয়াবকন্ডিশন্ড গাড়ি ওর হাতে আছে—ইন্ডিকা। নতুন গাড়ি। নতুন, কারও হাতে ছাড়া যায় না। রাজা ঠিক করল, ও নিজেই ইন্ডিকা চালিয়ে যাবে। গাড়ির চাবিটা ড্রয়ার থেকে নেওয়ার জন্য ও দোকানের ভেতর উঠে আসা মাত্রই, সাহেবদের মন্দিরের দিক থেকে ও স্টেফানিকে এদিকে আসতে দেখল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে, সিঁড়ি টপকে ও ওপরের স্টোর রুমে উঠে গেল।

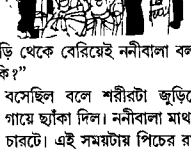

বিমলা বাসুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই ননীবালা বলল, "আমারে কোথায় নিয়া যাইতাছস আচুকি?"

এতক্ষণ ছায়ায় বসেছিল বলে শরীরটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেরতেই তপ্ত বাতাস গায়ে ছ্যাঁকা দিল। ননীবালা মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। বিকেল চারটে-সোয়া চারটে। এই সময়টায় পিচের রাস্তা খুব তেতে থাকে। খালি পায়ে হাঁটা যায় না। ননীবালা পিচের রাস্তা ছেড়ে সরে এল ঘাসের উপর। বৃন্দাবনের গরম এখন ওকে আর কষ্ট দেয় না। প্রায় পঁচিশ বছর এখানে পড়ে রয়েছে। ও সব কষ্টের উর্ধে চলে গেছে। এখন প্রতীক্ষার সময়। গোবিন্দ টানলেই চলে যাবে।

ননীবালার প্রশ্নটা আচুকি শুনতে পায়নি। ঘাসের রাস্তায় উঠে এসে বলল, "তু কি হামাকে কিছু জিগাইলি ননীবালা?"

"কইলাম, কুন চুলায় লইয়্যা চললি?"

আচুকি বলল, "তুর অতো জানার কী দরকার। হামার সনে থাকবি।"

আচুকি একটু ক্ষেপি টাইপের। ননীবালা জানে। হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায়। তখন ওর মুখ থেকে অশ্রাব্য গালি বেরতে থাকে। কখনও আবার গুম হয়ে থাকে। বৃন্দাবনের বিধবারা ওকে সবাই চেনে। জায়গাটা তো ছোট। কোথাও না কোথাও একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা হয়ে যায়। সবাই যে একই পথের পথিক। গোবিন্দর টানে এখানে পড়ে রয়েছে। সবাই শ্রীকৃষ্ণের বিধবা। আচুকির সঙ্গে সম্পর্কটা একটু অন্য রকম। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। সেটা ননীবালা এখন মনে করতে চায় না।

ননীবালা এমনিতে শক্তপোক্ত মানুষ। কিন্তু দুপুর বেলায় বিমলা মাইয়ির বাড়িতে একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। তাই আচুকির সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটতে পারছে না। ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তা জানে না। কতটা রাস্তা

হাঁটতে হবে বুঝতে পারছে না। একবার জিজ্ঞাসা করে উত্তর পায়নি। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার সাহস পেল না ননীবালা। বৃন্দাবনে এক ঘাট থেকে বেশ কয়েকবার ও অন্য ঘাটে ঠোক্কর খেয়েছে। এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়— কোথাও না কোথাও জুটে গেছে। তাই ভবিষ্যত নিয়ে ও আর ভাবেই না। গোবিন্দর উপর ছেড়ে দিয়েছে। তিনি ঠিক জুটিয়ে দেন। এই যে আজ আচুকি অযাচিত ভাবে ওকে ডেকে নিয়ে এল, শৃঙ্গার বট থেকে বেরনোর সময় ও কি তা ভাবতে পেরেছিল? মোটেই না।

শৃঙ্গার বটের আগেও ছিল সেবা কুঞ্জের একটা বাড়িতে। তার আগে কেশী ঘাটের কাছে গোবিন্দ কুঞ্জে। তারও আগে কিছুদিন ছিল মধুবন এলাকায়। কোনও জায়গায় তিন-চার বছরের বেশি থাকতে পারেনি। পুরানা হাভেলিতে থাকার একটা মস্ত সুবিধা ছিল। চট করে ভজনাশ্রমে যাওয়া যেত। ওখান থেকে আজ উৎখাত না হলে এতক্ষণে ননীবালা বেরিয়ে পড়ত পাথেরপুরার দিকে। একটা কথা, বৃন্দাবনে ওর যত কষ্টই হোক, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ও কিন্তু কোনওদিন ভিক্ষা করেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভিক্ষা না করেও ও কোনওদিন অনাহারে থাকেনি। গোবিন্দ ঠিক কিছু না কিছু জুটিয়ে দিয়েছেন।

দুঃসহ তাপের কারণে রাস্তায় লোকজন খুবই কম। পাশ দিয়ে হুশ করে এক আধবার গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় রাস্তা পেরনোর আগে ননীবালা একবার দাঁড়িয়ে আশপাশ দেখল। এখানকার লোকজন ভাল না। ননীবালার মতো বিধবাদের এরা মানুষ বলেই মনে করে না। লউ বাজারে একদিন একটা রিকশা ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। হ্যান্ডেল সজোরে এসে লেগেছিল বুকে। ননীবালা দম নিতে পারছিল না সে সময়। বাজারের লোকেরা রিকশাওয়ালাকে কিছু বলা তো দূরের কথা, উল্টে ননীবালাকেই দোষটা দিয়েছিল। কী সব খারাপ খারাপ কথা! বাঙালি কাঙালি হ্যায়। ভাগ ইধর সে। বুকের সেই ব্যথা অনেক দিন ভুগিয়েছিল ননীবালাকে। পথ্য করার ক্ষমতা ছিল না। আপনা আপনি সেই ব্যথা সেরে গেছিল।

রাস্তার ধারে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে আচুকি। ওর মাথায় ভাঁজ করা একটা গামছা। সেটা হাতে নিয়ে দোকানদারকে ও বলল, "লালা ঠাণ্ডা পানি দে তো?"

ননীবালা যদি এই অনুরোধটা করত তা হলে দোকানদার 'যা ভাগ বুড়িয়া' বলে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আচুকির মাথায় জট। ওকে দেখতেও লাগে সন্ন্যাসিনীর মতো। এই ভর দুপুরে ওকে তাড়িয়ে দিতে যে কোনও লোকের বুক একবার কাঁপবেই। বড় লোটা করে সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মালিক জল এনে দিল। লোকটা ভেবেছিল, আচুকি খাওয়ার জন্য জল চাইছে। জল ঢেলে দেওয়ার ভঙ্গি করতেই আচুকি খিঁচিয়ে উঠল, "মুরখ, তোর হাতে হামি পানি পিবো? শোচা ক্যায়সে? দে হামারা গামছায় পানি ঢেলে দে। মাথা এক দম গরম হয়ে গেছে।"

লোকটা ভয়ে ভয়ে গামছাটা ভিজিয়ে দিতেই আচুকি ননীবালাকে বলল, "মাথায় পানি ঢেলে নে। গুরুকুল পৌঁছনোর আগে শুকিয়ে যাবে।"

ঘোমটা সরিয়ে ঘাড় নিচু করে মাথাটা এগিয়ে দিল ননীবালা। একটা সময় ওর মাথায় প্রচুর চুল ছিল। কোমর বেয়ে নেমে এসে পাছার কাছে চুলের ঢল লুটোপুটি খেত। বৃন্দাবনে আসার একমাসের মধ্যেই ও সেই চুল যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল। তখন যৌবন বাঁচানোর দরকার ছিল। এখন কদমছাঁট দেয় গরমের হাত থেকে বাঁচতে। ঠাণ্ডা জল ঘাড়, কান আর গলার পাশ দিয়ে নামছে। শরীরটা জুড়িয়ে গেল সেই স্পর্শে।

"এই গিধ্ধর, তু জুঠা পানি দিলি হামাকে? তুর সাহস তো কম না।" আচুকির ক্রুদ্ধ গলা শুনে ননীবালা চমকে তাকাল। "হামার তন জ্বলে যাচ্ছে রে। উ উ, আ আ। তুর কী হবে রে শালা।"

আচুকির ক্রোধ দেখে দোকানদার ভয়ে কাঁপছে। হয়তো ওই একই লোটার জল মুখ দিয়ে কেউ খেয়েছিল। ও খেয়াল করেনি। ননীবালা অবাকই। আচুকি বুঝল কী করে? হাত জোড় করে দোকানদার বলল, "মাফি মাঙ্গে মাইয়া। হামসে ভুল হো গৈল।"

কিন্তু ওকে অনেক কুকথা বলে শাপ দিল আচুকি, "তুর লেড়কার মু দিয়ে রক্ত উঠবে। বুড়বক, তখুন তু হামার কাচে আসবি।"

হাত ধরে টানল আচুকি। দু'জনে ফের হাঁটতে লাগল। আচুকির মুখটা দেখে বেশ ভয়ই পাচ্ছে ননীবালা। ওর কথা কিন্তু ফলে যায়। এর আগে প্রমাণ পেয়েছে। ভজনাশ্রমে ওর গায়ে একবার লাঠির খোঁচা মেরেছিল একজন জমাদারনি। আচুকি সেদিন চুল ছিঁড়ে শাপ দিয়েছিল, "তু হামার গায়ে ব্যথা দিলি। ব্রজমাইয়ের গায়ে ব্যথা দিলি। তুর এমন মৌথ হবে, শোচে গা ভি নেহি।" সত্যি সত্যিই তিন দিনের মাথায় সেই জমাদারনি খুব খারাপ ভাবে মরেছিল। গলি দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় ওর পেটে শিঙ ঢুকিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ননীবালা বলল, "তুই চেইত্যা গেলি ক্যান আচুকি?"

"দুকানের মালিক হারামি কা ঔলাদ। যাক, ছাড় উর কথা। তুর কপাল ভাল রে ননীবালা। হামাদের উখানে একজন সকালের ট্রিনে দেশে গিইচে। উর চৌকিতে তু থাকবি।"

ননীবালার ধন্ধ কাটে না। জিজ্ঞাসা করল, "গুরুকুলে তুই কি কানাই গোঁসাইয়ের আশ্রমে থাকস না কি?"

"হা, তু চিনিস।"

"শুনছি, হেই জায়গা না কি ভাল না?"

"কেনো?"

"যুবতী মাইয়া লইয়া না কি খারাপ খারাপ কাম হয়।"

"তুর কী?" আচুকি আবার রেগে উঠেছে, "তু যুবতী? তুর তো সব শুকিয়ে গেচে হামার মতোন। হামাদের ভয় কী?"

ধমক খেয়ে চুপ ননীবালা। আচুকি এ রকমই। রেগে উঠলে খুব খারাপ ইঙ্গিত করে। ও জানে না, ননীবালার সব শুকিয়ে যায়নি। এখনও ও রজস্বলা। তবে অনিয়মিত। হ্যা, বুকের দুটো খানিকটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আচুকির মতোন চিমসে হয়ে ঝুলে পড়েনি। কানাই গোঁসাইয়ের খুব বদনাম। কপালে কী লেখা আছে, কে জানে? বিমলা মাইয়ির ওখানে থেকে গেলেই ভাল করত। ক্ষেপি আচুকির কথা শুনে ও গুরুকুল যাচ্ছে। কম দূর নাকি?

সকালে ওখান থেকে আসবেই বা কী করে ননীবালা ভজনাশ্রমে? আচুকি সেই লাঠির খোঁচা খাওয়ার পর থেকে আর ভজনাশ্রম যায় না। গোবিন্দর মন্দিরে গিয়ে সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে রাধাকুণ্ডে যায়। সাধন মার্গে ও অনেক এগিয়ে আছে। ওর হাবভাব দেখে অন্তত তাই মনে হয় ননীবালার।

গোপীনগর কলোনির কাছে আসতেই আচুকি একেবারে অন্য মানুষ। বলল, "হ্যাঁরে ননীবালা, তুর আশিক ইস্কুটারে আসতিচে। ঘুমটা তু খুইলে রাখ। তুকে দিখুক।" বলেই ও খিকখিক করে হাসতে লাগল।

সামনের দিকে মুখ তুলে ননীবালা তখনই বনোয়ারীলালকে দেখতে পেল। অনেক দিন পর লোকটাকে ও দেখল। কী সুন্দর মজবুত শরীর ছিল। কী হয়েছে। কাঁধ ঝুলে গেছে। গাল বসে গেছে। এক পলক তাকিয়েই ননীবালার খুব কষ্ট হতে লাগল। ও আচুকির বাঁ দিকে সরে গেল। আচুকিটা কী? আর লোকটাও এদিকে আসার সময় পেল না? স্কুটার থামিয়ে আবার কথা বলা হচ্ছে আচুকির সঙ্গে! অনেকটা এগিয়ে ননীবালা একটা ইমলি গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

দু'তিন মিনিট কথা বলে বনোয়ারীলাল চলে গেল। রাগে ননীবালা আচুকির দিকে আর তাকালই না। সেটা বুঝতে পেরে আচুকিও আর কিছু বলল না। পিচের রাস্তা শেষ। তপ্ত বালির উপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। এলো মেলো হাওয়া, ধুলো উঠছে। ব্রজের রজ। পুণ্য লোকের পাথেয়। একদণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার জন্য ননীবালার সারা শরীর উন্মুখ এখন। কিন্তু আচুকি সিধে হয়ে হাঁটছে। রাস্তার পাশে পূতিগন্ধময় নর্দমা। শুয়োরের খোয়াড়। নর্দমার দিকে তাকিয়ে ননীবালা ভয় পেল, মাথা ঘুরে ও যদি পড়ে যায়, তা হলে উঠে আসতে পারবে না।

আরও মিনিট দশেক হেঁটে, অবশেষে লোহার বড় একটা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল আচুকি। এ দিকটায় আগে কখনও আসেনি ননীবালা। আশপাশে খেতি জমি। গেরস্ত চাষাদের বাস। বাড়ির সামনে উট দাঁড়ানো। তার মানে এদের পয়সা কড়ি আছে। জমি থেকে সদ্য ফসল কাটা হয়েছে। ধানের গোড়া খোচা খোচা হয়ে রয়েছে। বাড়ির বউরা বড় বড় ঘড়া মাথায় নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে ননীবালা একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লোহার দরজায় কিল মেরে শব্দ করছে আচুকি। চোখ মুখে বিরক্তি। সেটা বদলে যাচ্ছে রাগে। হঠাৎই বড় দরজার পেটের ছোট দরজাটা খুলে গেল। ননীবালার হাত ধরে টেনে আচুকি বলল, "আয়।"

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ননীবালা দেখল, সালোয়ার কামিজ পরা এক টা মেয়ে ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে। সেই খরদৃষ্টির সামনে একটু কুঁকড়ে গেল ননীবালা। মেয়েটা ওকে জরিপ করতে করতে বলল, "এডারে আবার কুথথেইক্যা ধইর‍্যা আনলা আচুকি?"

প্রশ্নের ধরম শুনে ক্ষিপ্ত আচুকি, "তুর কী রে মাগি, তুরে কইয়ে আনতে হবে?"

"গোঁসাই ঠাকুর জানে?"

"এই শুন, এ আশ্রম হামাদের জন্য। তুদের মতো রেন্ডি মাগিদের জন্য না।"

আচুকির গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন। অর্ধাহার আর অপুষ্টির সব চেহারা। পরনে থান দেখে মনে হওয়ার উপায় নেই একটা

সময় ওটার রঙ সাদা ছিল। কোনও রকমে আব্রু রক্ষার চেষ্টা। সবার চোখ মুখেই অপমান আর অবহেলার চিহ্ন। একেক জন যেন বেদনার প্রতিমা। হলঘরের অনুজ্জ্বল আলো ওদের রিক্ততা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

একজনকে ননীবালা চিনতে পারল। সাধনা। হনুমান বাগে প্রায়ই দেখা হয় ওর সঙ্গে। বিনা পয়সায় চা খেতে যাওয়ার সময়। সাধনাকে দেখে ননীবালা মনে মনে একটু বল পেল। তার মানে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল, হনুমানবাগে যাওয়ার। এখান থেকে অত সকালে সাধনা যদি হনুমানবাগ যেতে পারে, তা হলে নিশ্চয়ই কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে। আশ্রমে শুয়ে থাকতে ননীবালা পারবে না। আগে কখনও ও আশ্রমে থাকেনি। আশ্রমে নিজের ইচ্ছেতে চলা যায় না।

ননীবালাকে একটা প্লাস্টিকের টুল এগিয়ে দিয়ে আচুকি বলল, "তু ইখানে বস। হামি তুর জায়গা ঠিক করে আসচি।"

কথাটা বলেই ডানপাশের সিঁড়ি দিয়ে আচুকি উঠতে লাগল। উপর থেকে কুড়ি বাইশ বছরের একটা মেয়ে নেমে আসছিল। আচুকি হট যা বলে তাকে এমন খিঁচিয়ে উঠল যে, মেয়েটা ভয়ে জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। আচুকির এমন দাপট কেন, ননীবালার বোধগম্য হল না। বৃন্দাবনে বিধবারা শুধু বধির হয়েই না, বাকহীন হয়ে থাকতেই অভ্যস্ত।

আচুকি উপরে উঠে যাওয়ার পরই সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, " তুমারে কুথথেইক্যা ধইয়্যা আইনল?"

এখানে থাকতে হবে। কথার উত্তর না দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এখানে কার কত ক্ষমতা ননীবালার জানা নেই। তাই ও বলল, "বিমলা মাইয়ির বাড়ি থেইক্যা।"

"আইজ আইস, থাকো। কাইল গোঁসাই ঠাকুর ফিরব। ঠাকুর যা কইব, তাই অইব।"

এই সব বলে মেয়েটা বুঝিয়ে দিল, আচুকির শেষ কথা নয়। আশপাশের হা করে সবাই দেখছে ননীবালাকে। আশ্রমে নিজের কর্তৃত্বটা আরও ভাল করে বোঝানোর জন্য মেয়েটা খিঁচিয়ে উঠল, "এখানে রঙ্গ রস হইত্যাছে না হি। যাও সব ঘরে যাও।"

অভ্যর্থনাটা ঠিকমতো হল না। তবু ননীবালা বসে ওর ভবিষ্যত দেখতে লাগল। চার পাশে ছোট ছোট ঘর। তাতে চারটে করে চারপাই। একটা তেলচিটে বিছানা আর বালিশ। দেয়ালের খুটে মশারি ঝুলছে। মশারি দেখে চোখটা চকচক করে উঠল ননীবালার। শৃঙ্গার বটে প্রায় রাতে মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যেত। আচুকি তা হলে খুব খারাপ জায়গায় নিয়ে আসেনি। নিশ্চিন্তে একটু ঘুমনো যাবে। অনেকদিন পর।

ওপর থেকে নেমে আসার সময় আচুকির ধমক শুনেছিল যে মেয়েটি, হল ঘরের এক কোণে বসে সে স্টোভ জ্বালানোর চেষ্টা করছে। মেয়েটার মুখ কেমন যেন মায়া মাখানো। ননীবালা এতটুকু সহানুভূতির দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইল ওর দিকে। পেটে বাচ্চা এলে, ওর নিজেরই এই বয়সী একটা মেয়ে থাকত। না হয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। মায়া বাড়ত। মেয়েটা চা তৈরির উপকরণ সাজাচ্ছে। হাতের পুঁটলিটা মেঝেতে রেখে ননীবালা ওকে জিজ্ঞাসা করল, "অ মাইয়া, এট্টু জল খাওয়াইতে পারবা?"

মুখে কোনও কথা বলল না। আঙুল দিয়ে কলতলাটা ও দেখিয়ে দিল। হাতের কাছেই কল। ননীবালা লক্ষ্য করেনি। কল খুলে ও চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। আহ, জলের জন্য আর কষ্ট করে ওকে শৃঙ্গারবট মন্দিরের ভেতর যেতে হবে না। জলের লাইনে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্তানিদের গালাগাল আর শুনতে হবে না। একবার কল থেকে জল উপচে পড়ছিল দেখে, ও এক জনের লোটা কলের তলা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই অপরাধে ওকে সেদিন কিল-চড়-লাথি হজম করতে হয়েছিল। অপমান গায়ে মাখেনি ননীবালা। এও এক পরীক্ষা। মানব জন্ম থেকে উদ্ধার করার জন্য এ রকম কত পরীক্ষা গোবিন্দ নেবেন কে জানে?

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ননীবালা ফের টুলে এসে বসল। স্টোভে চায়ের জল ফুটছে।

মেয়েটা স্টোভের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। অন্য কারও সম্পর্কে যেন কোনও আগ্রহ নেই ওর। ভেতর থেকে আরেকটা মেয়ে বেরিয়ে এল। পরনে গেরুয়া রঙের শাড়ি। দু'হাত তুলে আলস্য ছাড়ানোর ভঙ্গি করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, তারপর হাই তুলে মেয়েটা বলল, "তুই সর চাঁপা। আমি চা করে দিই।"

ঠিক ওই সময়েই ওপর থেকে ডাকল আচুকি, "এই ননীবালা উঠে আয়।"

ছোট্ট পুঁটলিটা তুলে নিয়ে ননীবালা উপরে উঠে এল। ঠিক একতলার মতোই ছোট ছোট ঘর। তবে এক দিকে বড় ছাদ। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে কয়েকজন। ছাদের উপর থেকে ননীবালার চোখে পড়ল মন্দিরটাকে। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে নানা ধরনের ফুলের গাছ। মন্দিরের বাঁ পাশে আরেকটা ছোট বাড়ি। পাশ দিয়ে সিঁড়ি সোজা উঠে এসেছে এই ছাদে। আশ্রমে ঢোকার সময় ননীবালা বুঝতে পারেনি, আশ্রমটা এত বড়। ছাদের এক পাশে একটা ছোট ঘরে মাত্র দুটো চারপাই। সেখানে ঢুকে আচুকি বলল, "এটা তুর। উটা চাঁপার। বহুত আচ্ছা মেয়ে।"

"তুই থাকস কুথায়?"

"তুর কী দরকার? শুন কাল তু হামার সনে শৃঙ্গার বট যাবি। তুর বর্তন উর্তন যা আছে সব নি আসবি।"

ননীবালা মাথা নেড়ে বলল, "সে সব কী আর আছে রে। বেবাক লইয়্যা গেছে।"

"আছে, সব আছে। রিকশাউলার ঘরে হামি সব রেখে এয়েচি। কুন চিন্তা করিস না।"

বাসন বলতে তো একটা থালা, বাটি, আর মগ। বোধহয় এখানে লাগবে। থালাটা দিয়েছিল শর্মাজির বউ। মেয়ের বিয়ের খুশিতে। তাও ননীবালা সেটা পেত না কি? শর্মাজিদের দারোয়ান খবরটা দিয়েছিল বলে। দেরিতে গিয়ে ও দেখে, এনামেলের থালা সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে। খালি হাতে যখন ননীবালা ফিরে আসছে, তখন ওপর থেকে শর্মাজির বউ দেখতে পেয়ে ওকে দাঁড়াতে বলেছিল। এনামেল না, দিল স্টিলের বর্তন।

ওর সঙ্গে কথা বলেই আচুকি চলে গেছে ছাদের অন্য প্রান্তে। দু'তিন জনের সঙ্গে কথা বলে এসেই ননীবালাকে বলল, "চ, নীচে যাই। এবার রাধা মাইয়ের পুজো হবে।"

চৌকির ওপর বসে পড়েছিল ননীবালা। উঠে অন্যদের সঙ্গে নীচে নেমে এল। চা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সবাই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়েছে। জীর্ণ থান, শীর্ণ শরীর। কিন্তু কপাল ও নাকে রসকলি উজ্জ্বল। গলায় ঝোলানো জপের ঝোলা। বিভিন্ন বয়সী বিধবা। পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে। কারও কোমর বেঁকে গেছে। কারও কমেছে হাঁটুর জোর। তাই হাতে লাঠি। মন্দিরের দালানে গিয়ে একে একে বসছে। অনেকেরই আঙুল নড়ছে জপের থলেয়। ঠোঁট নড়তে দেখে সেটা ননীবালা বুঝতে পারল।

মন্দিরে বিগ্রহ বলতে কৃষ্ণ। রাধা নেই দেখে ননীবালা একটু অবাকই হল। ঢোকার সময় লোহার গেটের সামনে যে মেয়েটাকে আচুকি ধমক দিয়েছিল, সে-ই সন্ধ্যারতির সব জোগাড় করছে। স্নান সেরে মেয়েটা গেরুয়া শাড়ি পরে নিয়েছে। ভেতরে কিছু পরেনি। ওর ভরাট দুটো স্তন দেখে ননীবালার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে গেল। এই মেয়েটার মধ্যে বেশ আলগা চটক আছে। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর কাজ করে যাচ্ছে। ঠাকুর সম্পর্কে ভক্তি না থাকলে এমন নিষ্ঠা আসে না। পাশে এসে বসল আচুকি। ননীবালা জিজ্ঞাসা করল, "মন্দিরের ভিতর সব জুগাড় করতাসে, মাইয়াডা কে?"

"ও জয়ামঞ্জরী।" আচুকি বলল, "গোঁসাই ওরে লিয়ে এয়েচে জলপাইগুড়ি থেকে।" "এহানে রাধার বিগ্রহ নাই ক্যান?"

বাঁ পাশ থেকে উত্তর দিল সাধনা, "এরা রাধামাধবী সম্প্রদায়। এখানে রাধার মূর্তি নেই। তবে সিংহাসনের উপর মুকুট রেখে রাধার সেবা হয়। ওই দেখো।"

ননীবালা দেখল সত্যিই সিংহাসনের উপর একটা মুকুট রাখা আছে। শ্রীকৃষ্ণর মুকুটের মতোই। জয়ামঞ্জরী খুব সুন্দর সাজিয়েছে বিগ্রহকে। বেলি ফুলের গন্ধ ভেসে বেরাচ্ছে সারা চত্বর জুড়ে। ফুলের ঘ্রাণে মন জুড়িয়ে গেল ননীবালার। চোখ বুঁজে রাধামাধবের মূর্তিটা ও বুকে বসিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

কথা বলায় উৎসাহ পেয়ে গেছে সাধনা। বলল, "এদের নিয়মকানুন সব আলাদা দিদি। আগে বুঝতুম না। এরা আগে রাধাকে ভোগ দিয়ে তবে কৃষ্ণকে প্রসাদ দেয়। বসনভূষণ ও আগে রাধাকে উৎসর্গে করে তবে কৃষ্ণকে পরাবে। একেবারে অন্য রকম নিয়ম। কারও সঙ্গে মিলবে না গো দিদি। দেখো, ভোগে কোথাও তুলসী পাতা নেই।" চোখ খুলে ননীবালা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কয়দিন আছ এহানে?" "তা মাস ছয়েক হয়ে গেল। এখানে একটা জিনিস ভাল। উপোস করা নেই। একাদশী করা নেই। গোঁসাই ঠাকুর বলেন, কৃষ্ণসাধন করার কোনও দরকার নেই। রাধামাধবকে ভোগবিলাসের মাধ্যমেও পাওয়া সম্ভব।"

"কও কী, এতদিন বৃন্দাবনে পইড়্যা আছি। কহনও তো এমন কথা শুনি নাই।"

"এদের মতে, রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে করা বউ। ব্রহ্মা দু'জনের বিয়ে দিয়েছিলেন ভাণ্ডার বনে এসে। গোঁসাই ঠাকুর আসুক। ওর মুখে একদিন পাঠ শুনো। তাতেই সব বুঝতে পারবে।"

মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হতেই সাধনা চুপ করে গেল। ফের চোখ বুঁজে

ননীবালা ভাবতে লাগল, এতদিনে একটা মনের মতো জায়গা পেল। এখানে ইচ্ছে মতো ডাকা যাবে গোবিন্দকে। এতদিন পার হয়ে গেল বৃন্দাবনে। তেমনভাবে ঠাকুরকে ডাকতে পারল কই? কথাটা যতই ভাবতে লাগল ততই আত্মগ্লানিতে ভুগতে লাগল। ওই যে জয়ামজুরী বলে মেয়েটা ভক্তিবিনম্রচিত্তে মন্দিরের ভেতরে বসে আছে, ওকে দেখেই ননীবালা বুঝতে পারছে, একেবারে আত্মনিবেদিতপ্রাণ। ওর মতো নিজেকে আজও গোবিন্দর হাতে তুলে দিতে পারল না ননীবালা। যৌবনে নিজেকে বাঁচানোর আর এখন নিজে বাঁচবার জন্যই তো নষ্ট করে ফেলল এতগুলো বছর।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর যখন আচুকির সঙ্গে ছাদে বসে ননীবালা কথা বলছে, তখন নীচে গেটের কাছে হঠাৎ হই চই। ওরা ওপর থেকে দেখল, একজন মাঝবয়সী বউ গেট খুলে দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। দেখেই আচুকি বলল, "অব মজা আয়া না? ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, ইধর আ কর রোনা শুরু কর দিয়া। শালে উও মিঠাইওয়ালে উসকো আওরাত কো ভেঝা। দেখা ননীবালা।"

আকাশে গোল চাঁদ। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আশপাশের চাষাদের বাড়ির লোকজনও কান্না শুনে গুটিগুটি করে হাজির হয়েছে গেটের সামনে। বউটা জটাধারী মাইয়াকে চাইছে। পা ধরে ক্ষমা চাইতেও রাজি। যত টাকা চায়, দেবে। জটধারী মাইয়া শুধু ওর একলৌতা বেটাকে বাঁচিয়ে দিক। ডাকদারবাবু জবাব দিয়ে রেখেছে। বউটার ওই রকম কান্না দেখে ননীবালাও গলে গেল। আচুকিকে ও বলল, "চল, নীচে চল।"

গেট খুলে ওরা বাইরে আসতেই বউটা পা জড়িয়ে ধরল আচুকির, "মাইয়ি, তু মাফ করে দে মাইয়ি। আমার ছেলেটাকে তু বাঁচা।"

আচুকি তাও নরম হবে না। বলল, "পাও ছোড়। তুর আদমির ঘমণ্ড বেড়ে গেছিল। তাই শিক্ষা দিলাম।"

"আমার ছেলে তো কোনও দোষ করেনি মাইয়ি। ওর ওপর শোধ তুলছ কেন?"

"যা যা, ইখানে চিল্লাচিল্লি করিস না। কাল সকালে ঠিক হয়ে যাবে।" নিজের একটা চুল ছিঁড়ে বউটার হাতে দিল আচুকি। "বালিশের তলায় ইটা রাখবি। কাল সকালে তুর ছেলেকে হামার কাছে নি আসবি।"

আচুকিকে প্রসন্ন হতে দেখে, খুশি হয়ে বউটা চলে গেল। গেট বন্ধ করে উপরে উঠতে উঠতে ননীবালা বলল, "কী কইব্যা এইডা হইল রে আচুকি।"

'তুর জানার কী দরকার?" বলে খিচিয়ে উঠল আচুকি। ছাদে পৌঁছতেই ওর অন্য মেজাজ। নরম গলায় বলল, "ইখানে তুর কেমন লাগল রে ননীবালা?"

"ভাল।"

"তু থাকবি তো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু অরা থাইকতে দিবো? গোঁসাই যদি থাইকতে না দেয়?"

"ওর বাপ থাকতে দিবে। শুন, একটা দরকারে তুকে ইখানে নে আলাম।"

"কিসের লইগ্যা?"

"ইখন কইব না। তু শুধু চাঁপাকে দেখবি। ঠিক আচে?

আচুকির অনেক কথা ননীবালা বুঝতে পারে না। ও তবুও পাল্টা প্রশ্ন করল না। আবার যদি খিচিয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে ও দেখল চাঁপা আসেনি। বোধহয় নীচে কোনও কাজে ব্যস্ত। চারপাইতে শুতেই রাজ্যের ঘুম ওর চোখে নেমে এল।

অনেক রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল ননীবালার। কান্নার শব্দে। মশারির নীচে ধাতস্থ হতে সময় নিল ও। দরজাটা হাট করে খোলা। জ্যোৎস্নার আভায় ও দেখল পাশের চৌকিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে চাঁপা। ফোঁপানির শব্দটা উঠে আসছে ওর ওখান থেকেই। অমন ফুটফুটে মেয়েটা গভীর রাতে একান্তে কাঁদছে কেন ননীবালা বুঝতে পারল না।

টুনডলা স্টেশন থেকে লাবণ্যপ্রভা সিনহাকে নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে ফিরছে রাজা। ভদ্র মহিলা যে সম্ভ্রান্ত ঘরের, তা এক নজরেই বোঝা যায়। চরণদাস বাবাজি আসার সময় বলে দিয়েছিলেন, ইনি ওয়েস্ট বঙ্গালের কোন এক জমিদার বংশের কুলবধূ। তাই যত্ন আত্তির যেন কোনও অভাব না হয়। কুলবধূ কথাটার মানে তখন বোঝেনি রাজা। এমন কয়েকটা বাংলা শব্দ আছে যার মানে বোঝো ওর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কানে খট করে বাঁধে। টুনডলা রওড়া হওয়ার আগে ও যখন বাড়িতে ফোন করে জানাচ্ছিল দুপুরে খেতে যাবে না, তখন ভাবির কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল কুলবধূ কথার মানেটা।

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে বিধবা। চুলের মাঝখানে সিন্দুর নেই। এখানে বিবাহিত ব্রজবাসিনীরাও সিন্দুর দেয় না। তবে কে বিবাহিত তা বোঝা যায়। মঙ্গলসূত্র দেখে। মিসেস লাবণ্যপ্রভার গলায় মঙ্গলসূত্রও নেই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ভদ্রমহিলার মধ্যে মা মা ব্যাপার আছে। কথা বলছেন বেশ সন্দুর। বৃন্দাবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইছেন। গাড়িতে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত, দেখে তো মনে হচ্ছে না, কোনও কিছু অপছন্দ হয়েছে। যদি পরে চরণদাস বাবাজির কাছে উনি কমপ্লেন করেন, তা হলে রাজা খুব অপদস্থ হয়ে যাবে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, চরণদাস বাবাজি আর কোনও দিন গাড়ির জন্য বলবেন না।

মিসেস লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে এসেছেন ওঁর মেয়েও। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। স্টেশনে মেয়েটাকে দেখেই রাজার বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠেছিল। এত মেয়ে ওর কাছে আসে, কিন্তু কোনও দিন কাউকে দেখে এই রকম অনুভূতি ওর হয়নি। এত স্নিগ্ধ রূপ কারও হয়! মনে হচ্ছে গোল্যাপের পাঁপড়ি দিয়ে তৈরি। না, না, গোলাপের পাঁপড়ির ঠিক তুলনা হল না। গাড়ি চালাতে চালাতে ও অনেকক্ষণ ধরে তুলনাটা ভাবছে, কিন্তু মনে আনতে পারছে না। পরনে অতি সাধারণ একটা সালোয়ার কামিজ। তাতেও অপূর্ব লাগছে দেখতে। লুকিং গ্লাস দিয়ে বেশ কয়েকবার রাজা মেয়েটাকে দেখেছে টুনডলা থেকে আগ্রা আসার পথে। কিন্তু একবার চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার পর রাজা আর ঝুঁকি নিচ্ছে না। পাছে কোনও কমপ্লেন হয়ে যায়।

হাইওয়েতে মেয়েটা একবার প্রশ্ন করেছিল, "ড্রাইভার, এই রাস্তা থেকে কি তাজমহল দেখা যাবে?"

সম্বোধনটা শুনে রাজা চমকে উঠেছিল। নতুন ইন্ডিকার কাগজপত্র হাতে পায়নি বলেই ও গাড়িটা ড্রাইভারের হাতে দেয়নি। নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। একাবর ভাবল ভুলটা ভাঙিয়ে দেয়। পরক্ষণেই ওর মনে হল, কোনও দরকার নেই। এত সাধারণ পোশাক পরে ও এসেছে যে, ওকে ড্রাইভার বলে ভাবাটাই স্বাভাবিক। যাক, মেয়েটাকে লজ্জা দিয়ে লাভ নেই। তবে উত্তরটা দিয়েছিল ইংরাজিতে, "নো ইউ কান্ট। ইউ হ্যাভ টু গো ডাউন রাইট। সে ওয়ান অ্যান্ড হাফ কিলোমিটার। শ্যাল আই গো দেয়ার মিস সিনহা?"

মেয়েটার রিঅ্যাকশন কী হতে পারে, তা দেখার জন্য রাজা সেই সময় একবার লুকিং মিররের দিকে তাকিয়েছিল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা একবার কাঁধ নাচাল। তার পর বলল, "নো নো নট নাউ। ড্রাইভ স্ট্রেট টু বৃন্দাবন। ইটস অল রেডি সিক্স ও'ক্লক।"

"অ্যাজ ইউ উইশ।" বলেই রাজা মনে মনে হেসেছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে ও মা আর মেয়ের ডায়লগ শুনে বেশ মজা পাচ্ছে মাঝে মাঝে। মেয়ে বোধহয় ঠাকুর দেবতা কিছু মানে না। মা যতই বলছে, আছে। বৃন্দাবনে গেলে সেটা টের পাবি, মেয়ে ততই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছে। মিসেস লাবণ্যপ্রভার কথাবার্তায় ও বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা এর আগেও বৃন্দাবন এসেছেন। অনেক কিছু জানেন। এখানে এদের প্রপার্টি যিনি দেখেন, তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখেন।

লাবণ্যপ্রভা বলছেন পুরনো দিনের কথা, "প্রথম বার এসেছিলাম তোর দাদুর সঙ্গে। ঝুলনের পর। প্রায় মাস দুয়েক ছিলাম। গোকুল, বরষানা, নন্দগ্রাম কত কী দেখেছিলাম। তোর দাদু সে বার এই বৃন্দাবনেই ব্রজ পরিক্রমা করতে এসে দেহ রাখলেন। তারপর আর আসতে ইচ্ছে হয়নি।"

মেয়ে খিল খিল করে হেসে বলল, "মাম, তুমি বন্দাবনে ঢোকার আগেই এখানকার লোকেদের মতো কথা বলছ।"

লাবণ্যপ্রভা একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "তার মানে?"

"এই যে বললে, দাদু দেহ রেখেছিলেন?"

"এই কথাটাই তো ভাল শোনায়, তাই না? তুই জানিস এই বৃন্দাবনে দেহ রাখা কত পুণ্যের?"

"মাম, তুমি একবার আমাকেও এখানে নিয়ে এসেছিলেন, না?"

"হ্যাঁ। তখন তোর বয়স দশ এগারো বছর। এসেছিলাম পঞ্চম দোলের আগে। বাব্বা, তোর মনে আছে তো।"

"খুব আবছা আবছা। দাদার সঙ্গে কার কী একটা ঝামেলা হয়েছিল যেন মাম?"

"তোর দাদার কথা ছাড়। সেই শেষবার, আর আসিনি। সে বার খুব ইচ্ছে ছিল ব্রজ পরিক্রমায় যাব।"

"ব্রজ পরিক্রমাটা কী মাম?"

"এখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলো সব ছড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে চুরাশি ক্রোশ এরিয়া জুড়ে। হেঁটে পুরোটা ঘুরে আসতে লাগে চব্বিশ দিন। বৃন্দাবনের আরেক নাম ব্রজভূমি। তাই এই ঘুরে আসাটাকে বলে ব্রজ পরিক্রমা।"

রাজা এই সুযোগটা ছাড়ল না। গাড়ি গছানো দরকার। তাই বলে উঠল, "এখন অবশ্য সবাই হেঁটে পরিক্রমা করে না। অনেকে গাড়ি ভাড়া করে ঘুরে আসে। এক দেড় দিনেই হয়ে যায়।"

মেয়ে বলল, "বেশ ইন্টারেস্টিং তো মাম। এক ধরনের ট্রেকিং। একা একা করা যায়? রাজা বলল, "না। তার কোনও মানে নেই। পাণ্ডারা দল বেঁধে করায়। বনে তাঁবু খাটিয়ে থাকে। কেউ কেউ একা একাও করে।"

"বন মানে, সত্যিকারের ফরেস্ট?"

'ব্রজ পরিক্রমায় তো দ্বাদশ বন মানে বারোটা বন পেরোতে হয়।" লাবণ্যপ্রভা বললেন, পদ্মপুরানের একটা শ্লোকও তোর দাদু আমায় মুখস্ত করিয়েছিল। কী যেন... দাঁড়া, মনে করছি, ভদ্র শ্রীলৌহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদিরকাঃ বহুলা কুমুদ কাম্যং মধু... যাঃ বাকিটা ভুলে মেরে দিয়েছি।"

"মাম, তুমি কী বললে কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

মেয়ের অজ্ঞতা দেখে হাসছেন লাবণ্যপ্রভা। বললেন, "এই যে তুই বললি, বৃন্দাবনে আসার আগে হোম ওয়ার্ক করেছি?"

"সে তো এখানকার বিধবাদের নিয়ে আমার স্টাডি পেপারের জন্য। দ্বাদশবন আমার কাজে লাগবে নাকি?"

"শোন, এখানে ভদ্র বন, মধু বন, লৌহ বন, মহাতাল বন, ভাণ্ডীর বন— এই রকম অনেক বন আছে। প্রত্যেকটা বনের সঙ্গে একেকটা মিথ জড়িয়ে আছে।"

"যেমন, শুনি?"

"যেমন ধর মধু বন। ওখানে শ্রীকৃষ্ণ মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন। যেমন ধর, তাল বন। ওখানে থাকত ধেনুকাসুর বলে এক অসুর। ওই বনে তাল পাড়তে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ আর বলরাম। ব্যস, ধেনুকাসুরের সঙ্গে ওদের যুদ্ধ লেগে গেল।"

"অবভিয়াসলি কিষাণ-বলরামই জিতেছিল। একেবারে হিন্দি ফিল্ম, মাম। সামান্য তাল নিয়ে কারও সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে?"

"যাঃ, ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে নেই মিঠু। তোর দাদুর জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছিল, এখন শুনলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। ওই ব্রজ পরিক্রমার সময়।"

গাড়ি ড্রাইভ করার সময় কান খাঁড়া করে মা ও মেয়ের কথা শুনছে রাজা। এতক্ষণে মেয়ের নামটা জানতে পারল। মিঠু। বাহ্, বেশ চমৎকার নামটা তো। নিশ্চয়ই এটা ভাল নাম নয়। একটা ভাল নাম আছে মেয়েটার। রাজা মনে মনে বার কয়েক উচ্চারণ করল মিঠু নামটা। ওর বেশ ভাল লাগছে।

লাবণ্যপ্রভা বেশ গল্প করার মেজাজে, "তোর দাদু সে বার পরিক্রমায় গেছেন তোর দিদা আর আরও কয়েকজনকে নিয়ে। ভাদ্দর মাস। খুব গরম। বয়স হলেও তোর দাদু খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। বনের ভেতর দিয়ে একা একাই অনেকটা এগিয়ে গেছেন। মাঠের মধ্যে হঠাৎই ওঁর প্রচণ্ড তেষ্টা পেল। কিন্তু জল পাবেন কোথায়? ধূ ধূ মাঠ। আশপাশে বাড়ি ঘরের কোনও চিহ্ন নেই।"

মিঠু বাধা দিয়ে বলল, "কেন মাম, তখন বটলে করে সঙ্গে জল নিয়ে যাওয়া যেত না?" "ধুর, তা হলে আর তীর্থ হল কী? কষ্ট না করলে কী কেষ্ট পাওয়া যায় রে? ওই কষ্টের জন্যই তো পরিক্রমা। তারপর কী হল শোন। তোর দাদু একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, "রাধা মাই, একটু জল না পেলে তো আর হাঁটতে পারি না। কথাটা বলার পরই আশ্চর্য, তোর দাদু দেখে কিনা, একটা দেহাতি মেয়ে মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে উদয় হয়েছে। তোর দাদু মেয়েটার কাছে জল চাইতেই সে ঘড়া থেকে জল দিতে শুরু করল। সেই জল যেন অমৃত। তোর দাদু আজলা করে প্রাণ ভরে জল খাচ্ছে। হঠাৎ ওঁর মনে হল, তোর দিদারও নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে উনি ডাকলেন। জল খাবে তো খেয়ে নাও। শুনে তোর দিদা অবাক। কোথায় জল, কে দেবে? দিদা এই কথাটা বলতেই শ্বশুর মশাই বললেন, এই যে একটা মেয়ে এই মাত্র আমায় জল দিয়ে গেল। সে কোথায় গেল? তার আর পাত্তাই নেই। কেউ বিশ্বাস করে না।"

মিঠু বলল, "মাম, এটা সত্যি ঘটনা, না গাঁজাখুরি?"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুই পিসিমাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।"

রাজা বলল, "আমি একটা কথা বলব মিসেস সিনহা? আপনার ফাদার ইন ল খুব পায়াস লোক ছিলেন। বাংলা ভাষায় কী বলে যেন পুণ্যাত্মা লোক।"

"তুমি ঠিক বলেছ বাবা। সে দিন আমার শাশুড়ি পর্যন্ত বিশ্বাস করেননি। তখন শ্বশুর মশাই দেখালেন, আজলা করে জল খাওয়ার জন্য ওঁর পাঞ্জাবির হাতা দু'টো তখনও ভিজে আছে।"

লাবণ্যপ্রভা কথা শুনতে শুনতেই আগ্রা-মথুরা রোড থেকে ডান দিকে টার্ন নিল রাজা। ছিটকড়ির দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বৃন্দাবন। কে জানে, জীবনে আর কোনও দিন দেখা হবে কী না মেয়েটার সঙ্গে? কথা চালু রাখার জন্য ও বলল, "আসল কথা হচ্ছে বিশ্বাস। সেই মন নিয়ে বৃন্দাবনে আসতে হবে। আমাদের এখানে নিকুঞ্জ বন বলে একটা জায়গা আছে। রাতে সেখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। শোনা যায়, ওখানে নাকি এখনও রাসলীলা হয়।"

পিছন থেকে মিঠু এ বার জিজ্ঞেস করল, "রাতে থাকতে দেওয়া হয় না কেন?"

"ওখানে কেউ রাত কাটালে কেউ সুস্থ অবস্থায় ফেরে না।"

"কেন? কৃষ্ণ তাকে মার্ডার করিয়ে দেয়?"

"মিস সিনহা, তা জানি না। এই কিছুদিন আগে আগ্রা মেডিকেল কলেজের দুটো ছেলে লুকিয়ে ওখানে রাত কাটাতে গিয়েছিল। পরদিন সকালে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যজন বহুদিন উন্মাদ অবস্থায় কাটানোর পর মথুরার হাসপাতালে মারা যায়। রাতে বনের ভেতর ওরা কী দেখেছিল, পুছতাছ করা যায়নি।"

"অদ্ভুত জায়গা তো! আমাকে দেখাতে পারবে?"

"জরুর। তবে ইন ব্রড ডে লাইট। রাতের বেলায় একটা বান্দরও ওখানে থাকার সাহস পায় না।"

লাবণ্যপ্রভা এতক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী বাবা?"

"রাজা।"

"আফ্রিকার।" রাজা স্পষ্ট শুনল মায়ের কানে ফিসফিস করে কথাটা বলল মিঠু। ওর গায়ের রঙটা কালো বলে ঠাট্টা করল। অন্ধকার হয়ে গেছে। লুকিং মিরর দিয়ে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না পিছনটা। মা মৃদু ধমক দিলেন মেয়েকে। "তুমি বড্ড চিপ কথাবার্তা বলছ আজকাল।"

লাবণ্যপ্রভা এ দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তুমি কি বাঙালি? এত সুন্দর বাংলা বলছ?

"হ্যাঁ। আমার জন্ম এখানে।"

"তোমাকে ডাকলে সময়-অসময়ে পাওয়া যাবে তো বাবা?"

"নিশ্চয়ই। চারণদাস বাবাজিকে ফোন করে দেবেন। অথবা আমার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে রাখতে পারেন। নামার পর আমি আমার কার্ড দিয়ে দেব। আপনারা কি এখানে কিছু দিন থাকবেন?"

ইচ্ছে তো আছে। বলতে পারো কলকাতার মায়া প্রায় কাটিয়ে এসেছি। আমার পায়ে একটা বেড়ি আছে। সেটা কাটতে পারলে আমার নিশ্চিন্ত।"

পায়ের বেড়ি কথাটা রাজা বুঝতে পারল না। মাথায় রাখল। পরে ভাবিকে মানেটা জিজ্ঞেস করে নেবে। মিসেস সিনহার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল রাখা দরকার। এ রকম ধনী মহিলারা গাড়ি ছাড়া এক পাও চলতে পারেন না। এমনও হতে পারে দশ বারো দিনের জন্য গাড়ি নিয়ে রাখতে পারেন। কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা কামাই হয়ে যাবে। মন্দ কী?

মথুরা বাজারের কাছে ঢুকে পড়েছে রাজা। খুব থিঞ্জি রাস্তাটা। দু'পাশে সারি সারি দোকান। লোকের ভিড়। দোকান ও রাস্তার আলোয় পিছনের দু'জনকে রাজা দেখতে পাচ্ছে লুকিং মিরর দিয়ে। মিঠু মায়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ বকবক করে বোধহয় টায়ার্ড।

নতুন ইন্ডিকায় যাতে আঁচড় না লাগে তার জন্য খুব সাবধানে চালাচ্ছে রাজা। এখানকার টেম্পো ড্রাইভারগুলো খুব বাজে। এক গাদা প্যাসেঞ্জার তুলবে। ট্র্যাফিক আইন মানবে না। আর রিকশাওয়ালাদের তো কথাই নেই। যেন ওদের বাপের রাস্তা। যে কোনও সময় গাড়ির রঙ চটিয়ে দিতে পারে। আগে গাড়িকে সবাই ভয় করত। এখন গাড়ি সবাইকে ভয় খায়। কী জামানা এসে গেছে!

গাড়িটা জ্যামে আটকে থাকা অবস্থায় পকেটের মধ্যে মোবাইলটা বেজে উঠল। সঙ্গীতা ভাবির গলা, "ভাইয়া, তুমি এখন কোথায়?"

"ক্যা হুয়া ভাবী?"

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আমায় উদ্ধার করো।"

"কে কী করল?"

"আরে তোমার সেই আমেরিকান মেয়েটা... আজ বিকেলে বাড়িতে এসে হাজির। এখনও বসে আছে। বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাজা। এই সামান্য ব্যাপার? বছর দুয়েক আগে এই

আমেরিকান মেয়েটা— স্টেফানি প্রথম সাহেবদের মন্দিরে আসে। তখন রবার্ট বলে একটা ছেলে ওর সঙ্গে ছিল। দু'জনেই কৃষ্ণভক্ত। স্টেফানি নাম নিয়েছিল নির্মলা দাসী। আর রবার্ট সেবানন্দ দাস। সে বার মাস তিনেকের মতো ওরা এখানে মন্দিরের গেস্ট হাউসে কাটিয়ে যায়। রাজার গাড়িটা তখন প্রায়ই ওরা ভাড়া নিত। গত বছর মেয়েটা একা এল। দরকার-অদরকারে রাজার কাছে চলে আসত। স্টেফানি মেয়েটার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল।

হঠাৎ ওর আচার আচরণে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে রাজা। কেমন যেন প্রেম প্রেম ভাব। গাড়ির মধ্যে জড়িয়ে ধরে মেয়েটা ওকে একদিন চুমুও খেয়েছিল। তারপর একদিন গেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে গিয়ে... বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। রাজা প্রত্যাখান করে চলে আসে। মেয়েটা পরদিনই আমেরিকায় চলে যায়। সমস্যাটা নিয়ে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে রাজা। ওর দৃঢ় ধারণা, প্রেম ট্রেম কিছু না। স্টেফানি বিয়ে করতে চায়, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপটা পাওয়া সহজ হবে বলে। রাজাকে বিয়ে করলে পাকাপাকিভাবে বৃন্দাবনে থাকা যাবে। ধর্মেন্দ্র যা-ই বলুক, স্টেফানি মেয়েটা কিন্তু খারাপ মেয়ে না। কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের কথা বলেছিল, এটা রাজা বিশ্বাস করে না।

ভাবিকে ও বলল, "মেয়েটাকে তুমি কাটাও ভাবি। বলো, রাজা দিল্লিতে গেছে। আজ রাতে ফিরবে না।"

"তা হলে যদি রাতে থাকতে চায়, তোমার ঘরটা খুলে দেব?"

"দিল্লাগি করো না ভাবি। দুপুরে পেটে কিছু পড়েনি।"

"দিল্লাগি বলছ? এ দিকে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিল। আমি তুলসী তলায় যাচ্ছি, তো পিছু নিচ্ছে। সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করছি, তো মন্দিরে উঠে পড়ছে। সব ছোঁয়াছুয়ি করে দিল। হাজার প্রশ্ন। এটা কেন হয়, ওটা কেন হয়? ভ্যাগ্যিস ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলে পড়াশুনো করেছিলাম। না হলে ওর ভয়ে আমাকে চৌবেদের বাড়িতে পালিয়ে যেতে হত।"

"তুমি এত এন্টারটেন করছ কেন ভাবি?"

" কী করব বলো। আফটার অল, একজন প্রেমিকা, আমেরিকান রাধা, তাকে তো গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি না। যাক গে, তোমার জন্য মিথ্যে কথা বলে আজ পাপ করছি বটে, কিন্তু নির্মলা দাসীর যা প্রেম দেখলাম তোমার উপর, তাতে মনে হয়, তুমি বেশি দিন পালিয়ে থাকতে পারবে না।"

পিছনে বসে মা ও মেয়ে নিশ্চয়ই কৌতূহলভরে কথাগুলো শুনছে। হঠাৎ খেয়াল হওয়ার রাজা সাবধান হয়ে গেল। কথা ঘোরানোর জন্য বলল, "সমীর বেটা কী করছে ভাবি?"

"কী আর করবে? আমেরিকান চাচীর কোলে এখন বসে রয়েছে। ওর জন্য ডেট্রয়েট থেকে খেলনা এনেছে চাচী। বেশ গুছিয়েই নেমেছে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"জেঠানির জন্য কিছু আনেনি।"

"এনেছে। ভোগান্তি।"

"সেটা কী ভাবি?"

"পরে নিজেও বুঝবে। চাচী সামনেই বসে আছে। জুলজুল করে তাকাচ্ছে। ভাগ্যিস, বাংলাটা ওকে শেখাওনি। ফোনটা ওকে দেব নাকি?

রাজা আঁতকে উঠে বলল, "প্লিজ ভাবি না না। আমি ছাড়ি।"

বলেই লাইনটা ও কেটে দিল। সামনের জ্যাম কেটে গেছে। গাড়ি স্টার্ট করে রাজা ফের কাটিয়ে এগোতে লাগল। এখানে কুড়ির বেশি স্পিড তোলা যাবে না। গাড়ি চালাতে চালাতেই ও ভাবল, স্টেফানি নিয়ে তো আচ্ছা মুশকিল হল! বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। আসলে কী চায় ও? বিয়ে করার জন্য ভারতীয় ছেলের অভাব নেই বৃন্দাবনে। তা হলে? আমার মধ্যে কী এমন স্টেফানি দেখল? নিজের কাছে বার কয়েক প্রশ্ন করেও রাজা উত্তরটা বের করতে পারল না।

বৃন্দাবন-মথুরা রোডে এসে রাজা রাস্তা ফাঁকা পেয়ে গেল। দোকান পাট নেই বললেই চলে। কাছেই পাগলা বাবার আশ্রম। মায়ের সঙ্গে দু একবার এই আশ্রমে এসেছে রাজা। তখন এতটা রমরমা ছিল না। উমা ভারতী এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে চেহারাই ফিরে গেছে। উজ্জ্বল আলোয় বেশ লাগছে দেখতে।

মন্দিরের বাইরের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়েছে মিঠুর। ও বলে উঠল, "মাম, পাগলা বাবার এখানে আমাকে একবার আসতে হবে।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "কেন রে?"

"ওই স্টাডির জন্য। উমা ভারতী বিধবাদের জন্য এখানে একটা আশ্রম খুলেছে। এখানে এসে বিধবাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"কাগজে পড়েছি, এরা এখানে খুব কষ্টে আছেন। তোর স্যারও তো সেদিন বাড়িতে একই কথা বলল। এদের জন্য কেউ ভাবেনও না।"

"মাম, তোমার তো এত টাকা, এদের জন্য কিছু করে দাও না।"

"তুই কর না। কত টাকা লাগবে? একটা ভাল কাজে লাগুক।"

মা আর মেয়ের কথা চুপচাপ শুনছে রাজা। মনে মনে হাসছে। টাকাগুলো জলে দেবে আর কী। এখানকার বিধবাদের নিয়ে আজকাল খুব চর্চা হচ্ছে চারদিকে। রাজার মোটেই পছন্দ নয় ব্যাপারটা। সত্যি বলতে কী ওয়েস্ট বঙ্গাল থেকে আসা বাঙালিদের জন্য এখানে সম্মান নিয়ে চলাই দায় হয়ে পড়েছে রাজাদের। এখানে রিকশাওয়ালারা প্রায় সবাই বাঙালি। বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে যে মেয়েগুলো তারা অনেকেই বাঙালি। মন্দিরের সামনে বসা ভিখারিরা বাঙালি। এখানকার হিন্দি কাগজে প্রায়ই ধর্ষণের খবর বেরোয়। ধর্ষিতারা বেশিরভাগই বাঙালি।

রাস্তা ঘাট থেকে যখন তখন বাঙালি মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা এখন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দি কাগজ বেশ রসিয়ে রসিয়ে লেখেও। বৃন্দাবনে অনেক জাত আর ভাষাভাষী লোক বসবাস করে। তাদের ঘরের মেয়েদের কিছু হয় না। যত ধর্ষণ বাঙালি মেয়েদের। মেয়েটার বয়স পনেরো হতে পারে, অথবা মহিলার বয়স চল্লিশ। তাতে কিছু আসে যায় না।

সব থেকে বিরক্তিকর হল, বিধবা বুড়িগুলো। মাঝে মাঝির কাছে এসে কয়েকটা বুড়ি খুব প্যানপ্যান করত। ওদের দেখেই রাগ হত রাজার। এরা এখানে আসে কেন? দেশে থাকতে পারে না? মাম্মি বলত, "ও রকমভাবে বলিস না। আহা রে, দেশ থেকে ছেলে বউয়ের লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে এসেছে। কোথায় আর যাবে?" রাজা বলত, এখানে তো আরও বেশি লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। তা হলে পড়ে থেকে শুধু শুধু বাঙালিদের বদনাম করছে কেন?"

রাজা মাঝে মাঝে ভাবে, ওর হাতে যদি তেমন ক্ষমতা থাকত, তা হলে একদিনে ট্রেন ভর্তি করে সব বিধবাকে ওয়েস্ট বঙ্গালে পাঠিয়ে দিত। মুশকিল হচ্ছে, মায়ের মতোই সহানুভূতির কথা বলে বড়িদিদি। বিধবাদের জন্য করতে গিয়ে অনেক শত্রু বাড়িয়ে ফেলেছেন। রাজার মনে হয় বলে, আপনার স্কুলের জন্য কিছু করতে হয় বলুন।

রাজি আছি। কিন্তু দয়া করে বিধবাদের জন্য কিছু করতে বলবেন না। কিন্তু ওই ওদের জন্য যখন টাকার দরকার হয়, বড়িদিদি এসে সামনে দাঁড়ায়। তখন রাজার পক্ষে না বলা সম্ভব হয় না।

"রাজা, এখানে বিধবারা আর কোথায় থাকেন, আপনি জানেন?" প্রশ্নটা করেছে মিঠু।

"ওদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

এড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাজা বলল, "সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।"

"বিমলা বাসু বলে কাউকে আপনি চেনেন?"

রাজা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "চিনি। ওকে এখানে সবাই চেনে। আমরা বড়িদিদি বলি।"

"ওঁর কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারবেন?"

"আগে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে হবে। খুব ব্যস্ত মানুষ।"

কথায় আগের মতো ছেলেমানুষি নেই। মিঠু খুব সিরিয়াস, "কাল সকালে করা যেতে পারে?"

"কথা বলে দেখি তা হলে।"

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই পাথেরপুরায় পৌঁছে গেল রাজা। চরণদাস বাবাজি বলে দিয়েছিলেন, বাড়ির নাম রাধাকুঞ্জ। নামটা দেখেই ও চমকে উঠল। আরে, এই বাড়িতে তো ছোটবেলায় ও একবার এসেছিল। পঞ্চম দোলের দিন সে বার কী হয়েছিল, সব ওর মনে পড়ে গেল।

রাধাকুঞ্জের সিঁড়িতে দু'তিন জন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল রাজা। কানাই পাণ্ডা। খুব সজ্জন লোক। অন্য পাণ্ডাদের মতো টাকা চুষে নেয় না। উল্টে, এখানে এসে যজমানরা কেউ বিপদে পড়লে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। রাজার দোকানে মূর্তি কিনতে এসে একবার ওর এক যজমান ঠেকে গেছিল। পাঁচ হাজার টাকা দাম ছিল মূর্তিটার। কানাই পাণ্ডাকে রাজা তখন নিজের পকেট থেকে টাকা দিতে দেখেছে। তখন ও কী বলেছিল তাও মনে আছে। "আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিলেও কোনও অসুবিধা নেই।"

গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াতেই কানাই পাণ্ডা হাতজোড় করে এসে বলল, "মা এত দেরি হল? আমরা তো চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। কলকাতা থেকে সুতপা বউদিমণি এই নিয়ে দু'বার ফোন করলেন।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "ট্রেন লেট ছিল। আপনি চরণদাস বাবাজিকে

ফোন করে জানিয়ে দিন। আমরা পৌঁছে গেছি।"

অন্য লোক দুটো সুটকেশ নামিয়ে নিয়ে গেছে ডিকি থেকে। লাবণ্যপ্রভার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিঠু। মেয়েটা বেশ লম্বা তো? না কি সালোয়ার কামিজ পরে আছে বলে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। ডিকি বন্ধ করার সময় মিঠুর দিকে একবার চুরি করে তাকাল রাজা।

দেখে আশ মিটছে না। এই মেয়েটা...এই মেয়েটার জন্য জীবনের সব কিছু ত্যাগ করা যায়। মেয়েটাকে ও আজই প্রথম দেখল, তা কিন্তু নয়। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখল। রাধাকুঞ্জে পা দিয়েই সব মনে পড়ে গেছে রাজার।

কানাই পাণ্ডার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লাবণ্যপ্রভা ভেতরে চলে গেলেন। মিঠু সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, "আপনার কোনও কনটাক্ট নাম্বার আছে? কাল দরকার হতে পারে সকালের দিকে।"

পকেট থেকে একটা নেম কার্ড বের করে রাজা বলল, "তা হলে এটা রেখে দিন।"

কার্ডটা মিঠু নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মনে মনে বলল, শুধু কাল নয়, সারা জীবন তোমার দরকার হবে আমাকে।

রোজকার অভ্যেস। ননীবালার ঘুম ভেঙে গেল ভোর ঠিক সাড়ে চারটেয়। বাঁদিকে নীচে সিঁড়ির আলোটা বোধহয় কেউ জ্বালিয়ে রেখেছে। তেরচা ভাবে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। আবছা আবছা সব দেখা যাচ্ছে। পাশের চৌকির দিকে তাকিয়ে ননীবালা দেখল, চাঁপা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মেয়েটার পরনে অন্তর্বাস বলে কিছু নেই। কোনও রকমে শাড়িটা জড়ানো। কাল রাতে গুমড়ে কাঁদছিল মেয়েটা। ওর দিকে তাকিয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আশ্রমে আসা ইস্তক চাঁপাকে ও কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি। বোধহয় খুব দুঃখী।

শৃঙ্গার বটে, প্রাকৃতিক কর্ম করার জন্য ওকে ছুটতে হত যমুনার ধারে। অন্য লোকজন ওঠার আগে কাজটা সারতে হত। মন্দিরের পাশেই একটা টিউবওয়েল ছিল। সেখানে স্নান সেরে নিত। তারপর ঘরে বসে মালা জপার ফাঁকেই আলো ফুটে যেত। দিনের লড়াই শুরু হত ননীবালার। আজ আর তাড়াহুড়ো করে যমুনার ধারে যেতে হবে না। কাল রাতে আচুকি সব দেখিয়ে দিয়েছে। ছাদের একপাশে তিনটে খুপরি ঘর। সেখানে স্নান-পায়খানার ব্যবস্থা।

চৌকি ছেড়ে নামতেই ননীবালার হঠাৎ মনে হল, এই রে, পরনের থান ছাড়া তো ওর কাছে আর কিছু নেই। বাসি থান এখন কেচে শুকোতে দিলে সেই সময়টায় ও পরবে কী? এমন সমস্যায় যে ওকে আগেও পড়তে হয়নি, তা নয়। থান শুকোতে দিয়ে ঘরে তখন ও গামছা জড়িয়ে থেকেছে। এখানে তো গামছাও নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে ননীবালা এমন কিছু খুঁজতে লাগল, যা দিয়ে শরীর ঢাকা যায়। মা রে মা, গোবিন্দ এ কী বিপদে ফেললেন ওকে?

এখন থান ভেজালে, সেটা শুকোতে অবশ্য বেশি সময় লাগবে না। আধ্রুটা ততক্ষণের জন্যই দরকার। বাইরে ছাদে এসে দাঁড়াল ননীবালা। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। এই চাঁদ ওর চেনা। চাঁদের সামনে ওর কোনও লজ্জা নেই। ননীবালা মনে মনে বলল, ওর লজ্জা নিবারণের দায় গোবিন্দর। তিনি যদি চান, ভিজে থান শুকোনোর সময় ও উলঙ্গ হয়ে থাকুক, তা হলে তাই থাকবে। এটা ঠিক করে, খুপরি ঘরে ঢোকার আগে ননীবালা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

নিঃশব্দে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আচুকি। ওর হাতে সাদা একটা থান। বারান্দার তারে সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে ও বলল, "চান করে এসে ইটা পরে লিবি।"

গতকাল থেকে আচুকির কাণ্ড কারখানা দেখে ননীবালা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ও ঠিক পার্থিব জগতের লোক না। ওর মধ্যে অন্য ধরনের ক্ষমতা সাধনা করে। সত্যিই ও রহস্যময়ী। এই আছে এই নেই। এই যে এখন থান নিয়ে হাজির হল, ও জানল কী করে ননীবালা সমস্যায় পড়েছিল?

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ননীবালা বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি। দিনের আলো ফুটে গেছে। নীচে নেমে এসে ও দেখল জয়া ফুলের থালা নিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। নীচে অনেকেরই স্নান-টান সারা হয়ে গেছে। কেউ জপে ব্যস্ত। কেউ মন্দিরের সামনে ঘেরা জায়গাটায় বসে নাম করছে ঠাকুরের। গোবিন্দকে প্রণাম করে ননীবালা বেরিয়ে এল। গেটের বাইরে পা রাখতেই দেখল, বেশ কিছু দেহাতি মানুষ চুপচাপ বসে আছে। তাদের মধ্যে ও সেই মিষ্টির দোকানের মালিক আর তার বউকে দেখতে পেল।

ননীবালাকে দেখে মিষ্টির দোকানের মালিক এগিয়ে এসে বলল, "জটাধারী মাইয়ি কখুন লিচে আসবে? হামার লেড়কাকে লিয়ে এসেচি।"

বউয়ের পাশে গাছতলায় বসে আছে দশ এগারো বছরের একটা ছেলে। ওর দিকে তাকিয়ে ননীবালা বলল, "লেড়কা ভাল হইয়া গেসে?"

"হা মাইয়ি।" বউটা উঠে এসে বলল, "আখুন ঠিক আচে। জটাধারী মাইয়ি হামার লেড়কাকে ঝাড়ফোক করে দিক।"

"হেই লোকগুলান কারা? কাগো নিয়া আইস?"

"সব পড়োশান। জটাধারী মাইয়াকে দেখতে এসেচে।" গতকাল কান্নাকাটি করে চোখ মুখ বসে গেছিল। আজ বউটা খুশিতে ডগমগ। "কখুন লামবেন মাইয়া?"

ননীবালা বলল, "অহন মন্দিরে বইস্যা ধ্যান করত্যাসে।" বলেই ও পা বাড়াল। আচুকি কী রকম বদমেজাজি আর কেউ না জানুক, ও জানে। এদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে হয়তো রেগেও যেতে পারে।

ননীবালার প্রথম গন্তব্য হনুমান বাগে। ওখানে বিনা পয়সায় চা আর বিস্কুট পাওয়া যায়। খৈতান ধর্মশালার লোকগুলো ভাল। লোক গোণা গুণতির মধ্যে যায় না। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওখানে পৌঁছলেই চা মেলে। গুরুকুল থেকে হনুমান বাগ পৌঁছতে আজ কত সময় নেবে ও জানে না। সময়ের আন্দাজটা হবে, দু'চারদিন যাতায়াতের পর। তাই ননীবালা পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল।

ভোর বেলাতেই মন্দিরে মন্দিরে নাম কীর্তন শুরু হয়ে গেছে। ননীবালার খুব ভাল লাগে এই সময়টায়। কোথাও সেবাইতরা বসে নাম গান করে। কোথাও ক্যাসেট বাজানো হয়। দূর থেকে ভেসে আসে ভজনের সুর। সারা বৃন্দাবন মুখরিত হয়ে ওঠে শ্রীগোবিন্দর জয় ধ্বনিতে। গুরুকুলের মেঠো রাস্তা ছেড়ে কাঠিয়া বাবার আশ্রমের কাছে এসে ননীবালা দেখল, দোকান পাট খুলতে আরম্ভ করেছে। বৃন্দাবন-মথুরা রোড পেরিয়ে ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের দিকে এগোল।

বিশ্বম্ভর ধর্মশালায় কাল রাতে বোধহয় কারও বিয়ে ছিল। বাসি খাবার সকাল বেলায় বিলি করা হবে। ভিখারিদের লাইন পড়ে গেছে। শৃঙ্গার বটের কমলা আর বাসন্তীকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ননীবালা একটু অবাকই হল। এই সময় প্রায় দিনই ওদের সঙ্গে দেখা হয় অখণ্ডানন্দ মন্দিরের কাছে। ওখানে ডাল-ভাত পাওয়া যায়। দিনের বেলায় পেট ভরানোর ব্যবস্থা ওখানেই হয়ে যায়। কমলারা আজ ওখানে যাবে না? ওকে দেখতে পেয়ে কমলা বলল, "অ ননীবালা, তরে না হি কাইল ঘর থেইক্যা বাইর কইর‍্যা দিসে? উঠছস কুথায়?"

সাত সকালে মিথ্যে কথা বলা উচিত না। তবুও গুরুকুল আশ্রমের কথা ননীবালা জানাল না। বলল, "বিমলা মাইয়ির বাড়িতে।"

"তর ঘরে তো লোক ঢুকাইয়া দিসে। একটা মাগিরে আইন্যা তুলসে উদ্ধব পাণ্ডা। নতুন বৃন্দাবনে আইসে। মাগির কী গতর? পাণ্ডারা আইয়া অহন ফূর্তি করব।"

এ সব পুরনো গল্প। তবু ননীবালা প্রশ্ন করল, "বিয়ায়িত, না বিয়া হয় নাই?"

"বুঝি না। কাইল বিহানে আইসে। সিন্দুর দেহি নাই মনে হইতাসে। আমাগো দিলীপ কইল, বসিরহাট থন লইয়া আইসে।"

ননীবালার কৌতূহল তবু যায় না, "বাঙালি?"

"না তো কী। নাম শ্যাফালি।"

"আমার কয়েকডা জিনিস ছিল ঘরে। গেলে পামু?"

"পাইব্যা। মন্টুর বউ সব তুইল্যা রাখছে। তর গোবিন্দর ফটো ভাইঙা চুইর‍্যা একশা। দুইডা কম্বল, একডা থান, স্টিলের থালা তুইল্যা রাখসে। দুপারের দিকে যাইস। জিনিস পাইয়া যাইবি। অহন মন্টুর বউ কামে গেসে হিন্দুস্তানিগো বাড়িতে। অরে অহন পাইবি না।"

"তরা অখণ্ডানন্দ মন্দিরে যাবি না?"

"না। রুজ রুজ এক খাবার খাইতে ভাল লাগে না। এহানে আইজ নিমকি, ভুজিয়া, লাড্ডু দিব। এট্টু মুখ বদলাই।"

আর কথা না বাড়িয়ে ননীবালা হাঁটা শুরু করল হনুমান বাগের দিকে। চা খেয়েই ও যাবে ভজনাশ্রমে। ছ'টার মধ্যে ওকে ও খানে পৌঁছতেই হবে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় কীর্তন শুরু। ছ'টার মধ্যে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে না পারলে ও চিটি অর্থাৎ লোহার চাকতি পারে না। চাকতি না পেলে ভেতরে গিয়েও লাভ নেই ননীবালার। বিধবাদের কাছে এই চাকতি খুব মূল্যবান। তিন সাত্তে

তিন ঘণ্টা নাম সংকীর্তনের পর এই চাকতি দেখিয়েই পাওয়া যাবে দুটো টাকা, আড়াইশো গ্রাম চাল আর পঞ্চাশ গ্রাম ডাল। টাকা দরকার ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য। চাল আর ডাল জমিয়ে রেখে, পরে মুদির দোকানে বিক্রি করেও কিছু টাকা আসে।

হনুমান বাগের ধর্মশালায় পৌঁছে ননীবালা দেখল, আজ তেমন ভিড় নেই। লাইনে মাত্র দশ বারো জন। ধর্মশালার দরজা খোলা। তার মানে একটু পরেই চা বিস্কুট দেওয়া শুরু হবে। ইদানীং সাধুরা এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে লাইনে। মাথায় জটাজুটো, গায়ে গেরুয়া। এদের দেখলে খুব বিরক্ত হয় ননীবালা। মনে হয়, ওদের প্রাপ্য জিনিসে ভাগ বসাতে এসেছে।

"হা গা ননীবালা। ওদিককার খপর কিছু শুনেচ?"

পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ননীবালা দেখল, প্রভারানি ও জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। এই মহিলাটিকে ও একেবারেই পছন্দ করে না। এর কাজই হচ্ছে একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া।

"গরমেন্ট থেকে না কি আমাদিগে ট্যাকা দেবে।"

"তুমি কাইর কাইছ থেইক্যা শুনলা?"

"কাল গোবিন্দর মন্দিরে সবাই বলা কওয়ি করছিল গা।"

"আমি কিছু শুনি নাই।"

"বাব্বা, তোমার সঙ্গে বিমলা মাইয়ির এতো পিরীত। আর তুমি জানো না? আমায় বিশ্বেস করতে হবে?"

প্রভারানির স্বভাবটাই এই ধরনের। ঠেস মেরে কথা বলা। কারও কথা বিশ্বাস না করা।

পাত্তা না দিয়ে ননীবালা বলল, "কাইল বিমলা মাইয়ির বাড়িতে গেসিলাম। কই, কিসু কইল না তো?"

"সাত সকালে মিচে কতা কইও না তো? ট্যাকা বিমলা মাইয়ি তোমাদেরই জোগাড় করে দেবে। তোমরা কাচের নোক কী না। আমাদের কপালে নবড়ঙ্কা। তোমাদের ফটো তুলিয়েছে? বেধবাদের তো ফটো নেবে বলেচে।"

এ বার অবাক হওয়ার পালা ননীবালার। প্রভারানি এত খবর জানে, অথচ ও কিছুই জানে না? ফটো তোলার ব্যবস্থা যখন হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই গরমেন্ট থেকে টাকা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ননীবালা মনে মনে ঠিক করল, আজ ভজনাশ্রম থেকে ফেরার সময় অবশ্যই ও বিমলা মাইয়ির কাছে যাবে।

সামনের দিকে লাইনটা নড়তে শুরু করেছে। ঘাড় উঁচিয়ে ননীবালা দেখল, চা বিতরণ আরম্ভ হয়ে গেছে। এরা মাটির ভাঁড়ে চা দেয়। পাশেই ড্রাম রাখা আছে। সেখানেই ভাঁড় ফেলার ব্যবস্থা। পরে ভাঙ্গিরা এসে পরিষ্কার করে। ধর্মশালার ম্যানেজার যেমন ভাল, তেমন কড়া। কোথায় একটু নোংরা দেখলেই মারাত্মক চটে যায়।

চায়ের ভাঁড় আর বিস্কুট দু'হাতে নিয়ে ননীবালা ধর্মশালার রোয়াকে এসে বসল। রাস্তায় এখন লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। স্নান সেরে যমুনার দিক থেকে কেউ ফিরছে। কেউ দৌড়চ্ছে মন্দিরের দিকে। এখানকার লোক সকালে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দর্শন না করে জলস্পর্শ করে না। হিন্দুস্তানি বা মারোয়াড়িদের বউয়েরা এই সময় গো সেবা করে। কাছেই মিষ্টির দোকান। বড় বড় জিলিপি ভাজা হচ্ছে। চাঙারি ভর্তি ওই জিলিপি কিনবে হিন্দুস্তানি বউয়েরা। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়কে জিলিপি খাওয়াবে। এখানে ষাঁড়গুলোও এমন যত্ন পায় যে, ননীবালাদের মাঝে মধ্যে হিংসে হয়।

রোয়াকে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ননীবালা শুনল, "জয় রাধে।"

মুখোমুখি হলেই এখানকার লোকেরা 'রাধে রাধে বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ ফিরে ননীবালা দেখল, কার্তিক বোস্টম। হাসি হাসি মুখ। কপালে গোপি তিলক। বেশ লাগছে বোস্টমকে দেখতে। ননীবালা প্রত্যুত্তর দিল, "রাধে রাধে! আসেন কেমন?"

"আমাদের আর থাকা। ঢেউয়ের উপর আছি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেরাচ্ছি। সংসার হল গিয়ে সমুদ্দুরের মতোন। তল খুঁজে পাই না। তাই ঢেউয়ের উপর থাকি।"

কার্তিক বোস্টম খুব রসিক মানুষ। বছরের অর্ধেক সময় ও নবদ্বীপে পড়ে থাকে। বাকি সময়টা এখানে। গৌর নিতাইয়ের ভজনা করেই দিন কাটিয়ে দেয়। শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক বলে মানুষটাকে ননীবালার ভাল লাগে। অন্য দিন বোস্টমী সঙ্গে থাকে। আজ নেই তাই ননীবালা জিজ্ঞেস করল, "মাতা-মারে আনেন নাই?"

"না। জ্বর হয়েছে গো। আজ আর ওঠার ক্ষেমতা নেই।" বলেই বোস্টম গেয়ে উঠল রাগের বালিশ মাথায় দিয়ে, "রাই ধ্বনি আছে ঘুমায়ে, কী জন্য এলে এখানে, তোমায় দেখে অঙ্গ জ্বলে..."

ননীবালা হেসে ফেলল গান শুনে। বোস্টমের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রোয়াক থেকে ও নেমে এল। বেশ রোদ উঠে গেছে। অন্য দিন ও চা খেয়েই চলে যায় অখণ্ডানন্দ মন্দিরে। আজ আর যাওয়া হবে না। অখণ্ডানন্দ মন্দিরে প্রথমে সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা। তারপর ননীবালারা প্রসাদ পাবে। সময়ের কোনও ঠিক নেই। সাড়ে ছ'টাও বেজে যেতে পারে। সময়ের হিসেব করে ননীবালা সোজা ভজনাশ্রমে যাওয়াই মনস্থ করল। তাড়াতাড়ি ও পা চালাল পাথেরপুরার দিকে।

রাস্তায় ওর সামনে কোনও বিধবাকে দেখলেই ননীবালা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। তাকে টপকে আগে যাওয়ার চেষ্টা করে। যেন সব বিধবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। যে কোনও একজনের জন্য ওর ভজনাশ্রমে ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একদিন চিটি না পাওয়া মানে দু'টাকা ক্ষতি। আজ অবশ্য ওর ঘর ভাড়া দেওয়ার চিন্তা নেই। তবু টাকাটা দরকার। নিজস্ব সাধ আহ্লাদ বলেও তো একটা জিনিস আছে? একেক সময় একেকটা জিনিস খেতে খুব মন চায়। এই যেমন, কয়েকদিন ধরে লিচু খেতে ওর খুব ইচ্ছে করছে। লউ বাজারে খুব লিচু উঠেছে। আজ দুটো টাকা পেলে বাজার থেকে ননীবালা লিচু কিনে নিয়ে যাবে।

ভজনাশ্রমে পৌঁছে ননীবালা দেখল, জমাদারনির মেজাজ খুব খারাপ। লাইন ম্যানেজ করার দায়িত্বে থাকে জমাদারনি। ওর নাম কেউ জানে না। লম্বা চওড়া শরীর। সারাক্ষণ চুল এলিয়ে থাকে বলে ওকে ভয়ঙ্কর দেখায়। হাতে ছড়ি। লাইনে কোনও গণ্ডগোল হলেই সেই ছড়ি ও সপাৎ সপাৎ চালায়। ননীবালা গেটের কাছে পৌঁছনোর আগে জমাদারনি বলল, "এ্যাই ননীবালা, আজ এতো দেরি করলি? ভাগ, তোকে চিটি নিতে দেব না।"

ধমক শুনলে অন্যদিন ও ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত। আজ কী হল, হঠাৎ ওর আচুকির কথা মনে এল। বলে উঠল, "দিবি না ক্যান? ছয়ডা তো এহনও বাজে নাই।"

ভুঁ কোচকাল জমাদারনির। ও আশাই করেনি ননীবালা পাল্টা প্রশ্ন করবে। মুখ খিঁচিয়ে ও বলল, "তোর সাহস তো কম না। মুখে মুখে তক্ক করছিস। এই বয়েসে নাঙ ধরেছিস না কি রে?"

দপ করে জ্বলে উঠল ননীবালা, "মুখ সামলাইয়া কথা ক'বি। এমন ভাব করতাছস, য্যান ভজনাশ্রম তর বাপের।"

গেটের মুখে দাঁড়িয়ে চিটিওয়ালি। ওর হাতে ঝোলো। তার ভেতর থেকে একটা একটা করে চিটি তুলে দিচ্ছে লাইনে দাঁড়ানো বিধবাদের। ননীবালা আর জমাদারনির চাপান-উতোর শুনে চিটিওয়ালি হাসছে। খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরেই ও বলল, "ননীবালা, ঠাকুরের নাম করতে আইছস, না কাইজ্যা করতে?"

ননীবালার মাথায় আজ আচুকির ভূত চেপেছে। ও নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, "ছরুডা কে করল, দ্যাখলেন তো?"

জমাদারনি ক্ষেপে লাল। লাইনে দাঁড়ানো অনেকেই ননীবালার ঔদ্ধত্য দেখেছে। ননীবালাকে এখনই শায়েস্তা করতে না পারলে, এ কথা মুখে মুখে রটবে। কেউ আর তখন ওকে মানবে না। ও ননীবালার হাত ধরে টানল। লাইন থেকে বের করার জন্য। "আয় ছেনালি মাগি, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন। তোকে আর কোনওদিন আশ্রমেই ঢুকতে দেব না।"

গায়ের জোরে জমাদারনির সঙ্গে পারা সম্ভব না। তবুও হার মানবে না ভেবে, বাঁ হাতে গেটের রেলিংটা ধরে ফেলল ননীবালা। টানা হ্যাচড়ার মাঝে ও দেখতে পেল পুরুষোত্তম দাসজিকে। ভজনাশ্রমের ম্যানেজার। এদিকেই আসছেন। ম্যানেজারকে দেখেই ও চিৎকার করে বলল, "জুলুম করত্যাছ? ম্যানেজারবাবুরে কইয়া দিমু আমারে তুমি হেই দিন চাইরডা চিড়ি দিসিলা।"

ম্যানেজারবাবু গেট দিয়ে ঢুকছেন সেই সময়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন জোঁকের গায়ে নুন পড়েছে। হাতটা ছেড়ে দিয়েছে জমাদারনি। লাইনে কারও মুখে কোনও কথা নেই। ম্যানেজারবাবু একবার ননীবালা, তারপর জমাদারনির মুখের দিকে তাকিয়েই থমথমে মুখে ভেতরে ঢুকে গেলেন। লাইন ছেড়ে দিয়ে জমাদারনি চাপা গলায় বলল, "এখন বেঁচে গেলি। পরে তোর ব্যবস্থা করব।"

ননীবালা মনে মনে হাসল। আজ বাড়াবাড়ি করলে সত্যিই ও গোপন কথাটা জানিয়ে দিত ম্যানেজারবাবুকে। বেশ কয়েকদিন ধরে ওর হাতে বাড়তি টিকিট গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জমাদারনি। ভজনাশ্রম থেকে ও বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই বাড়তি টিকিট ফেরত চেয়ে নেবে। তারপর টিকিট পিছু নিজে দু'টাকা করে নিয়ে বাড়ি যাবে। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে এই ব্যবস্থা। কিন্তু ননীবালা অন্যায় কাজ করবে না। ভজনাশ্রমকে ঠকাতে পারবে না।

চিটিওয়ালির কাছে চাকতি নিয়ে ও হলঘরে গিয়ে ঢুকল। ঠিক মধ্যিখানে উঁচু বেদিতে রাধাকৃষ্ণের ছবি ফুল দিয়ে সাজানো। সেই বেদির চারপাশে

বসে আছে শ'আড়াই বিধবা। এখানে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলে। তিন ঘণ্টা অন্তর মানুষগুলো বদলে যায়। তবে সন্ধ্যার পর বিধবাদের থাকার নিয়ম নেই। তখন এসে কীর্তন করে পুরুষরা। তারা সারা রাত্তির টেনে দেয়।

বাঁদিকে একটা থামের পাশে রোজ বসে ননীবালা। আজ একটু দেরি হওয়ায় জায়গাটা খালি নেই। থামের পাশে বসার একটু সুবিধা আছে। বসে বসে যখন পিঠ ধরে যায় তখন থামে ঠেসান দিলে একটু আরাম মেলে। ননীবালা এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু পিছনের দিকে গিয়ে বসল। বেদির দিকে তাকাতেই ও দেখল, আজ সুরওয়ালি আর খোলওয়ালি ওর খুব পছন্দের মানুষ। প্রথমে শুরু করবে খোলওয়ালি। একটা আবহ তৈরি করবে। তারপর সুর ধরবে সুরওয়ালি। তখন ওরাও গান শুরু করবে।

চিটিওয়ালি, টিকিটওয়ালি, সুরওয়ালি, খোলওয়ালিরা সবাই ভজনাশ্রমের ভেতর থাকে। দোতলায় অনেক ঘর আছে, সেখানে। একেক জনের একেক দায়িত্ব। কীর্তন শেষ হয়ে যাওয়ার পর চিটিগুলো ফেরত নিয়ে নেবে টিকিটওয়ালি। তার বদলে দেবে নতুন একটা চাকতি। এই চাকতির বিনিময়ে, বৃন্দাবনের যে কোনও দোকান থেকে দু টাকা মূল্যের যে কোনও জিনিস কেনা যায়।

কীর্তন শুরু করেছে সুরওয়ালি। ননীবালা অন্য ভাবনাগুলো সরিয়ে গোবিন্দর চিন্তায় মন দিল। ম্যানেজারবাবু অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছেন। ওঁকে দেখে কীর্তনে আগ্রহ বেড়ে গেছে সবার। ঠোঁট নড়ছে। আগে ম্যানেজারবাবু দোতলার একটা ঘরে থাকতেন। কিন্তু গোলাপিকে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে উনি আর এখানে থাকেন না। চলে গেছেন হনুমান টিলার দিকে কোনও একটা বাড়িতে।

কীর্তনে মন দেবে কী, ম্যানেজারবাবুকে দেখে ননীবালার এখন মনে পড়ছে গোলাপির কথা। তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবতী বিধবা। রানাঘাটের মেয়ে। বৃন্দাবনে এসেছিল ওর কোনও এক আত্মীয়ার সঙ্গে। যেমন গায়ের রঙ, তেমন ভরাট স্বাস্থ্য। তখন ভজনাশ্রমগুলিতে সব বয়সী বিধবার প্রবেশাধিকার ছিল। গোলাপি রূপের জন্য তো বটেই, আরও চোখে পড়েছিল ওর সুন্দর গলার জন্য। রাধার বিরহের গান চমৎকার গাইত মেয়েটা। শুনতে শুনতে তখন ওকেই রাধারানি রাধারানি বলে মনে হত। সত্যি বলতে কী, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত তখন।

এখানে অনেকগুলো ভজনাশ্রম। গোলাপিকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছিল। এখানকার ম্যানেজারবাবু ওকে এনে তুললেন ওপরের একটা ঘরে। ম্যানেজারবাবুর বউ থাকে জয়পুরে। শরীরের চাহিদা যাবে কোথায়? হাতের কাছে অমন একটা যুবতী মেয়ে। যা হয়। বেচারী গোলাপিও নিজেকে সামলাতে পারল না। পেটে বাচ্চা এসে গেল। তারপর বোকার মতো আত্মহত্যা করে বসল। বৃন্দাবনে আত্মহত্যা মহাপাপ। যে করে তাকে ফের চুরাশি লক্ষ যোনি পেরিয়ে মানব জনম নিতে হয়। রাতারাতি মুর্দাঘাটে নিয়ে গিয়ে গোলাপির একটা ব্যবস্থা করা হল।

ম্যানেজারবাবু টাকা পয়সা দিয়ে বিদেয় করলেন ওর আত্মীয়টিকে। তবুও খানিকটা হই চই হয়েছিল গোলাপির মৃত্যুকে ঘিরে। ভজনাশ্রম থেকে বলা হল, গোলাপি মারা গেছে টাইফয়েডে। এই চিটিওয়ালি, জমাদারনিরাই জোর গলায় তা বলল। ম্যানেজারবাবুর কিছুই হল না। মাঝখান থেকে পাপের ভাগী হল মেয়েটা। ওই ঘটনার পর থেকে যুবতী বিধবাদের ভজনাশ্রমে ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। ম্যানেজারবাবুকেও চলে যেতে হল হনুমান টিলায়।

মন বসাতে পারছে না ননীবালা কীর্তনে। মনটা এত চঞ্চল হয়ে উঠল কেন? বেদির কাছাকাছি বসা যারা, তারা সবাই গাইছে। পিছনের মানুষগুলো ফাঁকি মারায় ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কেউ মুড়ি বের করে খাচ্ছে, কেউ শশা। সকালে নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে এনেছে। বাইরে বসে খাওয়ার সময় বা সুযোগ পায়নি। জমাদারনির চোখে পড়ে গেল এরা লাঠির খোঁচা খাবে। হল ঘরে অবশ্য এখন জমাদারনি নেই। বোধহয় ওপরে গেছে। তবে ওকে বিশ্বাস নেই, ও ওপর থেকেও লক্ষ্য রাখে, কে ফাঁকি মারছে, কে মারছে না।

"অ ননীবালা, খপরটা শুনছ?"

সামনে তাকিয়ে ননীবালা দেখল সান্ত্বনা। এদিক ওদিক তাকিয়ে ও নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "কী খবর?"

"কাল রেতে ছোটো বাবার আশ্রমে গেসলুম। ওখানেই শুনলুম, কলকেতা থেকে কে এক জমিদারের বউ এয়েচে বেন্দাবনে। আমাদিগের জন্যি একটা আশ্রম খুলচে।"

"কোথায় করব, ছনলা না হি?"

"ওই যে গো, গোবিন্দর মন্দিরের কাচে। কী একটা কুঞ্জ আচে, সেখেনে।"

বৃন্দাবনে সব বাড়িই কুঞ্জ। গোবিন্দজির মন্দিরের সামনে অনেক কুঞ্জই আছে। ননীবালা বুঝতে পারল না, সান্ত্বনা ঠিক কোন বাড়িটার কথা বলছে। মাঝে মাঝে এ রকম অনেক খবর রটে। বিধবারা আশায় আশায় থাকে। তারপর সব থিতিয়ে যায়। ননীবালার বিশ্বাস নেই এ সব উড়ো খবরে। ও বলল, "ঠিক ছনছ তো?"

"তা জানিনে। ওরা বলল, শুনে এলুম।"

"তুমি যাইব্যা না হি আশ্রম হইলে?"

"রাধে রাধে। মাতা খারাপ হয়েচে না কি তোমার? যমনা ঘাটে সেদিন দেকা হল পুষ্পর সনে। কী দুখখুটাই নাই করল।"

পুষ্প থাকে নব নীড়ের আশ্রমে। ওদের তো ভাল থাকার কথা। ননীবালা জিজ্ঞেস করল, "ক্যান দুঃখ কইরল ক্যান?"

"তুই যা ভাবচিস, তা না। পুষ্প বলল, দমবন্ধ হয়ে আসচে। বাইরে বেরুতে দেয় না। সারাদিন লোহার গেট বন্ধ করে রাকে। আধপেটা খেতে দেয়। এই সব। ভাগ্যিস তকন সুষমা গোতমের কতা শুনে ওকানে যাইনি।"

ননীবালা বলল, "কী জানো দিদি, দুষডা আমাগো। আমরা কোন কিছানতে খুশি না।"

সান্ত্বনা বলল, "আগের জন্মে পাপ করেচি। তার ফল ভোগ করতে হচ্চে এ জন্মে। এই দ্যাখ না, আমার অতো বড় বাড়ি ডোমজুড়ে। আর একন আমার মাতার উপর ছাদ নেই গা? ছেলের বউ নাথি মেরে তাইড়ে দিল। ছেলে চুপটি করে রইল। কী কুক্ষণেই না এই ছেলেকে গভভে ধরেছিলুম।"

এ গল্প সান্ত্বনার মুখ থেকে অনেকবার শোনা ননীবালার। ছেলের বউ কেমন করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ির দলিলে টিপ সই করিয়ে নিয়েছে। এখানে যারা ভজন করতে এসেছে, তাদের অনেকেরই এই গল্প। পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তি আজ ওদের অনেককে এখানে এনে ফেলেছে। কী হবে সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে? ননীবালা পুরনো কথা ভোলার জন্যই কীর্তনে ডুবে গেল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর কীর্তন যখন শেষ হওয়ার মুখে, তখন ননীবালার চোখে পড়ল, ওপর থেকে সাদা থানের পেটি নামানো হচ্ছে। দেখে ওর বুকটা ছলাৎ করে উঠল। আজ তা হলে ওদের সবাইকে একটা করে থান দেওয়া হবে। বোধহয় কোনও ধনী মারোয়াড়ি দান করে গেছেন। মাঝেমধ্যেই ভজনাশ্রমের মাধ্যমে এই সব জিনিস বিলি করা হয়। থান, কম্বল, শাল, এমনকী কোনও কোনও সময় জুতোও। আজ যারা হাজির, যাদের হাতে চাকতি আছে, তারা সবাই পাবে। ননীবালার বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। ভোরবেলায় গোবিন্দ তা হলে ওর প্রার্থনাটা শুনেছেন!

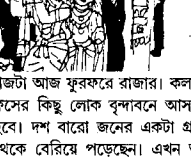

সকাল থেকেই মেজাজটা আজ ফুরফরে রাজার। কলকাতা থেকে খবর এসেছে, জিজাজির অফিসের কিছু লোক বৃন্দাবনে আসছেন। ওদের ট্যুর প্রোগ্রামটা করে দিতে হবে। দশ বারো জনের একটা গ্রুপ। দিন সাতেক আগে তাঁরা কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। এখন আছেন হরিদ্বারে। বৃন্দাবনে তাঁরা থাকবেন দিন তিনেক। দোকানে বসে তাই ওঁদের প্রোগ্রামটা করছে রাজা পাশের দোকান থেকে ধর্মেন্দ্রকেও ডেকে এনেছে। মথুরা-বৃন্দাবনে কোথায় কী দেখার আছে, ও ভাল জানে। রাধা কৃষ্ণের ব্যাপারে একেবারে এক্সপার্ট। রাজা প্রথমেই বলে দিয়েছে, "প্রোগ্রামটা এমন ভাবে করবি যাতে তিনটে দিন আমার সব গাড়ি ভাড়া খাটানো যায়।"

ওরা পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সুমোর ড্রাইভার নন্দলালকেও। ওর মতামতও নেওয়া হচ্ছে। ধর্মেন্দ্র বলল, "এক কাজ করা যাক রাজা। একেবারে গোকুল থেকে ট্যুরটা শুরু করা যাক। এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হবে। যমুনা পেরিয়ে বসুদেব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে ওখানেই নিয়ে গেছিলেন জন্মের পর। যেখানে গিয়ে উঠেছিলেন, সেখানে অনেক কিছু দেখার আছে।"

নন্দলাল বলল, "তা হলে কিন্তু পুরনো ব্রিজ দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওখানে রাস্তায় মেরামতির কাজ হচ্ছে। খুব ধুলো। আমার গাড়ির বারোটা বেজে যাবে।"

রাজা বলল, "তা হলে নতুন ব্রিজ দিয়ে যাবি। দশ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা ঘুরতে হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে? যমুনা ড্যামটা দেখিয়ে দিবি

প্যাসেঞ্জারকে।"

যমুনার ওপরে একটা বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। শুখা মরশুমে জল ধরে রাখার জন্য। নতুন ব্রিজের রাস্তাটাও চমৎকার। শুনে ধর্মেন্দ্র সায় দিল, "হ্যা রে সেটাই মনে হয় ভাল হবে।"

রাজা দশ বারো বছর আগে গেছিল গোকুলে। ওর তেমন কিছু মনে নেই। ধর্মেন্দ্রকে ও জিজ্ঞেস করল, "গোকুলে একজ্যাক্টলি কী কী দেখার আছে রে? মানে এক বেলা কাটিয়ে দেওয়া যাবে?"

"স্বচ্ছন্দে। ওটাই তো কৃষ্ণ বিজনেসের আসল ডায়গা। পর পর অনেক কিছু আছে। কয়লাঘাট, রমনরেতি, নন্দ রাজার বাড়ি, পুতনা বধের জায়গা, বলরামের জন্মস্থান, আশি খাম্বা, শ্যামলার মন্দির... অনেক কিছু।"

"তোর তো দেখছি একেবারে মুখস্থ।"

"তুইও জানিস। আসলে এখন মাল কামানোর ধান্ধায় তুই এমন ব্যস্ত, যে সব ভুলে মেরে বসে আছিস। কয়লো ঘাটটা খুব সুন্দর করেছে এখন। এই কিছুদিন আগে আমার এক রিলেটিভকে নিয়ে গেছিলাম। বেশ ভাল লাগল।"

রাজা বলল, "দাঁড়া দাঁড়া। এই বার মনে পড়েছে। জন্মাষ্টমীর দিন বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে মাথায় নিয়ে যমুনা নদী পেরচ্ছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের পা ছোঁয়ার লোভে যমুনা ওয়াটার লেভেল বাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন ওই জল দেখে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে ওঠেন, কোই লেও, কোই লেও। তখন ওই ঘাটের নাম হ য়ে যায় কইলো ঘাট। কী রে ঠিক বলেছি?"

"বিলকুল ঠিক। এ বার বল, তোর যে পার্টিটা আসছে, তারা বেড়াতে আসছে, না ধর্ম করতে।"

"ধরে নে দুটোই।"

"তা হলে এক কাজ কর। ওদের সঙ্গে বদ্যিনাথবাবুকে ভিড়িয়ে দে।"

"কে লোকটা?"

"আরে বৃন্দাবন স্টেশনের মাস্টার ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড। এখানেই রয়ে গেছেন। আর দেশে ফেরেননি। বৃন্দাবন সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনো আছে ভদ্রলোকের। মাঝে মাঝে এখন গাইডের কাজ করছেন। পার ডে পঞ্চাশ টাকা করে নেন। এখন এটাই ভদ্রলোকের রোজগার। তোর পার্টিকে শুধু জায়গাটা দেখালেই তো হবে না। পিছনের গল্পটাও বলতে হবে। না হলে পার্টি স্যাটিসফায়েড হবে কেন?"

"কথাটা মন্দ বলিসনি। তবে পঞ্চাশ টাকা! এটা কম করা যায় না?"

"তুই কি ছেলে বল তো? একটা লোক এই গরমের দিনে সারাটা দিন বকবক করে যাবে, আর সামান্য পঞ্চাশ টাকাও তাকে তুই দিবি না?"

অগত্যা রাজি হল রাজা, "ঠিক আছে। আগে বাড়।"

"ওই তো নন্দ রাজার বাড়ি থেকে শুরু করবে। একই এরিয়ার পুতনা বধের মন্দির। পুতনা রাক্ষসী যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে মরেছিল সেখানে একটা মন্দির আছে।"

"কী গাঁজাখুরি গল্প বল তো। অচেনা, অজানা একজন মহিলা এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে ব্রেস্ট ফিড করাতে লাগল। হতে পারে?"

"এই শোন, এই জন্যই গাড়ির বিজনেস তোর দ্বারা হবে না। কোথায় এই ঘটনাটা টুরিস্টদের রঙচঙ মাখিয়ে বলবি, তা না করে ইনটেলেকচুয়াল লোকেদের মতো খুঁত ধরছিস। আরে পুতনার গল্প বিশ্বাস না করলে তোর এই পার্টি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আর পাঁচজনকে পাঠাবে কেন?"

রাজা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর বলব না, আগে বাড়।"

"ওই গোকুলের আশপাশে এত জায়গা যে তোর পার্টির সারাদিন কেটে যাবে। ওর কাছাকাছি ছুটিথরা। ওখানে কৃষ্ণ রাখাল বেশে মেরেছিলেন বৎসাসুর, বকাসুর আর অঘাসুরকে। তখন কত অসুর আর রাক্ষসীর বাস ছিল ভাব এখানে!"

কথাটা শুনে রাজা হেসে ফেলল। দোকানে দুটো মেয়ে ঢুকছে। রাজা ওদের চেনে। বি এড কলেজের ছাত্রী। একজনের হাতে মোবাইল সেট দেখে ও বুঝল, ক্যাশ কার্ড ভরতে এসেছে। পাঁচশো পঁচিশ টাকার ব্যাপার। প্রোগ্রাম অসমাপ্ত রেখে রাজা এ দিকের কাউন্টারে চলে এল। একজনের নাম শীলা। অন্যজনের নামটা ও মনে করতে পারল না।

এস টি ডি বুথ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা একটা মোবাইল ফোন কার্ডের এজেন্সিও নিয়েছে। এটা ওর চার নম্বর ব্যবসা। কলেজের মেয়েদের মাথায় ও ঢুকিয়েছে, তোমরা একটা করে মোবাইল সেট নিয়ে নাও। তা হলে কাউকে বুথে ছুটে আসতে হবে না। হোস্টেলে বসেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বাড়ির লোকেরাও তোমাদের যখন তখন কন্টাক্ট করতে পারবে। গত এক মাসে রাজা বারোটা সেট বিক্রি করে ফেলেছে।

শীলার মুখোমুখি হয়ে রাজা বলল, "তোমাকে অনেকদিন দেখিনি যে? বাড়িতে গেছিলে বোধহয়?"

শীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কেমন করে বুঝলে?"

রাজা বলল, "তোমার মুখটা দেখে। মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিন কোথাও বেশ শান্তিতে কাটিয়ে এসেছ তুমি। মায়ের কাছে গিয়েছিল বলেই তোমার মুখটা এত ফর্সা আর শান্ত লাগছে।"

এসব কথা রাজা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেককেই বলে। কাস্টমার পটানোর জন্য। ওদিক থেকে ধর্মেন্দ্র একবার গলা খাকারি দিল। রাজা ভুলেই গেছিল, ও এখন দোকানে। পরে গালাগাল দেবে। দিক, কিন্তু শীলাকে না পটিয়ে এখন ও কিছুতেই ট্যুর প্রোগ্রামে মন দিতে পারবে না।

শীলা খুশি হয়ে বলছে, "মাম্মিরকাছে ছিলাম। দেরাদুন। কালই এসেছি। রাজা এই সেটটায় কার্ড পুরে দাও। মাম্মিকে ফোন করতে হবে।"

কার্ড রিনিউয়ের তারিখ পেরিয়ে গেছে কী না, দেখার জন্য রাজা একটু সময় নিচ্ছিল। এক সেকেন্ডেই জানা সম্ভব। কিন্তু কাস্টমারকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রয়োজনে একটু বেশি সময় দিতে হবে। যাতে কাস্টমার মনে করে তার প্রতি সত্যি মনোযোগ দিচ্ছে। ধর্মেন্দ্র বোধহয় লক্ষ্য রেখেছে এদিকে। ও দ্বিতীয়বার গলা খাকরি দিল। রাজা বুঝতে পারল, চটেছে।

"আমার বন্ধুটার সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বোধহয় রাজা?"

"না, তুমি তো কোনওদিন আলাপ করিয়ে দিওনি। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে আমি ভয় পাই।"

শুনে শীলা আর ওর সঙ্গিনী দু'জনেই হেসে উঠল। তারপর শীলা বলল, "এর নাম রীতা। আমার রুমমেট।"

ধর্মেন্দ্র এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর চাউনি দেখেই রাজা বুঝতে পারল, মনে মনে ও মুণ্ডপাত করছে। ভাবছে, আমার কাজ ছেড়ে তোর কাজ করার জন্য এখানে এলাম, আর ব্যাটা, তুই কাজটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মেয়ে দু টোর সঙ্গে চালবাজি মেরে যাচ্ছিস। বাঃ ব্যাটা।

শীলা কাউন্টারে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। কামিজের ফাঁক দিয়ে ওর ভরাট স্তনের উপরিভাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঠিক তখনই রাজার মিঠুর কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ সরিয়ে নিল। নাহ্, এটা উচিত হচ্ছে না। গতকালের রাজা মিত্র আর আজকের রাজা মিত্রের মধ্যে অনেক তফাত। তুমি কাস্টমার, ঠিক আছে শীলা। কিন্তু তার বেশি ঘনিষ্ঠতা নয়। দ্রুত ক্যাশ কার্ড বের করে শীলার মোবাইল সেটে পুরে দিয়ে রাজা বলল, "নাও, এ বার যখন খুশি তখন মাম্মির সঙ্গে কথা বলতে পারবে।"

মিনিট দুয়েক পর শীলারা বেরিয়ে যেতেই রাজা দেখল, ধর্মেন্দ্র নেই। রেগেমেগে চলে গেছে। নিজে ডাকতে গেলে ওকে কলির কেষ্ট-ফেষ্ট, যা নয় তাই বলে দেবে। তাই ও লাডলাকে পাঠাল ধর্মেন্দ্রর দোকানে। হাতে এখন কোনও কাজ নেই। কিন্তু রাজা কোনও কাজ না করে শুধু শুধু বসে থাকতে পারে না। ড্রয়ার থেকে পরিষ্কার কাপড় বের করে ও শো কেসের কাচ মুছতে লাগল। এই কাজটা করার কথা লাডলা আর সুমনের। রাজা চায়, ওরা এসে দেখুক, দোকানের মালিক নিজেই কাজটা করছে। দেখলে ওরা লজ্জা পাবে।

বেলা দশটা বাজে। এই সময়ে রোজ শরীরটা ঠাণ্ডা রাখতে রাজা এক গ্লাস মৌসম্বির রস খায়। পাশে, মার্কেট কমপ্লেক্সের মধ্যেই একটা ফলের দোকান আছে। ফলের রসও বিক্রি হয় ওই দোকানটা থেকে। নন্দলালকে ডেকে ও বলল, মিশিরের দোকান থেকে বড় এক গ্লাস জুস নিয়ে আয় তো। বলবি, রাজাবাবুর। যেন স্পেশাল করে বানায়। আমি বেরোনোর সময় পয়সা দিয়ে যাব।" রাজার পান সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই। নিয়মিত শরীর চর্চা করে বলে খুব ফলের রস খায়। মৌসম্বির জুস খেলে কিডনি ভাল থাকে। বাড়িতে মাছ-মাংসের চল নেই। শুধু ওদের বাড়িতে কেন, সারা বৃন্দাবনে মাছ-মাংস, আদা, পেঁয়াজ, রসুন এমন কী গাজরও নিষিদ্ধ। এখনকার দিনে এই সব নিয়মের কোনও মানে হয়? কবে কোন কালে সম্রাট আকবর একটা ফতোয়া জারি করে গিয়েছিলেন, সেটা এখনও মানতে হ চ্ছে।

রাজা মাছ মাংস খায়। বৃন্দাবনে নয়, মথুরায় গিয়ে খায়। ওখানে বেশ ভাল কয়েকটা রেস্তোরাঁ আছে। নন ভেজ আইটেম পাওয়া যায়। কোনও কোনও দিন সঙ্গীতা ভাবিকে ও নিয়ে যায়। এমনিতে ভাবি খুব যে মাছ মাংসের ভক্ত তা নয়। মাঝে মাঝে স্বাদ বদলাতে হুজুগ তোলে, রাজা ভাইয়া যাবে না কি? তখন ভাবিকে স্কুটারের পিছনে তুলে নিয়ে ও মথুরায় ছোটে। নবীন ভাইয়ার অবশ্য মাছ মাংসের প্রতি কোনও টান নেই। মাছের গন্ধই সহ্য করতে পারে না।

নন্দলাল জুসের গ্লাস এনে দেওয়ার পরই লাডলা ফিরে এসে বলল,

"ধর্মেন্দ্র ভাইয়া এখন আসতে পারবে না। খুব চটে গেছে। আমায় বলল, তোর মালিককে বলিস ওর দরকার। ও যেন আমার দোকানে আসে। তাও আমি রিকোয়েস্ট করলাম। বলল, তোদের দোকানে যে সময়টায় কোনও মেয়ে কাস্টমার থাকবে না, সেই সময়ে আমাকে ডাকিস।"

শুনে রাজা হাসতে লাগল। রস খেতে খেতে ও একবার ভাবল, রাগটা পড়লে নিজেই গিয়ে বন্ধুকে ডেকে আনবে। এরকম রাগ ধর্মেন্দ্র অনেকবার দেখিয়েছে। সেটা কী করে ভাঙাতে হয়, সে ট্যাকটিক্স রাজা জানে। ওর সামনে একটা ফালতু সমস্যা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এবং এমন ভাব দেখাতে হবে, যেন ও ছাড়া কেউ তার সমাধান করতে পারবে না। প্রথমে ধর্মেন্দ্র গা ছাড়া উত্তর দেবে, এটা করলে পারিস। সেটা তোর ব্যাপার। আমাকে জড়াস না। কিন্তু তারপর থেকেই নিজেকে জড়াতে থাকবে। বলবে, তোকে বহুত দিন মানা করেছি। আমার কথা শুনবি না। এখুনি গিয়ে এটা কর। না হলে ব্যাটা আরও প্রবলেমে পড়বি। তারপর একেবারে শেষ দিকে বলবে, তুই আমার উপর ছেড়ে দে। আমি দেখছি। কোন শালা তোকে কী করে আমি দেখছি। রাজা ঠিক করে নিল, ফালতু সমস্যা তো হাতের কাছে একটা আছেই। স্টেফানি ওরফে নির্মলা দাসী। ধর্মেন্দ্রকে শুধু বলতে হবে, আমাকে বাঁচা।"

ফোনটা বাজছে। রিসিভার তুলে গলা শুনে রাজা বুঝতে পারল, বড়ি দিদি। মিঠুর দরকারে সকালে ওঁকে একবার ফোন করেছিল রাজা। তখন উনি বাথরুমে। বোধহয় সেই কারণেই ফোন করেছেন। কিন্তু ওর গলা পেয়ে বড়ি দিদি বলতে শুরু করলেন, "লালা, তুই যা করেছিস, শুনে আমার গর্ব হচ্ছে রে। আশীর্বাদ করি তুই আরও বড় হ।"

রাজা বুঝতেই পারছে না কিছু। ও কী এমন করল যে বড়িদিদি হঠাৎ এমন উচ্ছ্বসিত? অস্পাতাল থেকে আমাকে ফোন করেছিল।" বড়িদিদি বলেই যাচ্ছেন, "শান্তিলতা ভাল আছে রে। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। তুই পারলে একবার অস্পাতালে যাস। দ্যাখ, মানুষ যদি মানুষের পাশে এসে না দাঁড়ায়, তা হলে জগতটা চলবে কী করে?"

অস্পাতালের কথা শুনে রাজা এবার বুঝতে পারল। ঘটনাটা মনেই ছিল না ওর। অবশ্য ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলাই ভাল। আজ সকালে আখড়া থেকে ফেরার সময় বৃন্দাবন-মথুরা রোডে হঠাৎ শোনে, হটো হটো রব। ডান দিকে তাকাতেই ও দেখে গলির ভেতর থেকে একটা বড় সড় সাইজের ষাঁড় শিঙ উঁচিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে আসছে। ভয়ে লোকজন এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। এই ষাঁড়গুলো মারাত্মক। কাউকে গুতিয়ে দিলে সর্বনাশ। গরমের দিনে প্রায়ই রাস্তায় এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

সকালের এই সময়টায় বিধবা বুড়িরা ভজনাশ্রমের দিকে যায়। হটো হটো শুনে এক বুড়ি পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একেবারে রাজার স্কুটারের সামনে। ঠিক সময়ে ও ব্রেকটা কষেছিল। না হলে বুড়ির গায়ে ধাক্কা লাগত। স্কুটার থেকে তাড়াতাড়ি নেমেই ও দেখে, পাথরের টুকরায় বুড়ির মাথা ফেটে রক্তারক্তি। সাদা থান লাল হয়ে গেছে। বিধবা বুড়িদের প্রতি ওর কোনও রকম শ্রদ্ধা নেই। তা সত্ত্বেও রাজা একটা রিকশায় তুলে বুড়িকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছিল অস্পাতালে। ডাক্তার কৌশিকের আন্ডারে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। না, তেমন বড় কোনও চোট পায়নি। মাত্র দুটো সেলাই হয়েছে। ডাক্তারের কাছে ও নিজের নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে এসেছিল। বড়িদিদি বোধহয় ডাক্তারের কাছেই জানতে পেরেছে ওর নাম।

বাজা বলল, "বড়িদিদি, কলকাত্তা থেকে একটা মেয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কখন গেলে আপনার সুবিধা হবে?"

"কে রে মেয়েটা? তোর চেনা?"

"হ্যা। বিধবাদের নিয়ে স্টাডি করতে এসেছে।"

"বিকালের দিকে নিয়ে আসিস। ওই সময়টায় ওরা অনেকে আমার বাড়িতে আসে। সরাসরি ওদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব তা হলে। আর, তুই কিন্তু একবার অস্পাতালে যাবি, কেমন?"

বাধ্য ছাত্রের মতো রাজা বলল, "যাব বড়ি দিদি।"

ফোনটা রেখে ও নিশ্চিন্ত বোধ করল। যাক, মিঠুর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করা হয়ে গেল। ও যদি যোগাযোগ করে তা হলে বিকালে বাঁকে বিহারী কলোনিতে নিয়ে যাবে। কাজ হয়ে গেলে নিয়ে আসবে এখানে। সন্ধ্যা বেলায় এ জায়গাটা খুব জমজমাট থাকে। ইসকনের মন্দির দেখার জন্য প্রচুর ভিড় হয়। সেই সময় রাস্তা থেকে ওর দোকানটাও আলোয় স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। মিঠুকে ওর দোকানটা দেখানোর জন্যই রাজা নিয়ে আসবে। কাল টুনডলা থেকে আসার সময় মিঠু ওকে বার দুয়েক ড্রাইভার বলে ডেকে ফেলেছিল! হয়তো ভুল করে। কিন্তু ডাকটা কাঁটার মতো খচখচ করেছে কাল রাতে ওর মনে।

দোকানে দাঁড়িয়ে হঠাৎই রাজার মনে হল, কী সব আজে বাজে ভাবছে। ওর এই দোকানে কী এমন আছে যে, মিঠু দেখে তাজ্জব হয়ে যাবে? কলকাতার যে কোনও বড় রাস্তায় এর চেয়ে অনেক গুণ সাজানো দোকান আছে। ছোড়দির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গত বছর উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলেই যে সব দোকানপত্র ও দেখে এসেছে, সারা মথুরাতে সেই রকম দোকান একটাও নেই। ছোড়দির কথা মনে হওয়াতে হঠাৎই রাজার মনে পড়ে গেল জিজাজির আফিস কলিগদের কথা। এ হে, ট্যুর প্রোগ্রামটা করা হল না। এই দোকান করার সময় ছোড়দি টাকা না দিলে ও কিছুই করতে পারত না। জিজাজির লোক মানে, ছোড়দিরই লোক। রাজা.চায় না কোনও কারণে ত্রুটি হোক।

নাহ, এখুনি কাজটা সেরে রাখা দরকার। ভেবে, ও দোকান থেকে নেমে এল। ধর্মেন্দ্রর দোকানে এসে দেখল, ও বসে বসে দৈনিক জাগরণ কাগজটা পড়ছে। ভেতরে ঢুকেই রাজা একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "এই স্টেফনি মেয়েটার জন্য বুঝলি ধর্মা, আমাকে বৃন্দাবন ছাড়তে হবে। কাল আমাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া ক রেছিল। ভাবিকে বিরক্ত করে মেরেছে। কী করা যায় বলত?"

কাগজ থেকে মুখ সরাল না ধর্মেন্দ্র। এখনও ওর রাগ পড়েনি। রাজা কাগজটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "ধর্মা, তুই না বাঁচালে তো..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে ধর্মেন্দ্র বলল, "তোর প্রবলেম। তুই ফেস কর। এতে আমাকে টানছিস কেন?"

ডায়লগ ঠিকই আছে। রাজা গদির ওপর বসে পড়ল। এই উত্তরটাই প্রথমে ও আশা করেছিল। ও বলল, "পুরো ব্যাপারটা তুই জানিস বলেই তোকে বলছি।"

"দ্যাখ রাজা, মেয়েদের সঙ্গে তোর বিহেভিয়ারিয়াল প্যাটার্ন তো দেখছি। সমস্যাটা তুই কিন্তু তৈরি করছিস। কই, আমাদের তো কোনও সমস্যা হয় না? নিশ্চয় তুই এমন একটা ভাব করেছিস, মেয়েটা ভাবছে, তুই প্রেমে পড়ে গেছিস।"

"বিশ্বাস কর, তেমন কিছু না। তোকে তো সব বলেছি। লাস্ট বার গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে মেয়েটা কি করেছিল।"

"থাম তো। এমনি এমনি কোনও মেয়ে তোর সঙ্গে শুতে চাইবে? তোর দিক থেকে কোনও সাড়া না পেলে? আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস।"

রাজা এ বার অন্য পথ ধরল, "ওহ তাহলে তুই আমাকেও আজকাল অবিশ্বাস করছিস? জানা রইল। স্টেফানির কথা আর তোর কাছে তুলবই না।"

"এই তো, সত্যি কথা বললে গায়ে লাগে, তাই না? মেয়েটাকে সরাসরি ফেস করছিস না কেন? বল, যে তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তা হলেই তো সব ফুরিয়ে যায়। অবশ্য এটা তোর ব্যাপার। তুই কী করবি, তুই ঠিক করা।"

ক্লিপ্ট ঠিক পথেই চলছে। আর একটু পরেই ধর্মেন্দ্র লাইনে এসে যাবে। রাজা বলল, "মেয়েটাকে বলতে পারি। কিন্তু কী জানিস, ও মারাত্মক দুঃখ পাবে। অন্য একটা রাস্তা বের কর। যাতে সাপ মরে, আবার লাঠিও না ভাঙে। পারলে, তুই পারবি এটা।"

ধর্মেন্দ্র এবার বলল, "ঠিক আছে। দেখি, কী করা যায়।"

রাজা মনে মনে হাসল। এবার ট্যুর প্রোগ্রাম। সরাসরি বললে কিছুতেই ধর্মেন্দ্র ফের ওর দোকানে যাবে না। তাই ঘুরিয়ে বলল, "এই মাত্র কলকাত্তা থেকে ছোড়দি ফোন করেছিল। ট্যুর প্রোগ্রামটা করেছি কী না জানতে চাইছিল। আমি বললাম, ওটা ধর্মা করছে। ছোড়দি বলল, দেখিস ভাইয়া তোর জিজাজির কলিগরা যেন অসন্তুষ্ট না হয়।"

"দোকানে কলির কেষ্ট হয়ে মেয়েদের সঙ্গে তুই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবি। আর আমি তোর হয়ে গাধার খাটনিটা খেটে দেব, এটা তুই ভাবলি কী করে?"

"এ ভাবে কথা বলছিস কেন ধর্মা? তোর জন্য আমি করি না?"

শুনে থমকে গেল ধর্মা। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তুই যা। আমি একটু পরে আসছি। কিন্তু ফের যদি মেয়ে কাস্টমারকে দেখে হ্যাংলাপনা করিস, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।"

ধর্মার দোকান থেকে ফের ফুরফুরে মেজাজেই বেরল রাজা ব্রজবাসী ছেলেরা একটু সহজ সরল গোছের হয়। ধর্মাটাও সে রকম। কথাটা ভাবতে ভাবতে নিজের দোকানের বাইরে বড় ইমলি গাছটার তলায় এসে রাজা দাঁড়াল। গাছের তলায় শুখা ইমলি পড়ে আছে। জায়গাটা নোংরা হয়ে গেছে। রাধা মাইয়ার না কি অভিশাপ আছে ইমলি গাছের উপর। তাই বৃন্দাবনে ইমলি, মানে তেঁতুল পাকে না। গাছটা থাকায় রাজার অবশ্য খুব সুবিধে হয়েছে। ছায়ায় গাড়িগুলো রাখা যায়। আজ অবশ্য দুটো গাড়ি ভাড়া

খাটতে গেছে। শুধু টাটা সুমোটা দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ও মোটেই বিচলিত নয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রাজা পর্দা সরিয়ে দোকানে উঠে এল। ঢুকেই মিঠুকে বসে থাকতে দেখে ওর বুকটা ছলাৎ করে উঠল। মাছির উৎপাত এড়াতে লাডলা মাঝে মাঝে দোকানে পর্দা টেনে দেয়। তাই বাইরে থেকে রাজা মিঠুকে দেখতে পায়নি। চোখাচোখি হতে ও বলল, "আরে আপনি?"

মিঠু উঠে দাঁড়িয়েছে। কাল রাজা ঠিকই ধরেছিল, হাইট প্রায় ওরই সমান। হালকা গেরুয়া রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। চুল উল্টো করে টানটান বাঁধা। দারুণ লাগছে ওকে দেখতে। হা করে রাজা তাকিয়ে রইল।

"রাজা, প্রথমেই আমি অ্যাপোলজি চেয়ে নিচ্ছি, কাল না জেনে ড্রাইভার বলে ডাকার জন্য। প্লিজ, কিছু মনে করেননি তো?"

মেয়েদের কাছে টানার একটা অস্ত্র রাজার আছে। ওর হাসি। সেটা প্রয়োগ করে ও বলল, "ভুলটা ভাঙল কী করে?"

"সকালে চরণদাস বাবাজি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনিই বললেন। পরে আপনার কার্ড দেখে আমার খুব লজ্জা লাগল। ভাবলাম, ফোন না করে সামনাসামনি অ্যাপোলজি চেয়ে নেওয়া ভাল।"

"কিন্তু আমার শো-রুম চিনলেন কী করে?

"চরণদাস বাবাজির কাছে জেনে নিলাম।" মিঠুর মুখে হাসি। চোখে চোখ রেখে ও কথা বলছে। ওর আরও বেশি চোখে থাকার জন্য রাজা আর একবার ওর মনমোহিনী হাসিটা হাসল।

"আমার অ্যাপয়েনমেন্টটা কি করা হয়েছে? বিমলা বাসুর সঙ্গে? এখন যাওয়া যেতে পারে? দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার হাতে কোনও কাজ নেই।"

মুখের সামনে একটা মাছি উড়ছে। সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করে রাজা বলল, "এই গরমে? মাছিরাও পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকতে চায় না। দেখুন, শো কেসের উপর কত মাছি? একটু ঠাণ্ডা পেয়েছে। মাছিরাও ভেতরে এসে আরাম করছে।"

মিঠু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "সত্যি বাবা, দেখে ঘেন্না লাগছে। তাড়ান না এই মাছিগুলোকে?"

"দাঁড়ান, আমার মাছি এক্সপার্টকে ডাকি।" বলেই রাজা লাডলাকে ডাকল, "এই, মাছিগুলোকে বের করে দে তো?"

একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় লাডলা মাছি তাড়ায়। একটা দুটো তো নয়। পঞ্চাশ-ষাটটার মতো। প্রথমেই ও দোকানের সব লাইট নিভিয়ে দেয়। তারপর পর্দা সরিয়ে দিয়ে বেতের হাত পাখা নেড়ে বাতাস করতে থাকে বাইরের দিকে। অন্ধকার থে কে মাছি আলোর দিকে বেরিয়ে যায়। ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে গেলে লাডলা চট করে পর্দা ফেলে দেয়। এই প্রক্রিয়া সারতে ওর লাগে দু থেকে তিন মিনিট। তাই মিঠুকে নিয়ে রাজা দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল।

মিঠু বলল, "রাজা, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ কাউকে আপনি আজ্ঞে করতে পারি না।

তোমাকে যদি তুমি করে বলি আপত্তি আছে?"

"মোটেই না। স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। কাল রাত থেকে আমিও এই কথাটাই ভাবছি। যাক, তুমি কথাটা তুলে ভালই করলে।"

মিঠু চমকে ওর দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, "কাল রাত থেকে আর কী কী ভেবেছ শুনি?"

"তৃতীয়বারের দেখায় সব কথা বলে দেওয়া ঠিক না।"

"তৃতীয়বার মানে? এটা তো দ্বিতীয়বার।"

"না ম্যাডাম, আমাদের মধ্যে আরও একবার দেখা হয়েছিল। সে কথা আপনার মনে থাকার কথা নয়। যাক গে, বিমলা বাসুর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বিকালের দিকে যেতে বললেন।"

"ইস! সকালের দিকটা আমার বেকার গেল। আসলে চরণদাস বাবাজি এসে এমন গল্প শুরু করে দিলেন মায়ের সঙ্গে যে, উঠতেই পারলাম না। এখানে কোথায় কোথায় বিধবারা থাকেন, জানো? এখনই গিয়ে কথা বলতে চাই? আসলে সময়টা যেন নষ্ট না হয়।"

রাজা জানে কোথায় গেলে বিধবা বুড়িদের পাওয়া যাবে। সেবা কুঞ্জ, শৃঙ্গার বট, গোবিন্দ ঘাট, কেশী ঘাট, মধুবন কলোনির দিকে। কিন্তু ওখানে পূর্তিগন্ধময় পরিবেশ। মিঠু বড়লোকের মেয়ে। জীবনে কখনও দারিদ্র দেখেনি। ওই সব জায়গায় গেলে মিঠু সহ্য করতে পারবে না। চট করে রাজার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। মিঠুকে অস্পাতালে নিয়ে গেলে কেমন হয়? কী নাম যেন বুড়িটার? শান্তিলতা। এক ঢিলে দু পাখি মারা হয়ে যাবে। বুড়িকে ওর দেখা হয়ে যাবে। আবার মিঠুর ইন্টারভিউ নেওয়াও হবে।

মনস্থির করে ও বলল, "চলো, একটাজায়গায় যাবে? এক বিধবার সঙ্গে তোমার কথা বলিয়ে দিচ্ছি।"

"যাবে কিসে? তোমার এখানে রিকশা করে এলাম। ভীষণ গরম লাগছিল।"

"চলো, তা হলে গাড়িতে যাই।"

কথাটা শুনে কী যেন মনে পড়ল মিঠুর। কাঁধে ঝোলা চামড়ার ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ও বলল, "এই রে এতক্ষণ ভুলেই গেছিলাম। গাড়ির কথায় মনে পড়ল। কালকের গাড়ি ভাড়াটা মা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

টাকাটা হাতে নিয়ে অবহেলায় বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রাজা। না গুণে কখনও ও কারও কাছে টাকা নেয় না। কিন্তু মিঠুর সামনে টাকা গুণতে ও একটু লজ্জাই পেল। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নন্দলাল। ওর কাছ থেকে গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিয়ে রাজা ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল। মিঠু এসে বসেছে বাঁ পাশে। আহ্, দারুণ লাগছে ওকে এত কাছে পেয়ে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ও যখন বেরোচ্ছে, ঠিক তখনই দৃশ্যটা ওর চোখে পড়ল। ওর দোকানের সিঁড়িতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ধর্মেন্দ্র। ওর মুখটা দেখেই রাজার হাসি পেল। ফের চটেছে।

বেলা একটায় গুরুকুলের আশ্রমে ফেরার পরই ননীবালা টের পেল, কানাই গোঁসাই ফিরেছে। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নীচের হলঘরে ও এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। রান্না ঘরে কী যেন করছে চাঁপা। দেয়াল ঘেঁসে বসে আছে কয়েকজন। খাওয়ার প্রতীক্ষায়। ননীবালা আজ খেয়ে এসেছে সতদেব ভবনে। ভাত, ডাল আর পটলের তরকারি। খবরটা দিয়েছিল সান্ত্বনা। ভজনাশ্রম থেকে দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে এসেছে। দুপুরে এখানে কী খেতে দেওয়া হয়, তা দেখার জন্য ননীবালা টুলের উপর বসে পড়ল।

ওর হাতের পুঁটলির ভিতর নতুন থান। এখানে না আবার চুরি হয়ে যায়। এই আশ্রমের কাউকে ও চেনে না। থানটা চুরি হয়ে গেলে কাউকে কিছু বলতেও পারবে না। জগতের কী অদ্ভুত নিয়ম। যার কিছু নেই, তার হারানোর কিছু নেই। যার কিছু নেই, তার আঁকড়ে রাখারও কিছু নেই। সকাল পর্যন্ত ননীবালার কোনও দুশ্চিন্তাই ছিল না। সামান্য একটা থান নিয়ে এসে সমস্যায় পড়েছে। সামনে বসা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে বলল, থানটা ঠাকুর দিয়েছেন। তিনিই রক্ষা করবেন। আমার চিন্তা করার কোনও দরকার নেই।

'অ দিদি, থানটা পেলে বুঝি?"

পাশ থেকে জিজ্ঞেস করছে একজন। চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা। চোখ দুটো কাচের জন্য বড়বড় দেখাচ্ছে। মুখে অসংখ্য বলিরেখা। দাঁত নেই বলে গাল তুবড়ে ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে। বয়স ষাট-পঁয়ট্টি তো হবেই। ঠিক থানের দিকে নজর গেছে। ননীবালা বলল, 'হ ভজনাশ্রম থেইক্যা দিসে।"

"আমাকে অর্ধেকটা দেবে?"

অনুরোধটা শুনে ননীবালা চমকে উঠল, "আধা থান লইয়া কী করবা?"

"রাতে জড়িয়ে শুয়ে থাকব।"

ননীবালা বুঝতে পারল, ওর মতোই অবস্থা এদের। পরনের থানটা কেচে শুকোতে দেবে। তখন আব্রু রক্ষার কাজটা করবে আধা এই থান। ও উত্তর দেওয়ার আগেই ভাতের ডেকচি নিয়ে বেরিয়ে এল চাঁপা। সবাইয়ের মন চলে গেল ডেকচির দিকে। চাঁপা মেয়েটার মুখে কোনও কথা নেই। বড় হাতা করে গলা ভাত ও দিতে লাগল সবার থালায়। কাল রাতে বিছানায় শুয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছিল মেয়েটা। কেন, আজ বিকাল বা সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে।

"অ চাঁপা, আমারে আর এট্টু ভাত দে মা। খিদা পায় যে।" ও পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল। তার আকৃতি শুনে ননীবালার মনে হলে, অনেকদিন পেট পুরে খেতে পায়নি। গোবিন্দর যে কী লীলা, বোঝা মুশকিল।

"আবার চিল্লাইতাছ?" হলঘরের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে জয়ামঞ্জরী। খুব কড়া গলায় ও বলে উঠল, "গোঁছাই ঠাকুর বিশরাম নিতাছেন। হুদু হুদু চিল্লাইও না। যা দিব, খাইয়া উইঠ্যা পড়বা।"

হলঘরে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। কুঁজো হয়ে বসা মানুষগুলো থালার দিকে সব ঝুঁকে পড়েছে। জলের মতো পাতলা ডাল। তাই দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছে। এখন এ সব দেখে কষ্ট হয় না ননীবালার। এদের এটাই ভবিতব্য। গোবিন্দ সব কিছু মেপে রেখেছেন। যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে ঠিক ততটুকুই দেবেন। আজ সতদেব ভবনে ওর ভাত মেপে রেখেছিলেন। না হলে ওকেও গলা ভাত আর পাতলা ডাল গলাধকরণ করতে হত।

"তুমি খাইয়া আইস না হি?" ওকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা ছুঁড়ল জয়ামঞ্জরী।

খুব কর্তৃত্ব নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। যেন কৃতার্থ করছে সবাইকে খাইয়ে। জোয়ান বয়স, রক্ত গরম। মনে মনে ননীবালা বলল, বয়সটা আগে আমাগো মতো হউক, তহন বুঝতে পারবি, কত ধানে কত চাইল। মনের বিরক্তি অবশ্য ননীবালা প্রকাশ করল না। বলল, "হ খাইয়া আইসি।"

"ভাল করসো। তবে আগে থেইকা জানাইয়া দিবা, এহানে খাইবা কী না। এহানে অনেক কষ্টের চাইল। নষ্ট কইরও না।"

কথাগুলো বলেই করিডোর দিয়ে মন্দিরের দিকে, চলে গেল জয়ামঞ্জরী। শুনে একটু খারাপই লাগল ননীবালার। কথাটা জয়া অন্যায় বলেনি। একটা অপরাধবোধ কয়েক সেকেন্ড ওকে আচ্ছন্ন করে দিল। তারপর নিজেকে সামলে টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পুঁটলিটা ও হাতে তুলে নিল। সারা শরীর নুন নুন হয়ে রয়েছে। হাত-মুখে জল দেওয়া দরকার। উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ানো মাত্র ননীবালা গোঁসাই ঠাকুরকে দেখতে পেল।

প্রায় দরজা সমান লম্বা। ধবধবে ফর্সা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বুকে ঘন লোম। এক গাল দাড়ি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গেরুয়া ধুতি। পায়ে খড়ম। ভয়ঙ্কর পুরুষালি চেহারা। এক পলকেই ননীবালা বুঝতে পারল, পুরুষটি প্রবল কামপ্রবণ। এবং এক ধরনের সম্মোহন শক্তির অধিকারী। তাড়াতাড়ি ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। ও মনে মনে প্রার্থনা করল, গোঁসাই ঠাকুরের যত কম মুখোমুখি হওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

ভোরে বেরনোর সময় মশারিটা ভাঁজ করে যায়নি। ঘরে ঢুকেই ননীবালা দেখল, ওর বিছানা কে যেন সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই চাঁপার কাজ। কলের জলে মুখ চোখ ধুয়ে ও চৌকির উপর শুয়ে পড়ল। শৃঙ্গার বটে এই সময়টায় ওর ঘরে শুতে আসত রিকশাওয়ালার বউ শিখা। ঠাণ্ডা মেঝেয় দু'দণ্ড গড়িয়ে নিত। মছলন্দপুরের মেয়ে। শুয়ে শুয়ে কত কথা বলত। বিয়ের দশ বছরেও বাচ্চা কাচ্চা হয়নি। তার জন্য দুঃখ ছিল না শিখার। বরং বলত, 'বেঁচে গেচি মামি। নিজেরাই ভাল করে খেতে পাই না। পৃথিবীতে আরেকটা প্রাণীকে এনে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না।"

ননীবালা ধমক দিত, "আরে তুই আনার কে রে? এই পৃথিবীতে কাকে তিনি আনবেন, কাকে ফেরত নিয়ে যাবেন, সব তো তিনিই ঠিক করেন। গোবিন্দ।"

শুনে শিখা হাসত, "রাখো তো মামি, গোবিন্দ নিয়ে তোমার বাড়াবাড়ি। ঠাকুর দেবতা সব বুজরুকি। ও সব বামুনদের চালাকি।"

ননীবালা বলত, "বিশ্বাস করস না বইল্যাই তর এই অবস্তা। সবার গভভে সন্তান হয়। ঠাকুর তর গভভে দেয় না ক্যান? আগের জন্মে পাপ করসিলি। এই জন্মে ভুগতাছস।"

গেল পরিক্রমার সময় মেয়েটা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তার আর খোঁজই পাওয়া গেল না। শিখার কথা ভাবতে ভাবতেই ননীবালার তন্দ্রামতো এল। হঠাৎই ওর মনে হল শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। বাতাসের টানে ভাসতে ভাসতে ও যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। বুকটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল ননীবালার। এ কী হচ্ছে ওর শরীরে? ও হাত তোলার চেষ্টা করল, পারল না। মাথা তোলার চেষ্টা করল পারল না। নীচে আশ্রমের ছাদটা অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। আশপাশে আচুকিকে খোঁজার চেষ্টা করেও ননীবালা কোথাও ওকে দেখতে পেল না। তখন ও চেঁচিয়ে উঠে বলল, "হা গোবিন্দ। আমারে তুমি কোথায় লইয়্যা যাইত্যাছ।"

নীচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ননীবালা চমকে উঠল। আরে, এ কী? ঢাকায় পুরানা পল্টনে ওদের বাড়িতে ননীবালা চলে এল কী করে? উঠোনে এক্কা দোক্কা খেলছে যে মেয়েটা, তাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? পরনে ডুরে শাড়ি। নাকে নাকছাবি। ছোটবেলার চেহারাটা দেখে থমকে গেল ও। দাওয়ার বসে মা রান্না করছে। বাবা খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়িতে ঢুকল। ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "অই ছেমড়ি, তর মায় কই?" ননীবালা খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাবাকে এত উত্তেজিত হতে কখনও দেখেনি। বাবা রাশভারি মানুষ। জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের মাস্টার। পুরানা পল্টনে এক ডাকে সবাই চেনে। দাওয়ায় মাকে দেখেই বাবা দ্রুত পায়ে সে দিকে এগিয়ে বলল, "দেহো, তোমার মাইয়া কী কাণ্ড করছে?"

হাতে খুন্তি নিয়ে মা উঠে পড়েছে। চোখ মুখে উদ্বেগ, "কী করছে, ননী?"

"আমাগো চোদ্দো গুস্টিতে যা কেউ করে নাই। আমার মাইয়া বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হইসে।"

মা ফের বসে পড়েছে আখার সামনে। মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। শুধু বলল, "হ, ধেই ধেই কইর‍্যা নাচো তাইলে।"

"নাচুম নাচুম। বেশ করুম। হগলরে ডাইক্যা নাচুম। কম কাণ্ড করসে নাহি আমার ননীবালায়"

উঠোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ননীবালা। বাবার কাণ্ড দেখছে। উঠোনের পাশেই গোবিন্দর মন্দির। বাবা তরতর করে মন্দিরে ঢুকে সাস্টাঙ্গে প্রণাম করছে বিগ্রহকে। মুখে বলছে, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, রাম রাম হরে হবে।"

অজান্তেই দুটো হাত কপালে উঠে এল ননীবালার। স্কুলে পাঠাতে মায়ের প্রবল আপত্তি। মায়ের কথা হল, মাইয়ার যথেষ্ট বয়স হইসে। বিয়া শাদি দাওয় ল্যাখাপড়া শিইখ্যা মাইয়া মানুষের অইবডা কী। মায়ের আপত্তি বাবা শুনবে না। বাবার জেদে ওকে বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। পরীক্ষাটা ও ভালই দিয়েছিল। তবে ভাবেনি ফার্স্ট হবে। ঢাকার সব ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রথম হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। বাবা সেই আনন্দটাই হজম করতে পারছে না।

বাবা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ডাকল, "আয় মা আয়। আমার বুকে আয়। তর লইগ্যা আমার এমন গর্ব হইত্যাসে, রাখনের জায়গা নাই। হেডমিস্ট্রেস রুকসানা বেগম কী কইল জানস মা? মাইয়ারে য্যান স্কুল ছাড়াইয়া দিবেন না? ও ডাক্তার অইব।"

বাবার হাঁকে জেঠিমা, খুড়িমারাও বেরিয়ে এসেছে আশপাশের বাড়ি থেকে। খুড়িমা বড় একটা বাতাসা এনে দিল। জেঠিমার এক ছেলে। মেয়ে নেই। একটা সোনার চেন গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, "এন্ট্রান্স পরীক্ষায় যদি ফার্স্ট হইতে পারস বেটি, তাইলে তর বিয়ার খরচা আমি দিমু।"

ওপর থেকে সব দেখতে পারছে ননীবালা। ছবির মতো সব ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে খুব ধুমধাম করে নাম গান হল। খোল করতাল সহকারে কীর্তন। ধন্য ধন্য করল সবাই। গোবিন্দর কৃপা উপছে পড়েছে হরিদাস গোস্বামীর বাড়ি। মেয়ে সন্তান। ব্যাটা ছেলেদের পিছনে ফেলে দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট? ঢাকায় এইটা খবরের মতো খবর। ননীবালা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ও ফ্রক পরে আছে। কলকাতার হগ মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে গেছে বাবা। কত বছর আগেকার ঘটনা। কোন অলৌকিক মায়াবলে সে সব দেখতে পাচ্ছে, ননীবালা তা বুঝতে পারল না।

ভাল রেজাল্ট করার জন্যই নারায়ণগঞ্জ থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এল। পাত্র বেশ ধনী পরিবারের। কলকাতার কলেজে পড়ে। মার খুব আগ্রহ। কিন্তু বাবার মত নেই। ঘটকের মুখের উপর বলে দিল, "ননীরে আমি কইলকাতায় পড়তে পাঠামু। অহন বিয়া দিমু না।" মা গোবিন্দর মন্দিরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বের করে ফেলল। বাবা তবুও রাজি না।

শেষ পর্যন্ত মায়ের রাগ এসে পড়ল ননীবালার উপর। "তুই যত নষ্টের গোড়া। তরে কে ফার্স্ট হইতে কইসিল পরীক্ষায়?"

প্রায় মার খেতে হত ননীবালাকে। মায়ের হাতের বালায় একদিন কপাল ফেটে রক্তারক্তি হয়ে গেছিল। জেঠিমা ছিল বাবার দলে। কপালে ওষুধ দিতে দিতে জেঠিমা বলেছিল, 'ল্যাহাপড়া শিখি নাই বইল্যা আমাগো কী দুর্দশা দেখস না? তুই আমাগো মতোন হইস না। বাবা যা কয়, কইর‍্যা যা।"

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় হঠাৎ কী হল, বাবা একদিন বাড়িতে ফিরে বলল, "আর ঢাকায় থাকুম না।" আত্মীয়রা সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'হইসে ডা কী? কই যাইব্যা? বাবা উত্তরই দেয় না। গুম হয়ে থাকে। স্কুলে পড়াতে যায়। বাড়ি ফিরেই মন্দিরে গিয়ে বসে থাকে চুপ করে। একদিন জেঠিমাকে বলল, "স্বপ্নে দেখছি গোবিন্দ কইতাসেন, হরিদাস তুই আর এই দ্যাশে থাকিস না। নবদ্বীপে চইল্যা যা। ওহানে নিয়া গিয়া আমারে প্রতিষ্ঠা কর।" লোকের মুখেমুখে ছড়িয়ে গেল হরিদাস গোস্বামীকে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ দেখা দিয়েছেন। দেশত্যাগের আদেশ দিয়েছেন।

নবদ্বীপে থাকতেন বাবার এক দূর সম্পর্কের ভাই। তার কাছে চিঠি লেখা হল। গোপনে গোপনে বাবা তৈরি হতে থাকল। হুণ্ডি করে টাকা পাঠাতে লাগলেন নবদ্বীপে। মায়ের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজি না হয়ে উপায় নেই। গোবিন্দর আদেশ। ননীবালার মনে পড়ছে একদিন গভীর রাতে বাবা আর মায়ের সঙ্গে ও ঢাকা ছেড়েছিল। মায়ের কোলে গোবিন্দর মূর্তি। বাবার হাতে বাক্স। বর্ডার পেরোনোর আগেই বাবা কপর্দকশূন্য। কখনও হাঁটা পথে, কখনও সাইকেল ভ্যানে ওরা কোনও রকমে ওরা এসে পৌঁছেছিল নবদ্বীপে কাকার বাড়িতে। ওই চার পাঁচটা দিন ওদের কেটেছিল অসহনীয় কষ্টের মধ্যে দিয়ে। নবদ্বীপে পৌঁছেই প্রথম আঘাতটা পেয়েছিল বাবা। হুণ্ডির টাকা

না কি সব পৌঁছয়নি। কাকার বাড়িতে দিন কয়েক কাটানোর পর বাবা মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিল। একে অর্থাভাব তার উপর মায়ের গঞ্জনা। বাবা অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা স্কুলে চাকরি জোগাড় করেছিল। কিন্তু হুণ্ডির টাকা আর জোগাড় করতে পারল না। মায়ের ধারণা হয়েছিল, টাকাটা কাকাই মেরেছে। এ নিয়ে একটা সময় দু'পরিবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছিল।

নবদ্বীপে ক্লাস এইট অবধি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল ননীবালা। তারপর আর এগোল না। মা আর পড়তেই দিল না। মা সব সময় বাবাকে দুষত, "তোমার লইগ্যা মাইয়াটার এই দুর্গতি। নায়ারণগঞ্জে বিয়া দিলে আইজ আমারে দুশ্চিন্তায় থাকতে অইত না।" মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বাবা ওর বিয়ের চেষ্টা করছিল। বিয়ের যোগাযোগটা হল অদ্ভুতভাবে। রাসলীলার সময় পোড়ো মা তলার কাছে একটা মন্দিরে পাঠ শুনতে গিয়েছিল ননীবালা। মায়ের সঙ্গে। এই সব জায়গায় মা ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যেত। পাঁচটা লোক আসে। কারও যদি চোখে পড়ে যায়, মেয়েটার গতি হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল।

মন্দিরে পাঠ শুনতে এসেছিলেন বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী। ধনী পাট ব্যবসায়ী। এক নজরেই ননীবালাকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন। পাঠ হয়ে যাওয়ার পর ওর কাছে এসে বললেন, "তুই কোন বাড়ির মাইয়া রে মা? তর বাপের নাম কী?" পরদিনই ঘটক মারফত সম্বন্ধ এসে হাজির। বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীর দুই ছেলে। বড় ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট সদানন্দ পাটের ব্যবসা দেখাশুনো করে বাবার সঙ্গে। খুব ধার্মিক ছেলে। তারই সঙ্গে ননীবালার বিয়ে দিতে চান বিশ্বম্ভর। নবদ্বীপে তিন মহলা বাড়ি। গোবিন্দর মন্দির। সেই বাড়ি দেখে এসে বাবা আনন্দে কেঁদে কেটে অস্থির। "তর শউর মহাই কয় কী জানস মা, বিয়াতে আপনেরে কিছু দিতে অইব না। আমি সাজাইয়া গুজাইয়া আমার মা রে লইয়্যা আমু।"

ননীবালার বয়স তখন ষোলো, সদানন্দের তিরিশ। বয়সের একটু পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও মায়ের আপত্তি নেই। কী আশ্চর্য গোবিন্দর লীলা! বিয়ের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে বাবা যখন হিমসিম খাচ্ছে, সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে হুণ্ডিওয়ালার লোক এসে হাজির। এই নিন আপনার টাকা। নবদ্বীপে খোঁজ করতে এসে আমরা শুনে গেছিলাম, 'বর্ডার পেরোনোর সময় নাকি আপনারা সবাই খুন হয়েছেন। পরে জানলাম, না, খবরটা সত্যি নয়। খোঁজ করে করে এতদিনে আপনাদের পাওয়া গেল।"

খুব ধুমধাম করেই বিয়েটা হয়েছিল। সেই দিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ননীবালা।

শুভদৃষ্টির সময় বরকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল ওর। বউভাতের রাতে সদানন্দ বলে ছিল, "আমার বাবা আর মারে তুমি কুন দিন অসম্মান কইর না। বাবা হইল গিয়া মাটির মানুষ। দাদার বিয়া দিয়া সুখি হয় নাই। বাবা নিজে তোমারে পছন্দ কইরা আনসে। আমি থাকি বা না থাকি, বাবারে কুনদিন কষ্ট দিও না।"

শ্বশুর বাড়িতে কিছু দিন কাটানোর পরই ননীবালা বুঝতে পেরে গেছিল, ভাসুর আর জায়ের সঙ্গে বাড়ির কারও সুসম্পর্ক নেই। ভাসুর কোনও কাজ করে না। সদানন্দকে খুব হিংসে করে। ননীবালা লেখাপড়া জানে বলে জা ওকে দেখতে পারে না। ভাসুরের একটাই ছেলে। বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তাকে ননীবালা আদর করতে গেলে জা খুব বিরক্ত হয়। তবুও শ্বশুরবাড়ি খুব ভাল লেগেছিল ননীবালার। শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ আর স্বামীর ভালবাসার জন্য।

নবদ্বীপে ওর শ্বশুর বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে ননীবালা। রোজই পুজো পার্বন। দোল, ঝুলন আর জন্মাষ্টমীর খুব ধুমধাম হত। বাড়িটা গমগম করত আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে। রোজ পাত পড়ত চল্লিশ পঞ্চাশ জনের। বাড়ির ছোট বউয়ের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। সংসারের সব দায় শাশুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলেন ননীবালার উপর। সকাল থেকে সন্ধ্যা কেমন করে কেটে যেত, ও টেরও পেত না। ঘুম থেকে উঠেই স্বামীকে প্রণাম করে ও স্নান ঘরে গিয়ে ঢুকত। আর রাত্তিরে ঘুমোতে আসত শাশুড়ির পদসেবা করে।

সুখের এই পর্বটা ওর কেটেছিল বছর খানেক। তারপরই বাজ পড়ার মতো খবরটা এল। দু'দিন আগে সদানন্দ গিয়েছিল কলকাতায়। ব্যবসার কাজে। শিয়ালদার কাছে রাস্তা পেরোতে গিয়ে, বাস চাপা পড়ে মারা গেছে। খবরটা শুনে লোকজন নিয়ে ভাসুর দৌড়লেন কলকাতায়। ননীবালার খুব কষ্ট হচ্ছে সেই দিনটার কথা ভেবে। সকাল বেলার ট্রেনে জোয়ান মানুষটা গেল সুস্থ অবস্থায়। যাওয়ার সময় বলে গেল, পাট বেচার টাকা নিয়ে ফিরবে। ফিরে এল দলা পাকানো একটা দেহ! বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে ননীবালার। মানুষটা প্রায়ই বলত, আমি থাকি বা না থাকি... কেন বলত? ও কি জানত, বেশিদিন থাকবে না?

"হেই ননীবালা, উঠ উঠ। অবেলায় ঘুমাচ্ছিস কেনো?"

আচুকির ঠেলা খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ননীবালা। স্বামীর মৃতদেহ ও কে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর জা। গলার কাছটায় কী একটা দলা পাকিয়ে আসছিল ওর। আচুকিকে দেখে নবদ্বীপের বাড়িটাই ওর চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। হা করে দম নিয়ে ও নিজেকে সুস্থির করল। কতদিন ও প্রতিজ্ঞা করেছে, পুরনো দিনের কথা মনে আনবে না। গোবিন্দ ওকে যেমন রেখেছেন, তেমনই থাকবে। বহু বছর পর হঠাৎ আজ স্বপ্ন দেখে ননীবালা একটু অবাকই হল। মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে ও বলল, "তুই কুথায় ছিলি আচুকি?"

চাঁপার চৌকিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছে আচুকি। বলল, 'তুর ইকটা ব্যওস্তা করে আলাম।"

"কী কইর‍্যা আইলি?"

"গরমিন্ট থিকে বিধওবাদের পেনছন দিবে। তুর নাম লিখিয়ে আলাম।"

ননীবালা বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। এর আগেও কে যেন পেনশনের কথা বলেছিল একবার। ও জিজ্ঞেস করল, "পেনছন দিব ক্যান।"

"আতো পুছতাছ করিস না তো।" আচুকি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, "মীরা সেওবা কেন্দে নাম লিখাচ্ছিল বুড়ি বিধওবাদের। তুর উমর জানতে চাইল। হামি পচপান লিখে দিইচি। পরে যেনো কম বলিস না।"

"আমার তো পচপান হয় নাই। পঞ্চাশেরও তিন বছর কম।"

"আরে বুড়বক, তুকে কে সত্তবাদী যুধিষ্ঠির হইতে কইল? পচপান না হইলে পেনশন দিবে না। হর মাহিনা টাইশো টাকা। ছাড়বি কেনো?"

"তুই নাম লিখাস নাই?"

"না, হামি লিব না। শুন, গোঁসাই ঠাকুরের সাথে তুর দেখা হইয়েছিল?"

" না, গোঁসাইরে দুর থেইক্যা দেখসি।"

"হামি এসে দেকি গোঁসাই খুসমেজাজে আচে।"

"কোহানে গেসিল গোঁসাই?"

"মাল কামাইতে। তুদের দেশে উর বহুত পার্টি আচে। উখানে ভাগবত পাঠ করতে যায়। গোঁসাই, আরও চারজন। গানা উনা করে। উখান থেকে টাকা লিয়ে আসে। ইখানকার খরচ চালায়।"

"তুই এহানে আইলি কী কইর‍্যা আচুকি?"

"গোঁসাই হামাকে ডেকে লিয়ে এল। আশ্রমে কুন বিধওবা আসচিল না। তখুন হামাকে গিয়ে ধরল। হামি বললাম, গোঁসাই তুর খুব বদনাম আচে। মাইয়াদের লিয়ে বুড়া কাম করিস। তুর উখানে কেউ যাবে না।"

"তুই মুখের উপর কইলি?" ননীবালা জিজ্ঞেস করে।

"হা। হামি কাকে ডর করি না কি? তো তখুন গোঁসাই কইল, বুড়ি মাইয়িদের লিয়ে এসো। তখুন রাজি হলাম।"

"প্রথমে কয়জন আইসিল?" "কুড়ি বাইশ জন। আখুনও হামি মাঝে মাঝে লিয়ে আসি। এই যেমুন তুকে লিয়ে আলাম। গোঁসাই বুড়া আদমি না। ইখানে থাকলে বুঝতে পারবি। এট্টু বাদে গোঁসাই পাঠ করতে বসবে। যা, মুখে পানি দিয়ে আয়। তুর চোখে নিদ লেগে রয়েচে।"

চৌকি থেকে নেমে এল ননীবালা। গরমে পিঠ, ঘাড়, গলা ভিজে গেছে। কলতলায় এসে কল খুলে ও জলের তলায় মাথা পেতে দিল। ঠাণ্ডা জলের ধারা নেমে আসছে। ঘাড়ের পিছনটা ওর শিরশির করে উঠল। এখন ওর কদম ছাঁট চুল। ভেজালেও শুকোতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। শৃঙ্গার বটে এই সময়টার এই রকম আয়েস করে জল খরচ করার কথা ও ভাবতেই পারত না। ওখানে খুব কষ্ট করে দিন কাটাতে হত।

ঘরে ফিরে ননীবালা দেখল আচুকি নীচে নেমে গেছে। ওর পায়ে যেন ঘোড়ার খুর লাগানো আছে। কোথাও এক মিনিট বসে থাকতে পারে না। আঁচল দিয়ে মুখ মোছার সময় ঘাড়ের কাছে কার স্পর্শ পেয়ে ননীবালা চমকে উঠল। পিছন ফিরতেই ও দেখল, পুরু চশমাওয়ালি, 'অ দিদি, থানের অর্ধেকটা আমায় দাও না গো। রাধামাধব তোমার মঙ্গল করবেন।"

ঘাড়ে হাত দেওয়ার জন্য দপ করে রাগ হয়ে গেছিল ননীবালার। ও বেশ কড়াভাবে বলল, "না দিমু না। নীচে যাইব্যা, না জয়ারে ডাকুম?"

ধমক খেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল চশমাওয়ালি। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ননীবালার। ইস, এমন ভাবে না বললেও ও পারত। মানুষটা যা চাইছে, তা দেওয়া সম্ভব না। ননীবালার নিজেরই পরনে দুটোর বেশি থান নেই। অর্ধেকটা দেবে কী করে? আসলে ওর রাগটা থান চাওয়ার জন্য হয়নি। হয়েছে ঘাড়ে হাত দেওয়ার জন্য। কেউ ঘাড়ে হাত দিলেই ভয়ঙ্কর একটা রাত্তিরের কথা মনে পড়ে যায় ওর।

তখন ওর ভরা যৌবন। সেবাকুঞ্জের পাঁচ ছয়জনের সঙ্গে পাঠ শুনতে গেছিল গোবিন্দর মন্দিরে। সেদিন ভরা পূর্ণিমা। ননীবালা বসেছিল

একেবারে এক কোণে একটা থামের আড়ালে। ঠেসান দিয়ে ঠাকুরের নাম শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠে দেখে মন্দিরে কেউ নেই। সঙ্গীসাথীরা ওকে না পেয়ে চলে গেছে। বিরাট মন্দির। ভয়ে ভয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ও দ্বিধাগ্রস্থ, একা একা সেবাকুঞ্জে যেতে পারবে কী না। তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, না যাবে না। আর তো মাত্র দু'তিন ঘণ্টা। ভোরের আলো ফুটে গেলেই লোক চলাচল শুরু হয়ে যাবে। তখন ফিরে যাবে। অবসন্ন দেহে সিঁড়িরই এক কোণে ও ফের শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎই ঘাড়ের কাছে কার স্পর্শ। প্রবল আতঙ্কে উঠে বসে ননীবালা দেখে বলিষ্ঠ একজন পুরুষ। চাঁদের আলোয় এইবার লোকটাতে চিনতে পারল ও। সিঁড়ির নীচে সার সার দোকান আছে। তারই এক দোকানি। গোবিন্দর মন্দিরে সকাল বিকাল দুবেলাই আসে ননীবালা। লক্ষ্য করত, রোজই লোকটা হা করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চাউনির মধ্যে লালসা নেই। রয়েছে মুগ্ধতা। লোকটা কিন্তু কোনওদিন কোনওরকম অভদ্রতা করেনি।

এত রাতে লোকটা এখানে কী করছে? দোকানেই শুয়ে থাকে নাকি? লোকটা জানলই বা কী করে ও এখানে রয়ে গেছে? এক গাদা প্রশ্ন মনে ভিড় করে এসেছিল। তখনই লোকটা বলল, "আমার নাম বনোয়ারীলাল। আমি বাঙালি ব্রাহ্মণ। তুমি এত রাতে এখানে কী করছ?"

ভয়ার্ত চোখে ননীবালা শুধু তাকিয়েছিল। লোকটার মনে কী মতলব আছে কে জানে? নির্জন মন্দির। চেঁচিয়ে ডাকলেও কেউ ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। ছুটে পালিয়ে যাবে, শরীরে এমন ক্ষমতাও এর নেই। ননীবালা বলেছিল, এহান থেইক্যা তুমি চইল্যা যাও।"

কথাটা কী ভাবে বলেছিল, ননীবালার তা মনে পড়ে না। কিন্তু সামান্য ওই ক'টা কথাতেই সে দিন ভয় পেয়ে গেছিল বনোয়ারীলাল। বলেছিল, "আচ্ছা আচ্ছা। আমি চলে যাচ্ছি। দোকানে আছি। দরকার হলে আমাকে ডেকো।

ঘটনাটা বললে এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটাই ঘটেছিল। ননীবালার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন ওকে রক্ষা করেছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ। না হলে ওই রকম একটা পুরুষ, থাবা গুটিয়ে চলে যায় কখনও? বনোয়ারীলাল লোকটার সম্পর্কে ওর ভুল অবশ্য পরে ভেঙে গিয়েছিল। সে অন্য এক কাহিনী। বৃন্দাবনে ও আরও একবার বিপদে পড়েছিল। সেটা এমন একটা ঘটনা, যা ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। না, সেই ঘটনাটার কথা ননীবালা মনে করতে চায় না। চোখের জল মুছতে মুছতে সেদিন রাধাকুঞ্জ থেকে ও বেরিয়ে এসেছিল। জীবনে একবারই ও কাউকে অভিশাপ দিয়েছিল।

মনে পড়ছে আজ সব মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই ঘটনটা যাতে ফের ওর মনে জ্বালা না ধরায়, সে জন্য ও জপের মালা নিয়ে রাধামাধব মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর। ননীবালা জপ করতে লাগল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে...।

স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। সকালের দিকটায় ইদানীং তাই সময় পাচ্ছেন বিমলা। স্কুল থাকলে সকালে রান্নার কাজটা চালিয়ে নেয় গীতা। সুধাময়ের তাড়া থাকে লাইব্রেরিতে যাওয়ার। ভাল মন্দ রান্না করে স্বামীকে খাওয়ানোর সুযোগ সাধারণত পান না বিমলা। আজ চট করে রান্না সেরে তিনি জিরিয়ে নিচ্ছেন কুলারের সামনে বসে। বাথরুম থেকে বেরিয়েই সুধাময় খেতে চাইবেন। তারপর ঠিক দশটার মধ্যে রওনা হবেন রিসার্চ ইন্সটিটিউটের দিকে।

সুধাময় একটু আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। নিজের জগত নিয়েই ব্যস্ত। বৃন্দাবন নিয়ে গবেষণায়। এই বাষট্টি বছর বয়সেও উনি খুব কর্মঠ। বৃন্দাবনে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো মন্দির। কোন মন্দিরে সঙ্গে কোন ইতিহাস জড়িত, সুধাময় গড়গড় করে তা বলে যেতে পারেন। সপ্তাহে ছ'টা দিন পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও রবিবার বাড়িতে আড্ডা বসান সুধাময়। আসেন বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়, কলেজের প্রফেসর। আসেন গোপাল দেমুন্দি। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে প্রচুর লেখালিখি করে খুব নাম করেছেন। আসেন ফণীলাল দ্বিবেদি। আরেক জন পণ্ডিত মানুষ। আড্ডায় বিমলাও বসে পড়েন। এঁদের মুখ থেকে অনেক নতুন তথ্য জেনে অবাক হয়ে যান।

যেমন এই ক'দিন আগে আড্ডায় সুধাময় বলছিলেন, "লেখক শরৎচন্দ্র একবার বৃন্দাবনে এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছিলেন। সেটা চরিত্রহীন উপন্যাসটা লেখার আগে। আমরা সবাই জানতুম, উনি স্বাস্থ্যের কারণে এসেছিলেন। তা কিন্তু নয়। শরৎচন্দ্র এসেছিলেন উপন্যাসের রসদ জোগাড় করতে।"

হরিদ্বারে জন্ম আর পড়াশুনা বিমলার। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী প্রথমে হিন্দিভাষায় পড়ার সুযোগ পান। একটু বড় হওয়ার পর কলকাতা থেকে এক সেট বাংলা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাসতুতো বোন শীলা। বিমলার প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন হলেন শরৎচন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের চরিত্রগুলো তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি নিছকই একজন লেখন নন, সমাজ সংস্কারকও। আড্ডায় কৌতূহল থেকে বিমলা প্রশ্ন করেছিলেন, "বৃন্দাবনে শরৎচন্দ্র ঠিক কোথায় ছিলেন?"

"রামকৃষ্ণ মঠে। বাংলায় ফিরে যাওয়ার পর মঠের অধ্যক্ষকে শরৎচন্দ্র একটা চিঠি লেখেন। সেই চিঠি এতদিনে উদ্ধার হয়েছে। মঠের অধ্যক্ষের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমরা তা আমাদের আর্কাইভে রেখেদিলাম।"

বৃন্দাবনের যা কিছু পুরনো, তার সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ সুধাময়ের। এই আজ সকালে কাকে যেন ফোনে বলছিলেন, একটা প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন। বাড়ি থেকে সরাসরি সেখানে যাবেন। সেজন্য সকাল থেকে উনি একটু তাড়াহুড়োও করছেন। বাথরুমে দরজা খোলার শব্দ পেলেন বিমলা। তার মানে আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ডাইনিং টেবলে এসে বসে পড়বেন সুধাময়। কুলারের সামনে থেকে উঠে তিনি তাড়াতাড়ি খাবার সাজাতে লাগলেন।

খাওয়া মানে, ভাত, আলুভাজা, ঘি, ডাল আর একটা তরকারি। সাজানোর আগেই চেয়ারে এসে বসে পড়লেন সুধাময়। তারপর বললেন, "তোমার লোকজনদের তো আজ চোখে পড়ছে না?"

লোকজন বলতে বাঙালি বিধবারা। ভজনাশ্রম থেকে ফেরার সময় ওরা অনেকেই এসে সুখ দুঃখের কথা বলে যায়। আশ্চর্য, আজ কিন্তু একজনও আসেনি। এমনটা কখনও হয় না। সুধাময় ঠিক লক্ষ্য করেছেন। বিমলা বললেন, "আসবে। বোধহয় কোথাও কিছু বিলি হচ্ছে। তাই দাঁড়িয়ে গেছে।"

খেতে খেতে সুধাময় বললেন, "কলকাতা থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। আজ সকালে খবর পেলাম। শুনেছি, ওঁর পজেশনে কিছু প্রাচীন পুঁথি আছে। সেটা দেখার জন্য যাচ্ছি।"

"কোথায় সেটায়?"

রাধাকুঞ্জ বলে একটা বাড়িতে। আগে নাম ছিল সিংহিবাড়ি। তখন মালিক ছিলেন জগদীপ প্রসাধ সিংহ। বিরাট ধনী। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের যে ক'জন রসদদার ছিলেন, ইনি তাঁদের একজন। তবে এঁর নাম তেমন কেউ জানেন না। জগদীশ প্রসাদ এখানে একটা মন্দির স্থাপন করেছেন। ওঁদের বংশধরেরা ইদানীং কেউ আসতেন না। শুনলাম, এখন যিনি মালকিন, তিনি মেয়েকে নিয়ে কাল এখানে এসেছেন। ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে যাব।"

"পুঁথিটা যে আছে, তা তোমরা জানলে কী করে?"

"সেবাইতের কাছ থেকে। মন্দিরের পুরনো সিন্দুকে নাকি আছে। পঞ্চম দোলের সময় ওই সিন্দুক খুলে ঠাকুরের গয়না বের করতে গিয়ে নাকি দেখেছে।"

"ভদ্রমহিলা পুঁথিগুলো দেবেন?"

"চেষ্টা করে দেখি। তেমন হলে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। ওগুলো যদি দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে, তা হলে বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। সাহেবরা বসে আছে কিনে নেওয়ার জন্য। এই বৃন্দাবন থেকে কম পুঁথি পাচার হয়ে গেল?"

সুধাময় মন দিয়ে খেতে লাগলেন। বিমলা অন্য লোকের মুখে শুনেছেন, সুধাময় গত তিরিশ বছর অনেক পরিশ্রম করে রিসার্চ ইন্সটিটিউটে একটা অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করেছেন। হাতে লেখা পুঁথিই আছে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো। ছাপা বই হাজার নয়েক। বেদ বেদান্ত থেকে শুরু করে উপনিষদ, ষটসন্দর্ভ, জ্যোতিষ শাস্ত্র— কী নেই তাতে? একবার দিনাজপুরের মহারাজার মন্দির থেকে সুধাময় উদ্ধার করেছিলেন বরাহ পুরাণোত্তর মথুরা মাহাত্ম্য নামে প্রাচীন এক পুঁথি। সংস্কৃতে লেখা। সে দিন কী খুশি সুধাময়!

চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। চিবুকে চর্বি। চোখের কোণে সাদা দাগ। স্বামীকে খুটিয়ে অনেকদিন দেখছেন বিমলা। তার মানে কোলেস্টোরেলটা বেড়েছে সুধাময়ের। চশমা পরে থাকেন বলে দাগটা দেখা যায় না। একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। স্বামীর প্রতি তেমন নজর দিতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে অপরাধবোধে ভোগেন বিমলা। একমাত্র ছেলে থাকে দিল্লিতে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। সংসারে

কোনও চাপ নেই। এই সময়টা অন্তত সুধাময়ের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত।

সুধাময় অবশ্য খুব উদার মনের মানুষ। কোনও কাজে কোনওদিন বিমলাকে বাধা দেননি। বছর কুড়ি আগে বিমলা যখন স্কুল গড়ার উদ্যোগ নেন, তখন স্বামীর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছিলেন। কম ঝামেলা পোহাতে হয়েছে স্কুলটা নিয়ে? প্রথমে বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্কুলটা চালু করেছিলেন। যেই স্কুলটা দাঁড়িয়ে গেল, অমনি বাড়িওয়ালি চাপ দিতে লাগলেন ভাড়া বাড়ানোর জন্য। এ নিয়ে লিটিগেশন। কোর্ট থেকে বাড়িওয়ালি উচ্ছেদের অর্ডার নিয়ে এলেন। বিমলা সে দিন ছাত্রদের রাস্তায় বসিয়ে ক্লাস করালেন। কী দিন গেছে সে সব! পরে বাড়িওয়ালি অবশ্য নরম হয়ে সমঝোতা করে নেন।

সুধাময় এমনিতে স্বল্পাহারী। খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। ওর ইলটিটিউট আধ কিলোমিটারের মধ্যে। তপন বলে একজন রিকশাওয়ালাকে ঠিক করে দিয়েছেন বিমলা। সে রোজ এসে সুধাময়কে নিয়ে যায়। ছেলেটা এসে গেছে। বার কয়েক হর্ন দিয়ে জানান দিয়েছে। সুধাময়কে এগিয়ে দেওয়ার জন্য লোহার ফটক পর্যন্ত এসে বিমলা দেখলেন, না তপন নয়। রিকশা নিয়ে অন্য একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু দিন ধরে তপন কামাই করছে। নিজে না এসে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বিমলা জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যা রে তপন আসেনি?"

ছেলেটা বলল, "না মাইয়ি। দাদা অস্পাতালে গেছে। কলোনিতে কাইল মাইরপিট হইসে খুব। বউদির মাথা ফাটসে।"

তপন থাকে গোপী নগর কলোনিতে। গরীব লোকদের বাস। রোজ কোনও না কোনও কারণে ওখানে মারপিট লেগে থাকে। বউদি মানে তপনের বউ দীপালি। খুব জঙ্গি ধরনের মেয়ে। বাঙালিদের উপর কোনও অন্যায় অবিচার দেখলে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগে এ বাড়িতে খুব আসত। নানা ব্যাপারে পরামর্শ নিত। ইদানীং নিজে লিডার হয়ে গেছে। আর আসে না। দীপালির মাথা ফাটা বা তপনের অস্পাতালে যাওয়া, এ সব শেখানো কথা। ছেলেটাকে বলতে বলা হয়েছে। বিমলা সব জানেন। তাই আর কথা বাড়ালেন না। সুধাময়কে রিকশায় তুলে দিয়ে ফিরে এলেন। হাতে এখন অনেক সময়। মন দিয়ে আজ পুজো করবেন। ঠাকুরকে মাখন-মিছরি দেবেন।

...বেলা দুটোর সময় পুজো সেরে উঠে বিমলা যখন খেতে বসবেন, তখনই সুষমা গৌতমের ফোনটা এল। "দিদি, নবনীড়ের একটা মিটিং আছে বিকেল বেলায়। আসতে পারবেন?"

শুনে একটু বিরক্তই হলেন বিমলা। বললেন, "মিটিং যে হবে, সেটা তোমরা কখন ঠিক করলে সুষমা? একটু আগে জানানো যায় না? আমার তো অন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে। তাই না?"

সুষমা এখন এ রকমই হয়ে গেছে। আগে নবনীড়ের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং থাকলে দু তিন দিন আগে পিওন দিয়ে চিঠি পাঠাত। এখন ফোন ডেকে নেয়। আসলে ও চায় না বিমলার মতো মেম্বাররা মিটিংয়ে যান। গেলেই ভুল ত্রুটি নিয়ে নানা কথা তোলেন। সুষমা বা ওর দলের লোকেদের সেটা পছন্দ হয় না।

"দোষ নেবেন না দিদি। দিল্লি থেকে সোহিনী গিরি আসছেন আজ দুপুরে। সকালেই কনফার্ম করলেন। উনি আসতে পারবেন কী না সেটা পাকা জানতাম না। তাই আগে সবাইকে জানাতে পারিনি। কেন, বিকালের দিকে কী আপনার আজ অসুবিধে আছে?"

"একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তবে সেটা ক্যানসেল করা যেতে পারে। সোহিনীর সঙ্গে আমি আলাদা কিছু কথা বলতে চাই।"

সুষমার গলা আরও খাদে, "একটা কথা বলব দিদি, আমাদের মধ্যে যা কিছু ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন থাকুক না কেন, প্লিজ এখন ওর কানে কিছু তুলবেন না। নবনীড়ের জন্য উনি বড় একটা গ্রান্ট নিয়ে আসছেন। সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

লাইনে এসো। বিমলা মনে মনে বললেন, "কত গ্রান্ট?"

"প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো হবে। সেন্ট্রাল গভমেন্ট স্যাংশন করেছে।"

"বাহ, বেশ ভাল। তা টাকাটা নিয়ে কী করবে ঠিক করেছ?"

"সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যই তো আজ সবাইকে ডেকেছি। আপনি এসে সাজেসন দিন। নবনীড়ের নিজস্ব একটা বাড়ি করা দরকার। ভাড়া বাড়িতে উইডোদের রাখা ঠিক হচ্ছে না।"

"বাড়ি করার জন্য তুমি জায়গা কোথায় পাবে সুষমা?"

"মনে হয় জোগাড় হয়ে যাবে। মথুরা-বৃন্দাবন রোডের দিকে।"

ওহ, তা হলে প্ল্যান করা হয়ে গেছে। জ্ঞানগুদড়ি থেকে আশ্রমটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির কাছে তোলার। কে জানে, জমিটা ওর নিজেরই কী না! এই ফাঁকে ভাল দাম নিয়ে নেবে। সুষমা চালাক নয়, ধূর্ত প্রকৃতির মেয়ে। ও অনেক কিছু করতে পারে। নবনীড় নিয়ে ওকে ধান্ধাবাজি করতে দেবেন না বলেই বিমলা একটু প্রতিবাদ ছুঁইয়ে রাখলেন, "বিধবারা কি অতদূর যেতে চাইবে সুষমা? আমার মনে হয় না। ওরা বৃন্দাবনের মধ্যে থাকাটাই বেশি পছন্দ করে।"

সুষমা কথাটা শুনে ক্ষুণ্ণ হয়, "ওদের পছন্দ মতো সব আবদার কি আমাদের পক্ষে মেটানো সম্ভব দিদি?"

"ফ্যাক্ট রিমেইন্স, ওদের না হলে আবার তোমার চলবেও না। ওয়েল ফেয়ারের নাম করে তুমি ওদের কয়েদ করেও রাখতে পার না। তাই না?"

তবুও সুষমা চটল না। শুষ্ক গলায় বলল, "ঠিক আছে বিকেলে আসুন, তখন ডিটেল কথা বলা যাবে।"

ফোন ছেড়ে, ডাইনিং টেবলে বসে খাওয়াতেও মন দিতে পারলেন না বিমলা। দেড় কোটি টাকার অনুদান আসছে। সুষমা সব নয়ছয় করে দেবে। ওর বিরুদ্ধে নানা কথা এসে বলছে বিধবারা। বদনাম করছে। বাইরে থেকে ডোনেশন এলে ও কাউকে জানায় না। কেউ কোনও জিনিস দিলে তা বিধবাদের হাতে পৌঁছয় না। কয়েকদিন আগে রামকৃষ্ণ পতোদিয়া বলে এক ভদ্রলোক নবনীড়ের জন্য ষাট খানা কম্বল পাঠিয়েছিলেন। বিমলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই কম্বল সবাইকে দিয়ে এসেছেন। নবনীড়ের কেয়ারটেকার মেয়েটা মৃদু আপত্তি করছিল তখন। বিমলা শোনেননি। তিনি মনে করেন, যাদের জন্য জিনিস, সেটা সরাসরি তাদের কাছে যাওয়া উচিত।

খেতে খেতে বারবার দেড় কোটি টাকার কথা মনে হচ্ছে বিমলার। দশ বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে গিয়েই কালঘাম ছুটে যায়। আর সেখানে অত টাকা নিয়ে আসছে সুষমা! না, মেয়েটার এলেম আছে। হয়তো দশ বার দিল্লিতে গেছে। এইচ আর ডি থেকে গ্রান্ট বের করা চাট্টিখানি কথা! কত লোককে ঘুষ খাওয়াতে হয়। বিমলা শুনেছেন, অনেক এন জি ও-র মেয়েরা দরকার হলে শুয়েও পড়ে ওদের সঙ্গে। আসল কথা হল যোগাযোগ। তেমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ। তেমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে, সমাজ সেবার কাজ কম করেও বেশি টাকার সরকারি অনুদান পাওয়া সম্ভব। এই যোগাযোগটাই বিমলার নেই। তাই সুষমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না। বয়সটা কুড়ি বছর কম হলে, তাও চেষ্টা করতেন।

খাওয়া শেষ করে কুলারের সামনে এসে বসলেন বিমলা। দেড় কোটি টাকা যদি তিনি নিজে পেতেন তা হলে কী করতেন? বৃন্দাবনে বিধবার সংখ্যা প্রায় হাজার দুয়েকের মতো। এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও আর কী করা সম্ভব? নবনীড়ে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জনের মতো বিধবা আছে। তাদের দিয়ে কোনও কাজই করানো হয় না। অথচ করানো সম্ভব। আসল কথা হল, ওদের সত্যিকারের রিহ্যাবিলিটেশন। এমন কিছু বিধবাকে নিতে হবে, যাদের দিয়ে কিছু কাজ করানো যায়। রোজগার করানো যায়।

নিজের উদ্যোগে বিমলা এর আগে কয়েক জনের কাজের সংস্থান করে দিয়েছেন। খুবই সামান্য সেটা। তবু ওদের মধ্যে পাঁচ সাত জন, মন্দিরের সামনে ভিক্ষে না করে এখন খেটে খাচ্ছে। যেমন গীতার মা। বিমলা ওকে একটা সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখানে দোকানে দোকানে জপ মালার প্রচুর থলি বিক্রি হয়। সেই থলি সেলাই করে গীতার মা দিনে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা রোজগার করে। দোকানদাররা কাপড় দিয়ে যায়। গীতার মা সেলাই করে দেয়। থলে পিছু কুড়ি পয়সা। কাজটা এমন কিছু শক্ত না। অথচ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা অবলম্বনও বটে।

এইভাবে অনেক কিছু করা যায়। ছোট খাটো হাতের কাজ। বেতের ঝুড়ি, ফুলদানি তৈরি, ছিট কাপড়ের নকশি কাটা আসন, কাঁথা। এখানে ময়ূরের পালক পাওয়া যায়। তা থেকে ঘর সাজানোর অনেক আইটেম তৈরি করা সম্ভব। একটু উদ্যোগ নিয়ে বিধবাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে, ওরা বাঁচবে। কাগজ কলম নিয়ে বসে ঝপটপ আইডিয়াগুলো লিখতে শুরু করলেন বিমলা। এখন পয়েন্টগুলো লিখে রাখছেন। পরে একটা প্রোজেক্টের মতো তৈরি করে দেবেন। আজ বিকেলেই নবনীড়ের মিটিংয়ে এই সব কথা তুলবেন বিমলা।

একটু গড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। ডিভানে এসে শুয়ে পড়লেন বিমলা। দেড় কোটি টাকার কথাটা মাথা থেকে নামছে না। ইস, কত কী করা যায় ওই টাকায়! শুয়ে শুয়ে হঠাৎই একটা চিন্তা উদয় হল মাথায়। বিধবাদের দিয়ে কাজ করানোর কথা ভাবছেন বটে, কিন্তু ওরা চাইবে? কাজের ইচ্ছেই অনেকের চলে গেছে। সেই সঙ্গে জীবন সম্পর্কে আগ্রহ। সমস্যাটা এদের নিয়েই হবে। কেউ কাজ করবে। কেউ করবে না। এ নিয়ে ঝগড়া শুরু হবে। বহুদিন ধরে বিধবাদের নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন বিমলা। তিনি জানেন কী সমস্যা হতে পারে। হয়তো এই সব সমস্যার কথা তুলে মিটিংয়ে সুষমারাই পুরো প্রোজেক্ট বানচাল করে দেবে। তা হলে উপায়টা কী?

চোখের সামনে সব হিজিবিজ। কী হবে অন্য লোকের কথা এত ভেবে? এই যে তপন আর ওর বউ দীপালি। একটা সময় বিমলা ওদের কম সাহায্য করেছেন? মাস খানেক আগে মথুরায় কালেক্টরেটে গেছেন নবনীড়েরই আরেক এক্সিকিউটিভ মেম্বার সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। গিয়ে দেখেন, লোকজন নিয়ে গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে দীপালি। যা তা বলে যাচ্ছে ডি এমের বিরুদ্ধে। চৌকিতে বসা দু'তিন জনকে চিনতে পারলেন বিমলা। বামপন্থী দলের নেতা। তখনই বুঝতে পারলেন, দীপালি কাদের পাল্লায় পড়েছে। বিক্ষোভটা কেন, তা জানার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। ওদের দাবিও শুনলেন বিধবাদের রেশন কার্ড দিতে হবে। বোকার মতো সব কথাবার্তা।

দেখতে পেয়ে দীপালি দৌড়ে এসে বলেছিল, "মাইয়ি মাইকে আপনে কিছু কন্ন।" তা, বিমলা তখন সরাসরি না করে দেন। সমাজ সেবা করতে নেমে, তিনি ঠিক করে রেখেছেন, কোনও দিন কোনও রাজনৈতিক পার্টির ব্যানারে যাবেন না। তাতে কিছু হোক না হোক। ওই দিনের পর থেকেই দীপালি এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। তপনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন বিমলা। আগের মতো আর সম্মান দেয় না। অন্য রিকশাওয়ালাদের মুখে সে দিন শুনলেন, তপন ব্যবসায় নেমেছে। ও পয়সা পেল কোথায়?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল, এমন সময় গীতা এসে ডাকল, "মামি, তোমার লালা এসেছে।"

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিমলা। বিকেল হয়ে গেল নাকি? বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, রাজা একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স। তার একটু বেশিও হতে পারে। এরা এমন সাজগোজ করে থাকে, বয়স বোঝা যায় না। এর কথাই রাজা ফোনে বলেছিল। তিনি ডাকলেন, "আয় লালা, তোর খবর কী বল।"

রাজা সামনে এসে পা ছুঁয়ে তারপর মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, "বড়িদিদি, এর নাম মিঠু। এ কিছু পুছতাছ করতে চায়।"

"এসো, ভেতরে এসো।" বলে বিমলা ভেতরে এনে বসালেন দু'জনকে। তারপর মিঠুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমার কাছ থেকে ঠিক কী জানতে চাও মা?"

"এখানে বাঙালি বিধবারা কী অবস্থায় আছেন।"

"তুমি জানতে চাইছ কেন?"

কলকাতায় আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে, উইমেন্স স্টাডি ফোরাম। বেশির ভাগই সোসিওলজির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়া। এখানকার বাঙালি বিধবাদের নিয়ে কাগজে নানা রকম রিপোর্ট বেরোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোধহয় এখানকার বিধবাদের জন্য কিছু করতে চান। মনে হয়, আমাদের স্টাডি ফোরামই দায়িত্ব পাবে পেপার তৈরি করার। মায়ের সঙ্গে বৃন্দাবন এলাম বলে আমি প্রিলিমিনারি সার্ভেটা করে রাখছি। পরে আমাদের আরও কয়েকজন আসবেন স্টাডি করার জন্য।'

চুপ করে সব শুনে বিমলা বললেন, "তুমি কী আর কারও সঙ্গে কথা বলেছ?"

"ইন ফ্যাক্ট, আজই রাজা হাসপাতালে এক বিধবার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিল। এই রকম স্যাম্পেল সার্ভে আমি আরও অনেক করতে চাই। দুপুরে রাজা নবনীড় বলে একটা আশ্রমে নিয়ে গেছিল। কিন্তু সেখানে ঢোকা গেল না। আমাদের আটকে দিল।"

কেন আটকে দিল কেন?"

এবার উত্তর দিল রাজা, "ওখানে গিয়ে আমরা দেখলাম, লোহার গেট বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর একজন দারোয়ান এসে বলল, পার্মিশন না আনলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। জিজ্ঞেস করলাম, কার কাছ থেকে পার্মিশন আনতে হবে। বলল, সুষমা গোয়েলের কাছ থেকে।"

মিঠু বলল, "এত লুকোচুরির কী আছে বলুন তো? বাইরে বেরিয়ে আমরা আশপাশের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। ওরা বলল, আগে বিধবারা বাইরে বেরত। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে যেত। দোকানে জিনিস কিনতে আসত। ওষুধ কিনতে বেরত। এখন নাকি কাউকেই বেরতে দেওয়া হয় না।"

শুনে বিমলা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু আগে, কয়েদ করে রাখার কথাটা তিনি না জেনেই বলে ফেলেছিলেন সুষমাকে। সত্যি সত্যিই তা হলে ওদের কয়েদ করে রাখা হয়েছে! এ চলতে দেওয়া যায় না। আজ বিকালেই মিটিংয়ে তুলতে হবে কথাটা। সুষমা ভেবেছেটা কী? সেক্রেটারি বলে যা ইচ্ছে তা করে যাবে? নিশ্চয়ই ওখানে কোনও কারচুপি হচ্ছে। তা না হলে এত গোপনীয়তা কিসের?

রাজা বলল, "বড়িদিদি, নবনীড়ে কি ইয়ং অ্যান্ড ম্যারেড উইমেনদের রাখা হয়?"

"না তো! কেন, দেখলি নাকি?"

"দারোয়ানটা যখন দরজা খুলল, তখন দেখলাম ভেতরে কয়েকজন ম্যারেড মহিলাও রয়েছেন। তখন সন্ধ্যারতি শেষ হল। সবাই উঠোনে বসেছিলেন।"

ওহ, তাহলে আরও অনেক নিয়ম ভাঙা হচ্ছে ওখানে। বিমলা মনে মনে চটলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। মিঠুকে বললেন, "তুমি কি নবনীড়ের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাও? চল, আমি এখনই নিয়ে যাচ্ছি।"

"তার আগে আপনি একটু আইডিয়া দিন বিধবাদের সম্পর্কে।"

সেই এক কথা বলতে ভাল লাগে না এখন বিমলার। উঠে গিয়ে আলমারি থেকে তিনি একটা ফাইল বের করে আনলেন। তারপর বললেন, "এই ফাইলটা তুমি নিয়ে যাও। সব ভাল করে পড়লেই বুঝতে পারবে। মোস্টলি ফ্যামিলি থেকে বিতাড়িত, প্রতারিত। সহায় সম্বলহীন। প্রতি বছরই এদের সংখ্যা বাড়ছে।"

"আপনি এদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন কবে থেকে?"

"দশ বারো বছর আগে। কী রে লালা? তখন অবশ্য তোরা স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছিস। একদিন কাগজে পড়লাম, একজন বাঙালি বিধবা রেপড হয়েছে। সেই কেসটা নিয়ে আন্দোলন শুরু করলাম। খবরের কাগজের লোকেরা খুব সাহায্য করেছিল। পুলিশ শেষ পর্যন্ত অ্যাকশন নিতে বাধ্য হল। দোষী লোকটা ধরা পড়ল। লোকটার সাত বছর জেল হয়েছিল। সেই থেকে শুরু।"

"তারপর কী হল?"

"বিধবারা আমার এখানে আসতে শুরু করল। আমি ভাল মতো জড়িয়ে গেলাম। মথুরায় তখন এক এস পি ছিলেন, আমাকে তিনি খুব সাহায্য করেছিলেন তখন। সেই সময় আমার টার্গেট ছিল, ইয়ং উইডোদের রক্ষা করা। আমি ওদের বললাম, তোমরা সাদা থান পরো কেন? এই কারণেই বিপদ ডেকে আনো। তার চেয়ে হালকা রঙের শাড়ি পরো। ঠাকুর তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। কিছু মেয়ে আমার কথা শুনে থান ছাড়ায় তখন খুব অসুবিধায় পড়েছিল।"

"কেন?"

"এখানকার বৈদিক সমাজ বলল, বিমলা বাসু মেয়েদের খারাপ করে দিচ্ছে। মুশকিল হল কী জানো, একটা মেয়ে যখন রেপড হচ্ছে, তখন কারও হুশ নেই। আর সামান্য থান ছাড়ার কথা বলতেই সমাজে গেল গেল রব। মেয়েরা আরও হেকেলড হতে লাগল। ভয়ে আমি বললাম, এই সমাজের কিচ্ছু হবে না। তোরা বাবা, থান পরে ঘোর।"

"এদের রিম্যারেজ করানোর কথা কখনও ভাবেননি?"

"তোমার মাথা খারাপ? কলকাতার মতো বড় বড় শহরে ও সব হয়। এখানে অসম্ভব। এখানে বিধবা মেয়েদের সেবাদাসী করে রাখবে। ধর্মের নামে সেক্সচুয়ালি এক্সপ্লয়েট করবে। তবুও রি-ম্যারেজ কখনও না। আমি একবার একটা বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিধবা মেয়েটাই রাজি হল না।"

"এখানে উইডোরা আপনাকে এত মানে কেন মিসেস বাসু? আজ হাসপাতালে শান্তিলতা মণ্ডল কিছুতেই আমার সঙ্গে কথা বলবে না। যখন রাজা আপনার নাম করল। তখন রাজি হল।"

শুনে বিমলা খুশি হয়ে বললেন, "মানে কী না জানি না। তবে অনেকেই আসে আমার কাছে। এই যে বলতে বলতে একজন এসে গেছে। ননীবালা এ থাকত শ্যামার বট বলে একটা জায়গায়। একে ঘর থেকে জোর করে তাড়াল। কী না, ভাড়া বাড়াও। অ্যানাদার কেস অফ এক্সপ্লয়টেশন।"

হাতে পুঁটলিটা চাতালে রেখে ননীবালা বলল, "মাইয়ি, চৌকিতে এট্টু জিরাইয়া লইমু? রাস্তায় অহন হাঁটন যায় না।"

ওর দিকে তাকিয়ে বিমলা বললেন, "কোথাও কিছু খেয়েছিস? না, খালি পেটে ঘুরে বেরাচ্ছিস।"

ননীবালা বলল, "আইজ একাদশী। অহন কিছু খামু না। বিহানে সুদাম কুঠিতে যামু। অরা আইজ লপসি দিবো। খাইয়া আশ্রমে চইল্যা যামু।"

ননীবালাকে লক্ষ্য করছিল মিঠু। বলল, "লপসি কী?"

বিমলা বললেন, "সিঙ্গারার চুন, ঘি আর গুড় ফুটিয়ে তৈরি হয় লপসি। সিঙ্গারার চুন মানে পানিফল চোকলার গুড়ো। লপসির টেস্ট খুব ভাল। আজ সুদামা কুঠিতে ভাণ্ডারা হবে। বোধহয় এরা খবর পেয়ে গেছে। লপসি আর ফল খেতে পাবে।"

"ওরা বিনা পয়সায় খাওয়ায়।"

"হ্যাঁ। এত মন্দির, ধর্মশালা, এত পুণ্য করার ঝোঁক যে, এখানে বিধবাদের খাওয়ার কোনও খরচাই লাগে না। এই যে একটু আগে সুদাম

কুঠির কথা বললাম, রোজই ওখানে পঙ্গত। মানে, দরিদ্রভোজন। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না, এখনও এই বাজারে চার হাজার করে লোক রোজ বিনে পয়সায় খায়।"

মিঠু বলল, "এই সিস্টেমটাই তো খারাপ। এটা তুলে দেওয়া উচিত।"

"খারাপই তো। খাওয়ার খরচা নেই বলে, বৃন্দাবন থেকে বিধবারা কেউ যেতে চায় না। আর দান-খয়রাত, দরিদ্রভোজন সিস্টেম তুমি তুলতেও পারবে না। এখানে ধর্মশালা বা ট্রাস্টগুলোতে বিজনেসম্যানরা এক লাখ টাকা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকার রিসিট পেয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে চার লাখ টাকা হোয়াইট করে নিচ্ছে। এই ভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। ওরা গরীবদের এমনি এমনি খাওয়াচ্ছে, মনে করার কোনও কারণ নেই।"

মিঠু বলল, "হ্যাঁ আমারও সে রকম সন্দেহ হচ্ছিল।"

ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল চারটার। বিমলাকে একটু উসখুস করতে দেখে রাজা বলল, "বড়িদিদি, আপনি কি কোথাও যাবেন?"

"হ্যারে, নবনীড়ের একটা মিটিং আছে। যেতে হবে সেই মথুরা।"

"তাহলে আমরা উঠি।" বলেই মিঠুকে নিয়ে উঠে পড়ল রাজা।

বিমলা বললেন, "কাল আসিস। কয়েকজনকে ডেকে পাঠাব। আজ একাদশী। তাই অনেকে আসেনি। প্লিজ মিঠু, কিছু মনে কোরো না।"

লালা আর মিঠু চলে যাওয়ার পর বিমলা যখন মিটিংয়ের জন্য বেরোচ্ছেন, সেই সময় ফোন এল সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গলায় উদ্বেগ, "দিদি আপনি কি আজ মিটিংয়ে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, এই বেরোচ্ছি।"

"না, যাবেন না। আজ মিটিংয়ে সবাই মিলে আপনাকে হেকেল করবে।"

বিমলা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "কারণ?"

"আপনার সেই কম্বল বিতরণ নিয়ে অসন্তোষ।"

"কিন্তু কী অন্যায়টা করেছি আমি?"

"দিদি কয় পিস কম্বল এসেছিল সেদিন?"

"ষাট পিস।"

সুষমা সবাইকে বলেছে, "একশো পিস। বাকিটা নাকি আপনি ঝেড়ে দিয়েছেন।"

মিথ্যে কথা। তবুও প্রতিবাদ করতে ভুলে গেলেন বিমলা। এতদিন ধরে সমাজসেবা করার পর তাঁকে চোর বদনাম নিতে হবে?

দুপুরে দোকানে দাঁড়িয়ে হিসাব কষছিল রাজা। এমন সময় এল স্টেফানি ওরফে নির্মলা। পরনে গেরুয়া শাড়ি, ব্লাউজ। নেড়া মাথা। ফর্সা গোল মুখ। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সাদা চামড়ার মেয়েরা যা-ই পরুক না কেন, বেশ মানিয়ে যায়। রোদ্দুরে হেঁটে এসেছে বলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে রেখেছিল স্টেফানি। দোকানে ঢুকে ঘোমটা সরিয়ে ও একটু অভিমানের সুরেই বলল, "তুমি কোথায় ছিলে রাজা? তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেরাচ্ছি। তোমার সিস্টার ইন ল কিছু বলেনি?"

স্টেফানির নেড়া মাথার পিছন দিকে একটু টিকির মতো দেখে হাসি পাচ্ছে রাজার। এরা কী ধরনের মানুষ রাজা বুঝতে পারে না। আরে বাবা, তোদের জেসাস ক্রাইস্ট আছেন। তাকে নিয়ে থাক না বাবা। কেন লর্ড কৃষ্ণের জন্য এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি গরমে বৃন্দাবনে পচঁতে এসেছিস। আমরাও বছরে একটা দিন যীশু খৃস্টকে মানি। বড়দিনে কেক খাওয়ার জন্য। তাই বলে ভ্যাটিক্যান সিটিতে দশ পনেরো ডিগ্রি ঠাণ্ডায় কখনও কৃচ্ছ সাধন করতে যাব? হারগিজ না।

স্টেফানি উত্তরের আশায় মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাজা বলল, "আর বোলো না। কয়েকজন ট্যুরিস্টকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।"

স্টেফানি ফের অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, "রাস্তার উল্টো দিকেই আমার গেস্ট হাউস। একবার তো আসতেও পারতে। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। আসলে বলো, তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ।"

কাউন্টারের অন্য দিকে লাডলা মূর্তি দেখাচ্ছে এক দল কাস্টমারকে। একজন সাদা চামড়ার মেয়েকে রাজার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে দেখে কাস্টমাররা হা করে এদিকে তাকিয়ে আছে। বিদেশিরা কেনাকেটা করতে এলে দোকানের ইজ্জত বাড়ে। সুযোগটা রাজা ছাড়ল না। বলল, "বিশ্বাস করো। এ ক'দিন একদম সময় পাইনি। তা তুমি কেমন আছ, বলো।"

"প্রভু আবার টানলেন, তাই চলে এলাম। একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি জানো। দেশে আর ফিরব না।"

এর আগেও স্টেফানি একবার এ কথা বলেছে। কিন্তু টাকার টান পড়লেই ফিরে গেছে আমেরিকায়। কথাটা পাত্তা না দিয়ে রাজা বলল, "এ বার একা এসেছ, না কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ।"

"না, একাই। এ বার একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। আমাদের অর্গানাইজেশন নতুন একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে। ফুড ফর লাইফ। আমি বৃন্দাবনের দায়িত্ব নিয়েছি।"

"ফুড ফর লাইফ প্রোগ্রামটা কী স্টেফানি?"

"রাজা, তুমি আমাকে ক্রিশ্চান নামে ডাকবে না। ওই নামটা আমি পিছনে ফেলে এসেছি। এখন আমি নির্মলা। নির্মলা দাসী। আর কখনও ভুল কোরো না যেন।"

রাজার খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু ও হাসতে পারছে না। দোকানের কাস্টমারগুলো এখনও যায়নি। ও বলল, "সরি নির্মলা। আর কখনও আমার ভুল হবে না। কিন্তু তোমাদের প্রোগ্রামটা কী তা তো বললে না?"

"বেসিকালি পুওর ফিডিং। গরীব লোকদের ভোজন করাতে হবে।"

শুনে একটু হতাশই হল রাজা। না, কামাই করার কোনও সুযোগ নেই। তবু প্রশ্ন করতে হয় বলে করল, "কতদিন তোমাদের এই প্রোগ্রাম চলবে?"

"হোল ইয়ার।"

তাহলে মারোয়াড়িদের সঙ্গে পাল্লা দিতে নামল সাহেবরাও। ওরাও বুঝে গেছে, গরীবদের দেশ। খালি ধর্মের কথা শোনালে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত লোকেরা আসবে না। প্রভু কৃষ্ণের নাম প্রচার করতে হলে ওদের খাওয়ানোও দরকার। ওরা যা খুশি তা করুক। নির্মলাকে এ বার কাটিয়ে দিতে হবে। কেননা এখনই মিঠুর আসার কথা। রাজা কায়দা করে বলল, "তোমার সঙ্গে তাহলে এ বার রোজই দেখা হবে, কী বলো?"

স্টেফানি কী বুঝল কে জানে? খুব গম্ভীর ভাবে বলল, "রাজা তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথাটা আন্দাজ করে রাজা প্রমাদ গুণল। স্টেফানির কথা তো একটাই। আমাকে বিয়ে করো। ওর এই পাগলামিটা শুরু হয়েছে গতবার। রাজার মধ্যে কী দেখেছে কে জানে? নিকুঞ্জ বনে যাওয়ার সময় গাড়িতে গত বছর হঠাৎ স্টেফানি প্রথম ওকে চুমু খায়। তখনকার মতো রাজা সামলে নিয়েছিল। কিন্তু তার কিছু দিন পর সাহেব মন্দিরে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে স্টেফানি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। "রাজা তোমার চোখে এক ধরনের অদ্ভুত ভালবাসা আমি দেখেছি। যা কোনও আমেরিকানের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি রাজা। রাধা যেমন লর্ড কৃষ্ণকে ভালবাসত, আমিও তোমাকে তেমনই ভালবাসব।"

কে জানে, স্টেফানি সেদিন সত্যি কথা বলেছিল কী না? ওকে কোনও রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে দিন রাজা পালিয়ে এসেছিল। আজ বোধহয় আবার ওই কথা তুলবে। রাজা দম বন্ধ করে রইল, স্টেফানি যেন দোকানের ভেতর কোনও সিনক্রিয়েট না করে। ধর্মা বলেছিল, যা বলার মুখের উপর বলে দিবি। কিন্তু রাজা অত শক্ত হতে পারবে না। হাজার হোক, একটা মেয়ে তো। তাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক না।

"রাজা, আগের বার তোমার একটা সুমো দেখেছিলাম। সেটা আছে?"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাজা। না, বিয়ে টিয়ের ব্যাপার নয় তাহলে। ও আগ্রহের সঙ্গে বলল, "আছে। এই তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"ওই গাড়িটা আমার চাই। এক মাসের জন্য।"

কথাটা শুনে রাজা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কী বলছে কী মেয়েটা? এ তো সাক্ষাৎ লছমী! একে কাটিয়ে দেওয়ার কথা ও ভাবছিল? ছি ছি। ও দ্রুত হিসেব করে নিল। পার ডে দু হাজার টাকা। তিরিশ দিনে ষাট হাজার। পুরো টাকাটাই ও ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবে ব্যাঙ্কে। উফ, সকালে কার মুখ দেখে ও ঘুম থেকে উঠেছিল? ভাতিজা সমীরের। নাহ, সমীরের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে সামলে রাজা বলল, "গাড়িটা কী জন্য নেবে নির্মলা?"

"ওই আমার প্রোগ্রামের জন্য। তবে আমার একটা কণ্ডিশন আছে রাজা। গাড়ির ভেতর আমার স্পেস দরকার। সুমোর পিছনের সিট তোমাকে তুলে দিতে হবে।"

তাতে কোনও অসুবিধে নেই রাজার। সিট ফেরবসিয়ে নিলেই হবে। ও বলল, "কী করবে তুমি স্পেস দিয়ে?"

"প্রভুর মূর্তি বসাতে হবে। খাবারের প্যাকেট রাখতে হবে।"

এই বার মাথায় ঢুকল রাজার। জিজ্ঞেস করল, "গাড়িটা কবে থেকে

নেবে?"

"আজ থেকেই। আসলে কী জানো, এই প্রোগ্রামের জন্য আমাদের একটা গাড়ি তৈরি হচ্ছে দিল্লিতে। গ্যারেজে কী প্রবলেম হয়েছে। তাই সেই গাড়িটা আসতে দেরি হবে মাসখানেক। ততদিন তোমার গাড়িটা আমরা ব্যবহার করব। পার ডে তিন হাজার টাকা। অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে তো?"

অ্যামাউন্টটা শুনে রাজার ভেতরটা কুলকুল করে উঠল। এক মাসে নব্বই হাজার টাকা। ভাগিস স ও নিজে থেকে ভাড়ার অঙ্কটা বলেনি! স্টেফানিকে ও বলল, "আমি একটা কনট্রাক্ট পেপার তৈরি করে রাখছি। টাকাটা কি তুমি অ্যাডভান্স করে দেবে? না, পার্ট পেমেন্ট করবে?"

"পুরোটাই দিয়ে দেব। তুমি শুধু একটা ব্যাপারে আমাকে হেল্প করবে। এমন একজন ড্রাইভার দিও, যে গরীবদের বস্তি আর স্কুলগুলো চেনে।"

"সার্টেনলি। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না। সুমো যে চালায় তার নাম নন্দলাল। সে বৃন্দাবনের অলি গলি চেনে।"

"তা হলে আমি চলি। বিকেলে এসে গাড়িটা নিয়ে যাব। রাধে রাধে।"

"রাধে রাধে।"

স্টেফানি নেমে যেতেই লাডলা কাছে এসে কয়েকটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, "রাজা ভাইয়া, পাঁচশো টাকার জিনিস দেড় হাজার টাকায় গছিয়ে দিলাম।"

"বেশ করেছিস।"

টাকাটা হাতে ধরিয়ে দিয়েই লাডলা বাইরে বেরল। এই ছেলেটার একটাই দোষ। ঘনঘন বাইরে যাওয়া। লাডলার কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজা ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। এখনও মিঠুর আসার নাম নেই! অথচ ও এগারোটার সময় আসবে বলেছিল। আজ সকালে ওর যাওয়ার কথা রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। সেখানে হার্ডলি আধ ঘন্টার কাজ। এতক্ষণে চলে আসা উচিত ছিল। ওখান থেকে অন্য কোথাও চলে গেল না তো? না, না, গেলে ওকে নিশ্চয়ই একবার ফোন করত।

গত দু দিন মিঠুকে নিয়ে রাজা চরকিবাজির মতো ঘুরেছে। বৃন্দাবন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। এমনিতে শহরটা এত ছোট, স্কুটারে ঘুরে আসতে আধ ঘন্টার বেশি লাগে না। মিঠু বিধবা বুড়িদের সঙ্গে কথা বলেছে। ওদের কথা টেপ করে নিয়েছে। তা শুনতে শুনতে রাজা নিজেই একটা সময় ক্লান্ত হয়ে গেছে। মিঠু পারেও বটে বাবা, একই প্রশ্ন সবাইকে করতে। নাম, ঠিকানা, আগেকার ঠিকানা। কবে এলেন, কেন এলেন? অসুখ হলে কী করেন? কী হলে আপনি আরও ভালভাবে বাঁচতে পারেন?

শেষে রাজাই পরামর্শ দিয়েছে, "মিঠু এই সব কোয়েশ্চেন আর পসিবল আপার তুমি আমাকে লিখে দিও। আমি জেরক্স করে এনে দিচ্ছি। এরপর ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় তুমি খালি টিক মেরে যেও।"

মিঠু বলেছিল, "নট ব্যাড আইডিয়া।"

রাজার দোকানে বসেই কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি হল। জেরক্সের দোকানের ছেলেটা আজ সকালে সব দিয়ে গেছে। মিঠু ওই কাগজগুলোই নিতে আসবে। এই দু দিন ওকে দেখে রাজা মুগ্ধ। ওর এই সার্ভে কী কাজে আসবে রাজার কোনও ধারণা নেই। তবে কাজটার প্রতি ওর ভালবাসা সত্যিই প্রশংসা করার মতো। একবার কথায় কথায় রাজা জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই সার্ভে করো তোমার কী লাভ হবে মিঠু? পয়সা পাবে?"

মিঠু বলেছিল, "না, আমাদের অর্গানাইজেশন পাবে। আমার লাভ যদি বলো, সেটা স্যাটিসফ্যাকশন।"

শুনে রাজা দমে গেছিল। যাহ, তা হলে এত খেটে লাভ কী? সে দিন পানির ঘাটের দিকে মিঠুকে নিয়ে গেছিল ও। বেলা তখন বারোটা। যমুনার ঘাটটা খা খা করছে। প্রচণ্ড গরম। আলতা রানি দাস বলে একজন বিধবার ইন্টারভিউ নেবে মিঠু। কার কাছে শুনেছে, আলতা রানি ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখেছিল। সেই টাকা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মেরে দিয়েছে। ঘটনাটা শোনার জন্য মিঠু পানির ঘাটে যেতে চেয়েছিল। খুঁজে খুঁজে আলতা রানির ঘরে গিয়ে ওরা দেখে, সে ভজনাশ্রমে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে চলে আসবে। রাজা ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মিঠু গররাজি। ওই রোদ্দুরে ও বসে রইল প্রায় ঘন্টা খানেক।

পরে আলতা রানির ঘটনা শুনে রাজার মনে হয়েছিল, ফিরে এলে অনেক কিছু মিস করত। বৃন্দাবনে থেকেও ও জানত না, বিধবাদের কী ভাবে শোষণ করা হয়। আলতা রানির টাকা আসত কলকাতা থেকে। খুবই সামান্য, মাসে পাঁচশো টাকা। একে বয়স বেশি, তার উপর নিজের নামটাও সই করতে জানে না। টিপসই দিয়ে টাকা তোলে। তাই অ্যাকাউন্টটা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আর আলতা রানি—দু'জনের নামেই করা ছিল। মাসে দুশো টাকার বেশি খরচ হত না। ফলে বেশ কিছু টাকা জমে গেছিল। এই কিছু দিন আগে বাড়িতে ঘুরে আসার জন্য টাকা তুলতে গিয়ে আলতা রানি দেখে অ্যাকাউন্টে একটা পয়সাও নেই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মথুরা ব্র্যাঞ্চে বদলি হয়ে গেছেন। তিনিই টাকা মেরে দিয়ে চলে গেছেন। সব উইথড্রয়াল ফর্মেই অবশ্য আলতা রানির টিপসই আছে। ফলে ম্যানেজারকে কিছু করা যাবে না।

দোকানে দাঁড়িয়ে রাজা আলতা রানির কথাই ভাবছে। ওই রকম একটা গরীব বুড়ির টাকা কেউ মারতে পারে? বুড়িটা কুঁজো হয়ে হাঁটে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। মিঠুর কাছে ঘটনাটা বলতে বলতে আলতা রানি কেঁদে ফেলেছিল। রাজার খুব রাগ হয়ে গেছিল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের উপর। পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছে, লোকটা থাকে রাধা বাগের দিকে। রাজা ঠিক করেছে, একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে লোকটাকে একটু চোখ রাঙাবে আখড়ার ছেলেদের নিয়ে গিয়ে। যদি ভয়ে টাকা বের করে দেয়।

"সরি রাজা, একটু দেরি হয়ে গেল।"

মিঠুর গলা শুনে রাজা মুখ তুলে তাকাল। ঘর্মাক্ত একটা মুখ। চুল লেপ্টে আছে ঘাড়ে ও গালে। কোথায় গেছিল মিঠু? ঘামতে ঘামতে এল? ওর ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে গেছে। বড়লোকের মেয়ে, এই গরমে এত পরিশ্রম পোষায়? রাজার একবার ইচ্ছে করল, রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে দিতে। কিন্তু তা তো সম্ভব না। মিঠুর দিকে এক পলক তাকিয়ে ও বলল, "কোত্থেকে এলে? আমি চিন্তায় পড়ে গেছিলাম।"

"কোথাও যাইনি। বাড়ি থেকে এলাম। এমন একটা রিকশায় উঠেছি, মাথার উপর ঢাকনা নেই। তা, তুমি চিন্তা করছিলে কেন?"

"সে তুমি বুঝবে না। যাক গে, তোমার কাগজপত্র সব রেডি। বলো, এখন তোমার প্রোগ্রাম কী?"

"আজ আমার কোনও কাজ ভাল লাগছে না। মনটা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চলো, ফাঁকা কোথাও গিয়ে একটু বসি।"

"সরি মিঠু, এটা তোমার কলকাত্তা নয় যে, ভিক্টোরিয়া অথবা রবীন্দ্র সদনের মতো খোলাচত্বর পাবে। এটা বৃন্দাবন। আকাশ থেকে তোমাকে ফেলে দিলে, হয় তুমি গিয়ে পড়বে কোনও মন্দিরের চূড়োয়, না হয় কোনও ধর্মশালার ছাদে। আনফর্চুনেটলি, ইয়ং ছেলে মেয়েদের জন্য বৃন্দাবনে কোনও জায়গা নেই।"

"তা হলে চলো, আমাদের বাড়ি চলো। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।"

"কিন্তু এই তো এলে বাড়ি থেকে। আবার ঘামতে গামতে যাবে? তার চেয়ে বরং চলো, আমার স্টোর রুমেই বসা যাক। ঘরটা খুব ঠাণ্ডা, একটা কুলার বসানো আছে। তা ছাড়া, তোমাকে হাঁটতেও হবে না। কেননা ঠিক, আমার মাথার উপরে।"

কাউন্টারের ভার লাডলা আর সুমনের হাতে দিয়ে, মিঠুকে নিয়ে রাজা উপরে উঠে এল। ব্যবসার কাজে কোনও লোক এলে রাজা তাঁকে এখানেই নিয়ে আসে। এক পাশে টেবল ও দুটো চেয়ার। অন্য পাশে প্রচুর পাথরের মূর্তি। নড়াচড়ার জায়গা নেই বললেই চলে। রাজা চেয়ারে আয়েস করে বসে বলল, "হ্যাঁ এবার বলো, কী করলে তোমার মনটা ভাল করা যাবে? ঠাণ্ডা কিছু খাবে? না কোনও ফ্রুট জুস আনাব। কোনটা তোমার পছন্দ বলো?"

কাঁধের ব্যাগটা টেবলের উপর রেখে মিঠু বলল, "কিছু না। আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

রাজা বলল, "কী ব্যাপার বলো তো মিঠু? কাল রাতেও তোমাকে খুব জোভিয়াল মুডে দেখেছি। আজ সকালে কী এমন ঘটল, এত আপসেট হয়ে পড়লে?"

মিঠু ইতস্তত করে বলল, "আমাদের বাড়িতে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেছে রাজা। মা পাজলড হয়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট, আমরা দু'জনেই বুঝতে পারছি না এখন কী করা উচিত।"

"আমাকে বলা সম্ভব?"

"সে জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি। মা বললেন, রাজার সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ কর। দ্যাখ, ও কী বলে।"

রাজার ভ্রু কুচকে গেল। ও বলল, "কী হয়েছে, খুলে বলো তো?"

"আমাদের মন্দিরটা তো তুমি দেখেছ। মন্দিরের একটা হনুমান মূর্তি চুরি গেছে। কষ্টি পাথরের। প্রায় দু'ফুট উঁচু।"

"কবে হল?"

"আমরা কি করে জানব? ওই মন্দিরের পিছনের ঘরে মূর্তিটা রাখা ছিল। মা আজ সেই ঘরটা খুলে দেখে, মূর্তিটা নেই। তার চেয় বড় কথা, মদনমোহনের হাতের সোনা-রুপোয় কাজ করা বাঁশিটা উধাও। এই বাঁশিটা সারা বছরে মাত্র একবারই মদনমোহনের হাতে তুলে দেওয়া হত। এবং সেটা পঞ্চম দোলের দিন। এই বাঁশিটা অবশ্য ছিল ঘরের সিন্দুকে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী। মাম আমাকে ডেকে বলল। মন্দিরের সেবাইতকে আমি ডেকে পাঠালাম। উনি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। চল্লিশ বছর

ধরে ভদ্রলোক মন্দিরে পুজো করছেন। মন্দিরের ভার সব ওঁর উপরই। আমি যখন বললাম, চুরির কথাটা পুলিশে জানাতে হবে, তখন উনি হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন।"

"ঘরের চাবিটা কি ওঁর কাছে ছিল?"

"না। ওই চাবি থাকে কলকাতায় মামের কাছে। এখানে সিন্দুক ভাঙা হয়নি। অথচ জিনিসগুলো কী করে গায়েব হয়ে গেল, সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"তোমাদের ওই বাড়িতে সারা বছর যারা থাকে, তাদের জিজ্ঞেস করেছ?"

"না। মাম মানা করল। মাম চাইছে না, বেশি লোক জানাজানি হোক।"

"উনি কি পুলিশেও জানাতে চাইছেন না?"

"ঠিক তা না। তবে দোমনা করছে। মাম এখানে বোধহয় বেশ কিছুদিন থাকতে এসেছে। তাই চায় না, আশপাশের লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হোক।"

"তোমাদের কাউকে সন্দেহ হয় মিঠু? তোমাদের অ্যাবসেন্সে রাধাকুঞ্জে যাতায়াত করে এমন কোনও লোক?"

"দেখো, রেগুলার যাতায়াত করার সুযোগ আছে সেবাইত ছাড়া কানাই পাণ্ডার। আমার দাদার সঙ্গে কানাই পাণ্ডার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ওরা সমবয়সী বলে, দাদা যখনই এখানে এসে থাকত, তখনই উদয় হত কানাই পাণ্ডা।"

"বন্ধুত্ব ছিল বলছ কেন। এখন নেই?"

মিঠু চুপ করে থেকে তারপর বলল, "দাদা নেই। মাস দুয়েক আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।"

"মাই গড। তোমাদের আর কে কে আছে মিঠু?"

"কেউ না। মাম, আমি আর আমার বউদি। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল দাদার। নিজেই পছন্দ করে বউদিকে এনেছিল। কপালে অত বড় দুর্ঘটনা লেখা আছে কে জানে? মাম অবশ্য বলত, একদিন এরকম কিছু একটা ঘটবে। আমার দাদাটা ছিল অমানুষ। ছোট বেলায় বদ সঙ্গে মিশে গোল্লায় গেছিল। মামকে অনেক জ্বালিয়েছে। বাবার ব্যবসাটা তুলে দিল। রোজ ধার দেনা করে মদ খেত। আর টাকার জন্যে এসে চেল্লামেল্লি করত মামের কাছে। মাম শেষদিকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না দাদাকে। দাদা মারা যাওয়ার পর আমায় বলল, চল বৃন্দাবনে ঘুরে আসি। জানো রাজা, আমাদের ফ্যামিলিটাই যেন অভিশপ্ত হয়ে গেছে।"

"তোমার মাম তো দেখছি স্ট্রং পার্সোনালিটির মানুষ।"

"অফ কোর্স। মাম না থাকলে আমাদের প্রপার্টি কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। সব দাদা উড়িয়ে দিত। কলকাতায় আমাদের অত বড় বাড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতিরা মামলা করে প্রায় হাতিয়ে নিচ্ছিল। মাম রুখে না দাঁড়ালে তখন সব চলে যেত।"

মিঠুর কথা শুনে রাজা খুব অবাক হচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, "চুরির কেসটা তা হলে কী করা যায় বলো তো? পুলিশের কাছে যাবে? থানার ও সি শ্রীবাস্তব আমার খুব পরিচিত। ওর কাছে গিয়ে সব বলা উচিত। কিন্তু উনিও একটা প্রশ্ন করবেন। কাকে তোমাদের সন্দেহ।"

"একজনকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তার নামটা তোমাকে বলা ঠিক হবে কী না বুঝতে পারছি না।"

"কে গো লোকটা? আমি চিনি?"

"চেনো। কানাই পাণ্ডা। প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর কলকাতায় গিয়ে এই লোকটাই দাদার কানে কুমন্তর দিত।"

"কী করে বুঝলে? লোকটা কিন্তু খারাপ না। অন্য পাণ্ডাদের তুলনায় অনেক ভদ্র।"

"হতে পারে। তবুও লোকটা ঠিক না। মারা যাওয়ার মাস দুয়েক আগে, পঞ্চম দোলের সময় দাদা বৃন্দাবনে এসেছিল। ফিরে গিয়ে মামকে বেঝাতে লাগল, বৃন্দাবনে প্রপার্টিটা রেখে কোনও লাভ নেই মা। ভাস একটা লোক পাওয়া গেছে। ওটা বিক্রি করে দেওয়া যাক। মাম এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, বিক্রির কথাটা দাদার মাথায় ঢুকিয়েছিল এই কানাই পাণ্ডাই।"

"কী জানি? আমার তো লোকটাকে খুব স্ট্রেট বলে মনে হয়।"

"দেখো, মাম তখন বিশ্বাস করেনি আমার কথা। এবার এখানে এসে বলছে, তুই যা সন্দেহ করেছিলি, ঠিক। কানাই পাণ্ডা আমার সঙ্গেও চালাকি মারছে।"

রাজা বলল, "কেন, তোমার মামের এ ধারণা হল কেন?"

"মন্দিরের ওই সিন্দুকে কয়েকটা প্রাচীন পুঁথি রাখা ছিল। আমার দাদুর সময়কার। এই খবরটা পেয়ে রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডঃ সুধাময় বাসু বলে এক ভদ্রলোক মামকে একটা চিঠি লেখেন কলকাতায়। আপনারা যদি ওই অমূল্য গ্রন্থগুলি ইন্সটিটিউটকে দেন, তাহলে ভবিষ্যতে স্কলারদের সুবিধা হবে। কলকাতা থেকে মাম উত্তর দিয়েছিল, আমরা বৃন্দাবনে যাচ্ছি। দয়া করে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এখানে আসার পর থেকে এই পুঁথিগুলোর জন্য কানাই পাণ্ডা মামকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রথমে বলল, পুঁথি বিনা পয়সায় দেবেন না মা। অনেক খদ্দের আছে। আমি নিয়ে আসব। তারপর বলল, যে কিনবে সে হাজার পাঁচেক টাকা দেবে বলছে। মামকে তো চেনে না। একটু চাপ দিতেই এখন পঞ্চাশ হাজারে উঠেছে।"

"ডঃ সুধাময় বাসু কে জানো?

"হ্যাঁ, সেদিন আলাপ হয়েছে। বিমলা বাসুর কথা উনিও বললেন। আমরা যে ওঁর বাড়িতে গেছিলাম, উনি অবশ্য সেটা জানতেন না। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে মাম এমন ইম্পেসড যে সেদিনই পুঁথিগুলো দিয়ে দিলেন। কাল কানাই পাণ্ডা এসে মামকে বলেছে, পুঁথিগুলো ইন্সটিটিউটকে দিয়ে ভাল করলেননা মা। আমরা যে পুঁথিগুলো দিয়ে দিয়েছি, এই খবরটা ও কোথথেকে পেল? এখানে একটা র‍্যাকেট আছে বলে মনে হচ্ছে। আর ও তাতে ইনভলভড।"

"হতে পারে। যাক গে, এখন আসল কথায় এসো। ও সি-র কাছে কি যাবে? তাহলে একবার ফোন করে দেখি। থানায় উনি আছেন কী না।"

"দেখো তা হলে। বৃন্দাবনে এসে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। দেখছি, গরীব বিধবারাই শুধু নয়, ধনী বিধবারাও আনসেফ।"

ফোনের একটা বাড়তি লাইন করিয়ে রেখেছে রাজা স্টোর রুমে। সেখান থেকেই ও থানায় ফোন করল। ওকালতি করার সময় পুলিশের সঙ্গে ওর খুব যোগাযোগ ছিল। এখন অনেক কমে গেছে। তবুও ও সি অনিল শ্রীবাস্তব বড়িদিদির জন্য খুব ভাল করে চেনেন রাজাকে। গলা পেয়েই উনি বললেন, "আরে, আজ মর্নিংয়ে আপনাকে খোঁজ করছিলাম। আপনার নামে থানায় একটা কমপ্লেন হয়েছে। আপনি কি একটা বান্দরকে মেরে ফেলেছেন চার পাঁচদিন আগে?"

"কমপ্লেনটা কে করল মিঃ শ্রীবাস্তব?"

পাণ্ডা অ্যাসোসিয়েশনের ঘনশ্যাম। এখন খুব লিডার হয়ে গেছে। সত্যিই মেরেছেন না কি বান্দরটাকে?"

"আরি না না। ভোর বেলায় বাড়ি থেকে বেরনোর সময় দেখি, আমাদের গেটের সামনে বাঁদরটা মরে পড়ে আছে। তাই তুলে যমুনায় ফেলে দিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছেন। তা, আমাকে ফোন করলেন কী মনে করে?"

একটা চুরির ব্যাপারে। মন্দির থেকে একটা অ্যান্টিক মূর্তি চুরি হয়েছে।"

"এবছর এরকম তিনটে চুরির কেস আমার কাছে এল। ট্র্যাক ডাউন করেছি। মনে হয় একই লোক এটা করছে অথবা করাচ্ছে। ধরে ফেলব কয়েকদিনের মধ্যে।"

"আমরা আপনার কাছে যেতে চাই মিঃ শ্রীবাস্তব। এখন যাওয়া যাবে?"

"না, এখন আসবেন না। রিটিন কমপ্লেন নিয়ে আসুন। বিকালের দিকে। এখন আমি মথুরার দিকে যাচ্ছি। এস পি ডেকেছেন। ও কে। বিকালে তা হলে আসছেন। ছাড়ছি মিঃ মিত্রা।"

ফোনের কথাবার্তা শুনে মিঠু সবই বুঝতে পেরেছে। বলল, "তাহলে বিকালে? ইস, মাম আজ বিকালেই তোমাকে নিয়ে বাঁকেবিহারীর মন্দিরে যেতে চেয়েছিল। সেটা তাহলে আর হবে না।"

"বাব্বা, কানাই পাণ্ডার উপর তোমাদের এত রাগ হয়ে গেছে? ওর সঙ্গেও তো মাম যেতে পারতেন।"

"কী জানি? তোমার উপরে মামের খুব বিশ্বাস হয়ে গেছে, জানো। আমাকে বলছিল, আমার ছেলেটা যদি রাজার মতো হতো! মামকে তুমি কষ্ট দিও না রাজা। যে ক'টা দিন এখানে মাম থাকবে, তুমি একটু দেখো। আমি কিন্তু তোমার ভরসায় মাকে রেখে যাব। কী কানে গেল কথাগুলো?"

রাজা ঠাট্টা করে বলল, "তুমি যাবে মানে? তোমাকে কে যেতে দিচ্ছে?"

"তুমি আটকাবে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি আটকানোর কে? বৃন্দাবনে যিনি তোমাকে টেনে এনেছেন, তিনিই আটকে দেবেন।"

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মিঠু, "রাজা, তুমি টিপিকাল বিধবাদের মতো কথা বলছ। এ ক'দিনে শুনে শুনে তোমার খুব মুখস্থ হয়ে গেছে না?" হাসি থামিয়ে তারপর মিঠু বলল, "থাক ওসব কথা। মন্দিরে যাওয়ার কী হবে বলো।"

রাজা বলল, "বাঁকেবিহারী মন্দিরে যাওয়ার বেস্ট টাইম হল, রাত সাড়ে আটটায়। ওই সময় আরতি হয়ে যায়। মন্দিরেও তেমন ভিড় থাকে না। বলতে পারো ফাঁকা থাকে।"

"বাহ, তাহলে তো ভালই হল। এক কাজ করা যাক। তুমি আমার সঙ্গে এখন রাধাকুঞ্জে চলো। দুপুরে আমার সঙ্গেই খেয়ে নেবে। তারপর সারা দুপুর আড্ডা মেরে বিকালে থানা হয়ে, রাতে একেবারে মন্দিরে। আইডিয়াটা কেমন রাজা?"

"খুব খারাপ। রাত্তিরে কোন কুঞ্জে আমি থাকব, সেটা আগে প্ল্যান করো।"

কথাটা প্রথমে মিঠু বুঝতে পারেনি। বোঝার পর কিল মারতে উঠল। তারপর বলল, "খুব শখ না, রাধাকুঞ্জে গিয়ে থাকা?"

শখটা তো আজকে হয়নি। প্রথম হয়েছিল পনেরো বছর আগে। যেদিন তোমায় প্রথম আমি দেখি। তোমার হয়তো সেই দিনটার কথা মনে নেই। আমার আছে। ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে সম্ভবত, তোমার দাদার সঙ্গেই মারপিট লেগেছিল আমার। তোমার দাদার ঘুড়ি কেটে দেওয়ার অপরাধে। বয়সে ছোট ছিলাম বলে, সেদিন মারটা আমিই বেশি খেয়েছিলাম। রাধাকুঞ্জের সিঁড়িতে তুমি তখন দাঁড়িয়েছিলে। কত বয়স তখন তোমার? দশ এগারো। তোমাকে একটা পরী বলে মনে হয়েছিল আমার সেদিন। আমাকে মার খেতে দেখে তুমি দৌড়ে চলে গেছিলে বাড়ির ভেতরে। ডেকে এনেছিলে লোকজনকে।

নিজের মনেই রাজা এই সব কথা বলল। ওকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিঠু এদিকে উঠে এল। তারপর বলল, "এই রাজা, তোমার কী হল? আমার কথায় কি তুমি অসন্তুস্ট হলে?"

রাজা বলল, "না না। একদম না। চলো, এবার নীচে যাওয়া যাক।"

সরু সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে নামা যাবে না। লাইট আর কুলার বন্ধ করার জন্য ও বলল, "মিঠু তুমি নীচে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।"

মিঠু নীচে নেমে যাওয়ার পর রাজার হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। এই দু'দিন আগে স্টেফানিকে এড়ানোর জন্য যেদিন ও স্টোর রুমে উঠে এসেছিল, সেদিন কালো পাথরের একটা হনুমান মূর্তি ওর চোখে পড়েছিল। হনুমান মূর্তি তো ওর কোনও কারিগর তৈরি করে না? তা হলে সেটা এখানে এল কী করে? সেদিন কথাটা মাথায় আসেনি। আজ মিঠুর কথায় হঠাৎ ওর খেয়াল হল। ও আশপাশে চোখ বুলিয়ে কোণের দিকে মূর্তিটা দেখতে পেল। বেশ কয়েক বছরের পুরনো বলে মনে হচ্ছে। কপালে সিঁদুরের দাগ স্পষ্ট। তার মানে মূর্তিটা পুজো করা হয়েছে। একটু আগে মিঠু এই মূর্তিটার কথাই বলছিল নাকি? এখানে এল কী করে? রাজা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

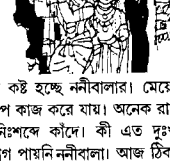

চাঁপার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে ননীবালার। মেয়েটা সারাদিন কারও সঙ্গে কথা বলে না। চুপচাপ কাজ করে যায়। অনেক রাতে ঘরে ফিরে চারপাইয়ে পাশ ফিরে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। কী এত দুঃখ ওর, প্রথম দু'তিনদিন জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি ননীবালা। আজ ঠিক করেই রেখেছে, জানতে চাইবে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ও অনেকক্ষণ ছাদে ঘুরে বেড়াল। আকাশে গোল চাঁদ। পূর্ণিমার রাত। গুরুকুলের ধান মাঠ এখন রুপোলি চাদরের মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ননীবালার হঠাৎ মনে হল, আজ অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটে যাবে।

প্রায় মাঝ আকাশে উঠে এসেছে চাঁদ। সেই সময় হালকা পায়ের শব্দ শুনে ননীবালা ফিরে তাকাল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ছায়ামূর্তি ওদের ঘরে ঢুকে গেল। নিশ্চয়ই চাঁপা। এবার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ ও কাঁদবে। কাঁদুক, কেঁদে হালকা হোক। তারপর ননীবীলা গিয়ে ওকে ধরবে। মেয়েটাকে কি এরা জোর করে ধরে এনেছে? না কি ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কিছু করাচ্ছে। কারণটা যা-ই হোক, ননীবালা আজ জানবেই। অমন ফুলের মতন সুন্দর একটা মেয়ের মুখে ও হাসি দেখতে চায়।

মিনিট পাঁচেক পরে ঘরে ঢুকে চাঁপার চারপাইয়ে বসে ননীবালা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর প্রশ্ন করল, "এত রাইত অবধি কোন হানে ছিলি রে মা?"

কোন উত্তর নেই। বরং ফোঁপানোর শব্দটা আরও বাড়ল। প্রশ্নটা বারকয়েক করার পর একটা সময় চাঁপা শ্লেষ্মাজড়িত গলায় বলল, "গোহাইয়ের ঘরে।"

"এত রাইতে ক্যান?"

"স্যাবা করতে।"

সেবা করার জন্য গভীর রাতে একজন যুবতীকে ঘরে ডাকার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না ননীবালার। ও প্রশ্ন করে। "কান্দস ক্যান রে মা? আমারে ক। দেহি তোর লইগ্যা কিছু করন যায় কী না।"

ননীবালার কথায় এমন কিছু ছিল, শুনে চাঁপা উঠে বসল। তারপর বলল, "আমারে একডা উবগার করবা?"

"কি উবগার রে?"

"একটা পোস্টকার্ড লিইখ্যা দিবা?"

ননীবালা যে লেখাপড়া জানে, সেটা এখানে ফাঁস করে দিয়েছে সান্ত্বনা। দেশের বাড়িতে চিঠি লেখানোর জন্য, বৃন্দাবনের বিধবাদের অনেককেই দু টাকা করে গচ্চা দিতে হয়। বিনা পয়সায় এই কাজটা কেউ করে দেয় না। একমাত্র ননীবালাই হাত পাতে না বলে অনেকেই ওর কাছে আসে। এখানে কাল পারুল দাসের বাড়িতে ও একটা চিঠি লিখে দিয়েছে। সেটা বোধহয় লক্ষ্য করেছে চাঁপা। কিন্তু ও কার কাছে চিঠি পাঠাতে চায়? সেটা জানা দরকার। তাই জিজ্ঞেস করল, "কার হনে পাঠাইবি?"

"ছিলিগুড়ি। আমার দাদার থাহে। হের থনে পাঠাইমু।"

"তুই এহানে আইলি ক্যামনে চাঁপা?"

"গোহাই ঠাকুর লইয়্যা আইসে। দাদারে কইল, এহানে ভাল বিয়া দিব। শুইনা বউদি ফাল মাইর‍্যা উঠে। কয়, চাঁপা রে লইয়া যান ঠাকুরমশয়।"

কথাগুলো শুনে ননীবালা কেঁপে উঠল। ভাল বিয়ের প্রতিশ্রুতি মানে, ও জানে।

গোঁসাইয়ের উপর বিশ্বাস করে যারা ওকে পাঠিয়েছে, তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না মেয়েটা বিক্রি হয়ে যাবে। এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে বৃন্দাবনে। বিমলা মাইয়ির বাড়িতে কত ঘটনার কথা ও শুনেছে। বিয়ের নামে স্থানীয় কোনও হিন্দুস্তানীর হাতে পড়বে মেয়েটা। দশ বারো হাজার টাকা লেনদেন হবে। বছর দুই তিন চাঁপাকে ভোগ করে শয়তানটা আবার টাকার বিনিময়েই ওকে অন্যের হাতে তুলে দেবে। না, তা হতে দেবে না ননীবালা। ফিসফিস করে ও বলল, "তুই বাড়ি ফিইর‍্যা যাইবি?"

"তুমি পাঠাইয়া দিতে পারব্যা?"

চাঁপার চোখ মুছিয়ে দিয়ে ননীবালা বলল, "পারুম। কাউরে কিছু কইস না। একজনের সনে শলা কইর‍্যা দেহি। তারপর তোরে কমু।"

কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর চাঁপা দু'হাটুতে মুখ গুঁজে দিল। দুমড়ে যাওয়া অসহায় একটা শরীর। ওকে ওই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে ননীবালার মনটা হু হু করে উঠল। চব্বিশ বছর আগে ও নিজেও একদিন ঠিক এমনিভাবে বসে, নিজের ভবিষ্যতের কুলকিনারা পায়নি। সেই দুঃসহ দিনটার কথা মনে পড়লে এখনও ননীবালার প্রাণটা কেঁদে ওঠে। নিজের চারপাইতে ফিরে এসে ও চাঁপাকে বলল, "হুইয়া পড় মা। কাইন্দা আর কী করবি।"

চাঁপাকে ঘুমোতে বলল বটে, কিন্তু ননীবালা নিজে ঘুমোতে পারল না। আজ চাঁপা সুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছে। ও বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল। মাইয়া মানুষের উপর ক্যান এত অইত্যাচার অইব? এই প্রশ্নটা ওর মনকে কুরে কুরে খেতে লাগল। চাঁপার মতো ও নিজেও তো বলাৎকারের শিকার। এ ঘটনার কথা বৃন্দাবনে আর কেউ জানে না। নিজের জীবনের সেই অধ্যায়টা ননীবালা স্মরণ করতে লাগল।

স্বামী মারা যাওয়ার পর একটা বছর খুব যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটেছিল ননীবালার। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে শাশুড়ি হঠাৎই বুকের ব্যথায় মারা গেলেন। সংসারের চাবি গিয়ে উঠল জায়ের হাতে। উঠতে বসতে গঞ্জনা। শ্বশুরমশাই সংসারের প্রতি আর তেমন নজর দিতেন না। ফলে জানতেও পারতেন না, ননীবালাকে কী পরিমাণ লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে। একটা সময় বাড়ির কাজের লোকেরাও অগ্রাহ্য করতে লাগল। সারাদিন অমানুষিক খাটাখাটনির পর ননীবালা গিয়ে বসে থাকত গোবিন্দর মন্দিরে। মনে মনে বলত, "ঠাকুর আমারে কইয়া দাও, কী করুম। আমি যে আর সহ্য করতে পারতাসি না।"

এরই মধ্যে বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে গিয়ে হাজির হলেন দ্বারকা পাণ্ডা। তাঁকে দেখে শ্বশুরমশাই ঠিক করলেন, তীর্থ করতে বেরোবেন। পাড়া-প্রতিবেশী আরওকিছু লোক জুটে গেল। দলটা গিয়ে দাঁড়াল সত্তরজনে। প্রায় দু আড়াই মাসের সফর। মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, লছমনঝোলা, অমরনাথ। একটা দল থেকে যাবে বৃন্দাবনে। আর যার বিত্তশালী তারা হরিদ্বার হয়ে অমরনাথ পর্যন্ত যাবে। বৃন্দাবন রওনা হওয়ার আগেরদিন শ্বশুরমশাই ননীবালাকে ডেকে বললেন, "মা, তুমি গুছাইয়া নাও। আমার সনে তুমিও যাইবা। তোমারে এহানে ফ্যালাইয়া যামু না।"

"তাইলে বাবা মায়েরে কইয়া আসি।"

"যাও। অগো আর্শীবাদ লইয়া আইস।"

কে জানে, সেটাই শেষবার বাবা মাকে দেখে আসা? ননীবালা বাপের বাড়ি গিয়ে শুনল, বাবা আর মা দুজনেই ফের ঢাকায় যাচ্ছে। জেঠিমা চিঠি পাঠিয়েছে, সম্পত্তি সব ভাগ-বাটোয়ারা হচ্ছে। এই সময়ে ওখানে না গেলে জ্ঞাতিরা যে যার ইচ্ছে মতো ভাগ নিয়ে নেবে। বাবা বলল, "যা পামু, সব তর নামে রাইখ্যা যামু। মা, তরে দ্যাখলে আমার বুক ফাইট্যা যায় রে।" মা জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে। জায়ের অত্যাচারের কথা বোধহয় ঘাটে চান করতে গিয়ে কারও কাছে শুনেছে। ননীবালাকে খুটিয়ে খুটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেইসব দিনগুলোর কথা ননীবালা ভাবছে। চাঁপা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ও টেরও পায়নি। অন্যদিন কাত হয়ে থাকে। আজ দু পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে। ওর তলপেটটা দেখে ননীবালার সন্দেহ হল। একটু উচা উচা লাগতাসে ক্যান? ভাল করে দেখার জন্য ও উঠে বসল। ওর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল, কপালখাকির প্যাট হত্যই ভারি হইসে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। ওর দাদার কাছে চিঠি লিখে কী হবে? আর ক'দিন পরেই তো সর্বনাশী ধরা পড়বে। কুমারী মা। ওকে কেন বাড়িতে জায়গা দেবে? মেয়েটা তাহলে এই জন্য রোজ গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে। এইবার ননীবালা বুঝতে পারল।

ও নিজেও তো চব্বিশ বছর আগে, দীর্ঘ একটা মাস এই আশঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছে। ও জানে, একজন রজঃস্বলা মেয়ের মানসিক যন্ত্রণা কী ভয়ানক হতে পারে, অনভিপ্রেত মাতৃত্বের ভয়ে। এই জগতে গোঁসাই ঠাকুরের দোষ কিন্তু কেউ দেখবে না। সবাই আঙুল তুলবে চাঁপার দিকেই। যেমন তুলেছিল ভজনাশ্রমে গোলাপির দিকে। না, কীটদুষ্ট চাঁপাকে মরতে দেওয়া যাবে না। বরং কীটটাকেই শিক্ষা দিতে হবে। ননীবালা মনে মনে বলল, "গোঁসাই ঠাকুর, তুমার পাপ। তুমিই মিটাইব্যা। না মিটাইলে তুমারে এমন শাস্তি দিম, জীবনেও ভুলব্যা না।" কেন, কিসের জোরে ও এই শপথ নিল, ননীবালা নিজেও জানে না।

মনটাকে শান্ত করে এবার ঘুমোনোর চেষ্টা করল। "গোবিন্দ, রাধামাধব, তুমি রক্ষা কইর মাইয়াডারে। আমারে তুমিই রক্ষা করসিলা। নাইলে চান করতে গিয়া থকা থকা রক্তস্রাব হইসিল ক্যান। হেই দিন নালি দিয়া সব পাপ বাইর হইয়া গেসিল। কেউ জানতে পারে নাই" শুয়ে শুয়ে ননীবালা হঠাৎ অনেক দূর থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুর শুনতে পেল। এই গভীর রাতে কে বজায় এমন মনোহর বাঁশি? বালিশে মাথা রেখে ও উৎকীর্ণ হয়ে উঠল, ওই বাঁশির সুর আরও ভাল করে শোনার জন্য। আহ, বুকটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আর থাকতে না পেরে ননীবালা উঠে বসল। পাশের চারপাইতে চাঁপা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পোড়ারমুখি, ওঠ রো। শোন, এই অমৃত সুর। জীবন ধন্য হয়ে যাইব।

বাঁশির সুর আরও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ননীবালা। এ কী, সারা শরীরে কেন এত আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে? কালই গোঁসাই ঠাকুর পাঠ করার সময় বলছিল, এই ব্রজধামে এখনও অনেক বনে রাধা কৃষ্ণের লীলা হয়। যাদের অন্তরাত্মা শুদ্ধ তারা দেখতেও পায়। বিছানায় বসে ননীবালা বোঝার চেষ্টা করল, কোথা থেকে আশ্চর্য সুন্দর সুর ভেসে আসছে। নিধু বন, না নিকুঞ্জ বন? কে বলতে পারে, ভরা পূর্ণিমায় আজ তিনি ধরা ধামে নেমে এসেছেন কী না? কথাটা মনে হওয়া মাত্র ননীবালার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ননীবালার মনে পড়ল, বৃন্দাবনে পা দিয়ে ও আরও একবার এই বাঁশির সুর শুনেছে। দ্বারকা পাণ্ডা নবদ্বীপের পুরো দলটাকে নিয়ে যেদিন তুলেছিল নিকুঞ্জ বনের কাছে এক ধর্মশালায়। চব্বিশ দিন ধরে ব্রজ পরিক্রামা সেরে সেদিনই ওরা ধর্মশালায় ফিরেছে। সেই রাতটার কথা এখনও মনে আছে ননীবালার। ধর্মশালার একতলায় পুরুষদের থাকার ব্যবস্থা। দোতলায় মেয়েদের। দোতলার বিরাট বারান্দা থেকে নিকুঞ্জ বন স্পষ্ট দেখা যায়। শ্বশুরমশাই হঠাৎ বললেন, "দ্বারকা, বারান্দায় আমার শোয়ার ব্যবস্থা কইর‍্যা দাও। নীচে গরম। ঘুম আইসব না।"

বয়স্ক মানুষ। উনি বারান্দায় শুতে চাওয়ায় কেউ আপত্তি করেনি। সে দিনও ছিল পূর্ণিমার রাত। রাতের দিকে ঠাণ্ডার আমেজ। দূর থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছিল। শ্বশুরমশাই বারান্দায় পায়চারি করছেন। দোতলার ঘরে তখনও ননীবালা ঘুমোয়নি। হঠাৎ শ্বশুরমশাই দোয়ারকা পাণ্ডা বলে চিৎকার করে উঠলেন। একবরা নয়, তিন তিনবার। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল ননীবালা। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে ও দেখে, লোহার রেলিং ধরে শ্বশুরমশাই বসে পড়েছেন। বুকের বাঁ দিকটা হাত দিয়ে চেপে, যন্ত্রণা সামলাতে সামলাতে, উনি শুধু বললেন, "আহা কী অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম।

আঙুল দিয়ে নিকুঞ্জ বনের দিকে ইঙ্গিত করছেন শ্বশুরমশাই। ননীবালা সেদিকে তাকিয়ে সেদিন কিছুই দেখতে পায়নি। ওর পা তখন কাঁপতে শুরু করেছে। ও বুঝতে পেরে গেছে শ্বশুরমশাইয়ের বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। উনি শুরুতর অসুস্থ। চিৎকার করে অন্যদের ও তখন ডেকেছিল। ধরাধরি করে শ্বশুরমশাইকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হল। নীচ থেকে দ্বারকা পাণ্ডা ওপরে উঠে আসার পর উনি ফের ওই একই কথা বললেন, "দ্বারকা, কী অপূর্ব দৃশ্যই না দেখলাম।"

কত বয়স তখন ননীবালার। একুশ বাইশ? শ্বশুরমশাইকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, তখন ও খুব কান্নাকাটি করছিল। সেই সময় দ্বারকা পাণ্ডা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। তোর শ্বশুর অনেক পুণ্য করে এসেছিলেন। আমি জানি, উনি কী দেখে গেলেন। নিকুঞ্জ বনে রাসলীলা। পুন্যাত্মারাই শুধু দেখতে পায়। আমাদের মতো পাপীদের ভাগ্যে কী আর ওসব দেখা জুটবে?"

পরদিনই নবদ্বীপের দলটার রওনা হওয়ার কথা হরিদ্বার। যাত্রীদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়ে গেল। একদল হরিদ্বার রওনা হতে চায়। আর অন্য দল আরও দু'তিনটে দিন বৃন্দাবনে থেকে যেতে আগ্রহী। দলেরই একজন হাসপাতালে পড়ে থাকবেন! আর তাকে ফেলে অন্যরা চলে যাবেন, এতে অনেকেই সায় দিলেন না। তাছাড়া ননীবালা? সে যুবতী বিধবা। তার কী হবে? তাকে এই বিপদের মধ্যে একা ফেল যাওয়া উচিত নয়। এ নিয়ে দু পক্ষই দ্বরকা পাণ্ডার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল।

শেষে সমস্যার সমাধান করে দিলেন দ্বারকা পাণ্ডা। নবদ্বীপে ফোন করে দুঃসংবাদটা দিয়ে এসে উনি বললেন, "আমরা হরিদ্বারেই রওনা হয়ে যাব। একবার ট্রেনের টিকিট ক্যানসেল করে দিলে, ফের এতগুলো টিকিটের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

তা হলে ননীবালা? সে কোথায় থাকবে? দ্বারকা পাণ্ডা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে। ননীবালার থাকার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। এখানকার একটি বাঙালি পরিবারের হেফাজতে ও থাকবে। পাথেরপুরায় রাধা কুঞ্জে। তা ছাড়া নবদ্বীপে খবর দেওয়া হয়েছে। কাল ওখান থেকে কেউ না কেউ এসে পড়বেন। তাই এখানে পড়ে থাকা অর্থহীন।

বিছানায় বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছে ননীবালা। অমানুষ, সব অমানুষ। ওকে রাধা কুঞ্জে রেখে দিয়ে সবাই তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন। অসুস্থ মানুষটার কথা কেউ একবার ভাবলেনও না। রাধাকুঞ্জের সেই মালিকের নাম এখনও ভোলেনি ননীবালা। জগদীশপ্রসাদ সিংহ। কৃষ্ণভক্ত মানুষ। পাণ্ডার কাছ থেকে অলৌকিক দর্শনের খবর পেয়ে উনি দৌড়ে গেছিলেন শ্বশুরমশাইকে দেখতে। হাসপাতালে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি উনি রাখেননি। সেই সময়টায় রাধাকুঞ্জের মদনমোহন জীউর মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়েছিল ননীবালা। ও বুঝতে পেরেছিল, সামনে চরম দুর্দিন। হার্ট অ্যাটাক। শ্বশুরমশাইয়ের কিছু হলে নবদ্বীপে ওর জীবন দুর্বিসহ করে দেবেন ভাসুর ও জা।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেহ রাখলেন শ্বশুরমশাই। মুর্দাঘাটে দাহ হয়ে যাওয়ার পরদিন নবদ্বীপ থেকে এসে পৌঁছলেন ভাসুরঠাকুর। ননীবালা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, ও কী করবে? ভাসুরের মুখেই ও শুনতে পায়, মা আর বাবা বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন। ওরা আর ফিরবেন না। স্বাধীন রাষ্ট্রে গিয়ে বাবার এমন ভাল লেগেছে যে, উনি ঢাকায় পাকাপাকি থাকতে চাইছেন। তাই ওখান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নবদ্বীপের স্কুলে তাঁর ইস্তফাপত্র। এই খবরটা শুনে ননীবালার মন আরও ভেঙে গেছিল। ভাসুরকে ও জানিয়ে দিয়েছিল নবদ্বীপে ফিরবে না। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের চরণেই পড়ে থাকবে। জগদীশপ্রসাদ অনেক বুঝিয়েছিলেন, তা হয় না মা। আমি এখানে সারা বছর থাকি না। "তুমি রাধাকুঞ্জে একা থাকবে কী করে?"

ননীবালা মানুষটাকে বাবার আসনে বসিয়েছিল। ডাকতও বাবামশাই বলে। ও আবদার করেছিল, "তাইলে আমারে কলকাতায় নিয়া চলেন বাবা।"

"কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন? তাদের মতামতটাও তো নেওয়া দরকার।"

"কেউ কিছু কইব না। বরং বাঁইচ্যা যাইব।"

জগদীশপ্রসাদ শেষ চেষ্টা করেছিলেন, "তাও ভেবে দেখো মা। তোমার শ্বশুরেরও তো শুনলাম প্রচুর সম্পত্তি। তোমার পাওনা কেন তুমি বুঝে নেবে না?"

"সম্পত্তি আমি চাই না বাবা। অহন গোবিন্দর চরণে পইড়্যা থাইকতে চাই।"

ননীবালা নাছোড়বান্দা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জগদীশপ্রসাদ রাজি হয়েছিলেন ওকে রেখে দিতে। নবদ্বীপে ফিরে যাওয়ার আগে ভাসুর ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাসের মানুষ যদি জিগায় ছোট বউ কই, কী কমু?"

ননীবালা তখন এমন বীতস্পৃহ যে, সাফ জবাব দিয়েছিল, "কইবেন, হরিদ্বারের জলে ডুইব্যা মইর‍্যা গেসে।"

বৃন্দাবনেই রয়ে গেল ননীবালা। মাস আটেক ও রাধাকুঞ্জে থাকতে পেরেছিল। সারাদিন ওর কেটে যেত মদনমোহনের সেবায়। জগদীশপ্রসাদ শীতের সময় কলকাতায় চলে গেলেন। দোলের সময় রাধাকুঞ্জে উদয় হল মূর্তিমান পাপ। জগদীশপ্রসাদের ছেলে রুদ্রপ্রসাদ। বন্ধুদের নিয়ে সে দোল খেলতে এল। তার নজর পড়ল ননীবালার উপর। একদিন রাতে জোর করে ঘরে ঢুকে সে পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ননীবালাকে নষ্ট করে দিল। গায়ের জোরে আটকাতে পারেনি। চিৎকার করে কাউকে ডাকতেও পারেনি। সেই রাতে বিছানায় বসে অশুচি ননীবালা একটা কাজই করেছিল। অক্ষম আক্রোশে রুদ্রপ্রসাদকে অভিশাপ দিয়েছিল। "ব্রাহ্মণ বিধবারে তুই অপবিত্র করলি। তর বাড়িতে মাইয়ারা সবাই বিধবা হইয়া মরব।" পরদিন ভোরেই রাধাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছিল ননীবালা। গত চব্বিশ বছরে আর ওমুখো হয়নি।

পাশের চারপাইয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চাঁপা বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। সেই শব্দে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল ননীবালা। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ছাদের একেবারে মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। বাঁশির সুরটা কেমন যেন ওকে টানতে থাকল। বিছানা ছেড়ে ও নেমে এল ছাদে। আর তখনই একটা অদ্ভুত দৃশ্য ওর চোখে পড়ল। ডানদিকে পাঁচিলের ধার দু'হাত তুলে কে যেন নাচছে। মাথায় জটা। তা হলে আচুকি! ওর শরীরটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে দুলছে। আপনভাবে বিভোর হয়ে ও নেচেই যাচ্ছে। তা হলে কি আচুকিও মোহন বাঁশির সুর শুনতে পেয়েছে? সম্মোহিত হয়ে ননীবালাও ধীর পায়ে আচুকির পিছনে এসে দাঁড়াল।

ননীবালা, "শুনে নে। প্রাণভরে শুনে নে।" নাচতে নাচতে বলল আচুকি। পিছন ফিরে তাকায়নি। তবুও ও বুঝতে পারল কী করে? প্রশ্নটা মনে জাগা মাত্রই আচুকি ফের বলল, "হামি জানতাম, তু আসবি। আজ নিকুঞ্জ বনে তিনি এয়েচেন। বাতাসে কেমুন চন্দনের খুশবু দেকেচিস। ওহ্ হহহ। মেরা জীবন ধন্য হো গয়া রে ননীবালা। আয়, তুও রাধে রাধে বোল। এই সময়টা আর বাপস পাবি না।"

আপনা থেকে দু হাত মাথার উপর উঠে গেল ননীবালার। আচুকির আদেশ যেন অমোঘ। পালন করতেই হবে। ও একটু পাগলাটে। কিন্তু এখানে এসে ননীবালা বুঝতে পারছে, সাধন মার্গে আচুকি অনেক এগিয়ে গেছে। ও যেন অনেক আগে থেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারে। কাল বিকালে মন্দিরে বসে আচুকি বলছিল, আরে মুরখ, তু আগে রাধা মাইয়ের ভজন কর। রাধা মাইয়া হচ্ছে আসল। উনার কিরপা না পেলে গোবিন্দকে তু পাবি না। ব্রজ মাইয়াকে তু আগে সনতুষ্ট কর। তুরা সব উল্টা পাল্টা চলিস।"

ঠিক, ঠিক বলেছে আচুকি। এতদিন ধরে ওকে দেখছে। তবু ওকে চিনতে পারেনি ননীবালা। দু হাত তুলে ঘুরে ঘুরে ও নাচতে শুরু করল। রোজ ভজনাশ্রমেও ওদের এটা করতে হয়। কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে না। আজ আনন্দে ভেসে যেতে যেতে ও নাচতে লাগল। চাঁদটা আরও নীচে নেমে এসেছে। অসম্ভব উজ্জ্বল লাগছে চারদিকটা। সেই রুপোলি আলোয় ননীবালার মনে হল, ছাদে ওরা একা নয়। আরও অনেকেই নাচতে এসেছে। ঝলমলে তাদের পোশাক। পরনে চোলি, ঘাঘরা। চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে উঠছে তাদের ঘাঘরার জরি। ফিসফিস করে আচুকিকে ননীবালা প্রশ্ন করল, "অরা কারা, নাচতাসে?"

আচুকি বিরক্ত, "ইতোদিন বৃন্দাবনে রইলি, আউর তুকে কয়ে দিতে হবে উরা কে? আরে বুরবক, ই সব গোপি আছে।"

ছাদটা ক্রমশই বড় হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের ও পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ওই গুরুকুলের পশ্চিম দিকে। গোপিনীর দল এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাসও। কিন্তু তাদের কোনও কথা শুনতে পাচ্ছে না ননীবালা। গোপিনীদের মধ্যে একজন পড়ে গেছে। তাকে টেনে তুলছে আর একজন। ওরা ফুল নিয়ে লোফালুফি খেলছে। যত দেখছে, ততই অনাবিল একটা আনন্দে ননীবালার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ও যেন পার্থিব ও অপার্থিব জগতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মধ্যে যেন কোনও দুঃখ নেই। কষ্ট নেই। সামনেই সুখের সাগর। ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হল ননীবালার। কিন্তু আচুকির ভয়ে ও দিতে পারল না। যদি চটে ওঠে?

হঠাৎই গোপিনীর দল উল্টোদিকে ছুট লাগাল। বাঁশির শব্দ থেমে গেল। চাঁদ একেবারে সরে গেল পশ্চিম আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল ননীবালা। ক্লান্ত হয়ে কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আচুকি। ও বলল, "ইখানকার পালা হামার শেষ হইয়ে গেল রে ননী।"

কথাটা শুনে ননীবালা স্তম্ভিত। কোনও রকমে ও বলল, "কী কইতাছস তুই?"

"ঠিকই কইচি। ব্রজধামের রজ, গঙ্গা মাইয়ির পানি আর বাবা জগন্নাথের পরসাদ। এই তিনটে হচ্ছে ব্রহ্মবস্তু। বুঝলি? গঙ্গা মাইয়ির পানি নেওয়া হইয়ে গেচে। বৃন্দাবনের রজ এই মেখে নিলাম। আখুন, জগন্নাথের পরসাদ পাওয়ার জন্য মনটা কেমুন করছে রে ননী। ভাবচি, কালই ইখান থেকে পুরীধাম চইলে যাব।"

ননীবালা ছাড়বে না। বলল, "তাইলে আমারে এহানে লইয়া আইলি ক্যান।"

প্রশ্নটা শুনে আচুকি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর বলল, "তরও ডাক আসছে। তুকে লিয়ে ইখানে বহুত ঝনঝাট হবে ননী। আউর এক হপ্তা বাদ তু বুঝতে পারবি। শুন, তুকে ইখানে লিয়ে আলাম, ওই চাঁপার জন্য। ওকে তু দেকবি। আউর হামার ব্রজধানে আসা হবে না রে। ওহহহহহ। আহাহাহহহ। বহুত দিন কাটিয়ে গালাম ইখানে।"

আচুকি অদ্ভুত কথা বলছে। ননীবালা অবাক হয়ে গেল ওর কথা শুনে। বৃন্দাবনে থাকা শক্ত হবে। ওকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট হবে। কেন বলছে, পাগলি এই কথা? ওর ডাক আসবে? কে আছে ওর এই পৃথিবীতে? বেশি জানতে চাইলে আচুকি কিছুই বলবে না। তাই প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য ও বলল, "পুরীতে গিয়া তুই কোনহানে থাকবি?"

"গাছতলায়। আবার কী? আতো ভাবনা করলে চলে? জয়পুর থেকে যেদিন চলে আলাম, সেদিনও ভাবনা করিনি।"

"তোর আর কেউ নাই আচুকি?"

ক্ষেপে গেল পাগলি, "এই শুন, বীতে হুয়ে দিন ইয়াদ করিস না। যো হো গয়া, সো খো গয়া। তু শুয়ে শুয়ে ভাবনা করবি, কে তুর ইজ্জত লিয়েছিল। তুর ধরম হবে? রাধা মাইয়ার ভাবনা কর। তন মন শুদ্ধ হইয়ে যাবে।"

কথাটা শুনে চমকে উঠল ননীবালা। ওর সামনে দাঁড়ানো এ কে? কী করে বলে দিচ্ছে সব গোপন কথাগুলো? ও বলল, "তুই আসলে কে বলত আচুকি?"

"ঢোঙ করিস না। এমুন সব কথা বলিস, মাথা গরুম হইয়ে যায়। চল আখুন শুবি চল। ভোর হইয়ে আলো।"

ওরা ঘরের দিকে দু'পা এগোতেই দেখল, চাঁপা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। কল তলার সামনে ও মুখ চেপে বসে পড়ল। মুখ দিয়ে হড়হড় করে বমি বেরিয়ে আসছে। প্রাণপণ ও চেষ্টা করছে যাতে শব্দ না হয়। এক হাত দিয়ে ও কল খুলল। ননীবালার মুখ দেখে আচুকি বুঝে নিল, চাঁপার কী হয়েছে।

বাঁকেবিহারী মন্দিরে বোধহয় কোনও উৎসব আছে। মন্দিরে ঢোকার গলিতে পৌঁছে সেটা টের পেল রাজা। বেশ ভিড়। দু পাশে ভিখারির দল বসে। বেশিরভাগই বাঙালি বিধবা। ওদের বাংলায় কথা বলতে দেখে লাবণ্যপ্রভা বললেন, বৃন্দাবনে এত ভিখারি কেন রাজা? দেখে খুব খারাপ লাগছে। আমাদের কলকাতায় কিন্তু ভিখারির সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে।"

তীর্থস্থানে ভিখারি থাকবেই। আটকানো যাবেনা। বিধবাদের মধ্যে যারা এখানে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বসে আছে, রাজা জানে তাদের মধ্যে অনেকেরই ভিক্ষা করার কোনও দরকার নেই। তবুও এসে বসে পাঁচ-দশ টাকা রোজগার করার লোভে। ভিক্ষে করাটা প্রায় নেশার মতো হয়ে গেছে অনেকের। বাঁকেবিহারী মন্দিরেই এদের ভিড়টা বেশি। কেননা এই মন্দিরে ধনী মারোয়াড়িরা রোজ পুজো দিতে আসেন। লাবণ্যপ্রভার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলনা রাজা। ও নিজেও পছন্দ করে না, এই ধরনের বিধবাদের। পিছন পিছন মিঠু হেঁটে আসছে। হঠাৎ হাতে টান মেরে দাঁড় করাল। "এই শোনো, ভাবছি, এখানে বিধবাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব। মাকে নিয়ে তো তুমি মন্দিরের ভেতরেই থাকবে। আমি পরে ঢুকছি।"

রাজা বলল, "বেশি দেরি কোরো না। এক্সিট অন্য দিক দিয়ে। পরে ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয়ে যাবে। আমাদের খুঁজে পাবে না।"

ঘাড় নেড়ে মিঠু পিছিয়ে গেল। মন্দিরের দিকে আর কিছুটা এগোতেই রাজা বুঝতে পারল, ভুল দিনে লাবণ্যপ্রভাকে এনেছে। মন্দিরের কাছে জুতো

রাখার খুব ঝামেলা। এই গলিতেই রাজাদের পৈত্রিক মিষ্টির দোকান। মন্দিরে কাউকে সঙ্গে আনলে নিজেদের দোকানে জুতো খুলে রেখে বাকি পথটা রাজা হেঁটে যায়। আজও লাবণ্যপ্রভাকে নিয়ে ও দোকানে উঠে এল।

নবীনভাইয়া দোকান সামলাচ্ছে। পরনের পঞ্জাবিটা ঘামে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। এ অঞ্চলে স্পঞ্জ রসগোল্লা একমাত্র ভাইয়ার দোকানেই পাওয়া যায়। কলকাত্তার এক কারিগরকে নিয়ে এসেছে ভাইয়া। তাই এখন ভাল কাটতি। গরমের দিনে অবশ্য বেশি বিক্রি হয় খাট্টা দই আর মিঠা। শরীর ঠাণ্ডা রাখে। মাঠা অর্থাৎ দইয়ের পাতলা জল। লোকে বড় ডেকচিতে করে নিয়ে যায়। মাঠা বিক্রি করছে চিন্টু। দোকানের পুরনো কর্মচারী।

নবীনভাইয়ার সঙ্গে লাবণ্যপ্রভার পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাজা বলল, "এখানে জুতো খুলে রাখুন। পুজো দিতে হলে কিন্তু রাত ন'টা বেজে যাবে।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "তোমার কোনও অসুবিধে নেই তো বাবা?"

অসুবিধা একটাই। দোকান বন্ধ করার সময় থাকা হবে না। লাডলা আর সুমনকে ফোন করে দিতে হবে। যাতে দোকান বন্ধ করে রাতে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে যায়। এই অসুবিধাটা লাবণ্যপ্রভার জন্য একদিন মেনে নেওয়া যেতে পারে। নিজের মাকে নিয়ে এলেও কি ফেলে চলে যেতে পারত? তাই বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। এসেছেন যখন, পুজো দিয়ে যান।"

জুতো খুলে, হাতে মুখে জল দিয়ে লাবণ্যপ্রভাকে নিয়ে ফের রাস্তায় নামল রাজা। ভিড় কাটিয়ে এগোনোর সময় ও দেখল, একটা ফুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম পাণ্ডা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ওকে দেখেই রাজার ভ্রূটা কুঁচকে গেল। ব্যাটার এত বড় সাহস, থানায় গিয়ে কমপ্লেন করেছে? ওকে একদিন পেটানোর খুব ইচ্ছে রাজার। কিন্তু ধর্মেন্দ্র আটকায়, "তুই বিজনেস করে খাস। রাস্তাঘাটে মারপিট করছিস, ভাল দেখাবে না। বরং ঘনশ্যামকে ইগনোর কর।"

রাস্তাঘাটে হাঁটার খুব একটা অভ্যাস নেই বোধহয় লাবণ্যপ্রভার। উল্টো দিক থেকে আসা লোকের ঠোক্কর খাচ্ছেন। কিছু বদমাইশ লোক আছে ভিড়ের মাঝে এই সুযোগটা নেয়। সেটা লক্ষ্য করেই লাবণ্যপ্রভার হাতটা ধরে রাজা বলল, "ঠিক আমার পিছন পিছন আসুন।"

বৃন্দাবনের অন্য মন্দিরগুলো সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না রাজা। কিন্তু বাঁকেবিহারী মন্দিরে প্রায় আসে বলে ইতিহাসটা ওর জানা। বাঁকেবিহারীকে ও মানেও। রামন রেতির বাজারে যেদিন ও নিজের দোকানটা উদ্বোধন করেছিল, সেদিন এই মন্দিরে এসেই পুজো দিয়ে গেছিল। দোকানটা মন্দ চলছে না। মন্দির সম্পর্কে লাবণ্যপ্রভাকে আন্দাজ দিতে ও একটু পিছিয়ে এসে বলল, "এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। বিগ্রহকে আপনি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাবেন না। আপনাকে ঝাঁকি দর্শন করতে হবে।"

বুঝতে না পেরে লাবণ্যপ্রভা বললেন, "ঝাঁকি দর্শনটা কী বাবা?"

"মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেই সেটা বুঝতে পারবেন। বিগ্রহের সামনে একটা পর্দা টাঙানো থাকে। সেই পর্দা একবার টেনে, বিগ্রহ দেখিয়েই আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রকম চলতেই থাকে। একেবারে মন্দির বন্ধ হওয়া পর্যন্ত।"

"এ ব্যবস্থা কেন?"

"সেটা বলতে পারব না। তবে খুব জাগ্রত দেবতা। আমি বিশ্বাস করি।"

মন্দিরের সামনে পৌঁছে রাজা শুনতে পেল, মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, "আর একটু পরেই মৃদুল কুমার শাস্ত্রীজি আমাদের ভজন শোনাবেন। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।"

মৃদুলের নামটা শোনা মাত্র রাজার মনটা খুশিতে ভরে গেল। ওহ্, আজ এখানে তা হলে মৃদুল এসেছে। তাই এত ভিড়। বহুদিন সামনাসামনি ওর গান শোনা হয়নি। হঠাৎ সেই সুযোগটা এসে গেল। উদ্ভেসিত হয়ে ও লাবণ্যপ্রভাকে বলল, "এই মৃদুল ছেলেটা আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। তখন কিন্তু আমরা কেউ বুঝতে পারিনি, ও এত নামকরা গাইয়ে হবে। এখন শুনি, ওর একটা ক্যাসেট না কি এক কোটির বেশি বিক্রি হয়েছে। এই কয়েকদিন আগে ও আমেরিকা থেকে ঘুরে এল।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "বয়স তো তা হলে বেশি না।"

"একেবারে আমার বয়সী। ওর একটা গান আছে, রাধে রাধে জপে চলো আয়েঙ্গে বিহারী। খুব পপুলার গান। শুনে লোকে পাগলা হয়ে যায়।"

মাইকের হারমোনিয়াম আর তবলার আওয়াজ ভেসে আসছে। তার মানে গান এখুনি শুরু হবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাজা মন্দিরের ভেতর ঢুকে এল। বাইরে থেকে যতটা ভিড় ভেবেছিল, ততটা কিন্তু হয়নি। উঁচু যে বেদিতে বিগ্রহ, তার নীচে একটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দুটো চৌকির উপর গালিচা পাতা। চৌকিতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে রয়েছে মৃদুল। ওর পাশে তবলা নিয়ে একজন। অনেকদিন পর মৃদুলকে দেখল রাজা। এ হে এত মোটা হয়ে গেছে? পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। বেশ সুখি সুখি চেহারা হয়ে গেছে মৃদুলের।

মন্দিরের ভেতরটা বেলি ফুলের গন্ধে ম ম করছে। উঁচু বেদিটা সবুজ পর্দা দিয়ে আড়াল করা। বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তবে ওপর দিকটা ফাঁকা বলে বোঝা যাচ্ছে, পুরো বেদিটা বেলি ফুলের নানা ধরনের নকশা করে সাজানো হয়েছে। রাজা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে লাবণ্যপ্রভার দিকে তাকাল। মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা দেখে বোধহয় উনি একটু অবাকই হয়েছেন। মুখ দেখে তা বুঝতে পারল রাজা। মন্দিরের ভেতর ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি হয় না। দর্শনার্থীরা বেশির ভাগ উচ্চ, বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির। তাঁরা নিজেরাই চাতালে বসে পড়েছেন মৃদুলের গান শোনার জন্য।

দালানের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাজা। এখান থেকে বাঁকে বিহারীর বিগ্রহটা খুব ভাল করে দেখা যায়। হঠাৎই মাইকে নিজের নামটা শুনে চমকে উঠল রাজা। মৃদুল ওকে ঠিক দেখতে পেয়েছে। দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ওকে যেতে বলছে। মৃদুল ওর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে। শ্রোতাদের ও বলল, "অনেক দিন পর আমার বন্ধুকে দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, তখন আমার এই বন্ধুটি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করত। আর আমার কপালে জুটত বলরামের পার্ট। কিছুতেই আমি শ্রীকৃষ্ণের রোল পেতাম না। ভাগ্যিস পাইনি। তাই ভগবান কৃষ্ণকে পাওয়ার ইচ্ছেটা আমার যায়নি। বরং এখন দিনের পর দিন বাড়ছে।"

চাতালে বসা লোকেরা মৃদুলের কথা শুনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রাজার খুব লজ্জা করতে লাগল। সবাই ওকে খুঁজছে। ও লাবণ্যপ্রভার আড়ালে সরে যাবে কী না ভাবছে, এমন সময় মৃদুল মাইকে বলল, "এই রাজা হাতটা একটু তোল না। লোকে তোকে দেখতে চাইছে।"

রাজা হাত তুলে ইঙ্গিত করল, সঙ্গে লোক আছে। ও ওখানে দাঁড়িয়েই গান শুনবে। মৃদুল কী বুঝল কে জানে? আর পীড়াপীড়ি করল না। তবে বলল, "গানের পর তুই কিন্তু চলে যাস না। কথা আছে।" হারমোনিয়ামের রিড টিপে এবার মৃদুল দর্শক শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। জানিয়ে দিল, আজ বাঁকেবিহারীকে দর্শন করার জন্যই ও এসেছিল। এক মাসের জন্য ইউরোপ ট্যুর করতে যাচ্ছে। তাই আশীর্বাদ নিতে এসেছে। মন্দিরের সেবাইতরা অনুরোধ করায় ও মাত্র একটা গান গাইবে।

বাহ্, মৃদুল তো বেশ স্মার্ট হয়ে গেছে। একেকটা কথা বলছে। আর হারমোনিয়ামে মানানসই সুর তুলছে। মন্দিরের ভেতর প্রায় শ' পাঁচেক শ্রোতা একেবারে চুপ। প্রথমে স্তোত্র পাঠ। তারপরই ধরল, ওর জনপ্রিয় গান— রাধে রাধে জপে চলো আয়েঙ্গে বিহারী।' গত বছর থেকে রাস্তা-ঘাটে, উৎসব প্রাঙ্গণে এই গানটা রাজা অনেকবার শুনেছে। কান দিলেও কখনও মন দেয়নি। আজ চোখ বুঁজে, মন দিয়ে ও প্রতিটা শব্দ শুনতে লাগল। রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। বেশ সুন্দর।

'রাধে মেরি চন্দা, চকোর হ্যায় বিহারী।' রাধা রানি মিছরি, তো স্বাদ হ্যায় বিহারী।' মৃদুল একটা করে লাইন গাইছে। আর জনা তিনেক দোহা দিচ্ছে। তাঁদের ভরাট গলায় গমগম করে উঠলমন্দির প্রাঙ্গণ। খিলানে খিলানে যেন সুরতরঙ্গ খেলে বেরাচ্ছে। সেটা দেখার জন্য রাজা চোখ খুলল। আর তখনই ও দেখতে পেল মিঠুকে। প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখা চোখি হতেও মিঠু কিন্তু চোখ সরাল না।

মিঠুর আচরণে একটু অবাক হলেও, রাজা গান শোনায় মন দিল। এমন পরিবেশে ভজন শোনার অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ওর মনে হল, ভজন শোনার সেরা জায়গা হল মন্দির। সুরের আবেশে ক্রমশই রাজা জাগতিক যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে চলে যেতে থাকল। 'রাধা মেরে গঙ্গা, তো ধার হ্যায় বিহারী। রাধা রানি তন হ্যায়, প্রাণ হ্যায় বিহারী।" বাহ, খুব সুন্দর গাইছে তো মৃদুল। স্কুলে যখন পাশাপাশি বসত, তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল, এই ছেলেটা একটা সময় লাখ লাখ লোকের মন জয় করবে? বরং খুব লাজুক প্রকৃতিরই ছিল। কৃষ্ণ ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে তা হলে মানুষ সব কিছু করতে পারে, সব কিছুই হতে পারে।

কলেজে ফণীলাল দ্বিবেদি বলে একজন লেকচারার ছিলেন। প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বলতেন, কৃষ্ণ হলেন লোকের মনগড়া কল্পনা। ঐতিহাসিক চরিত্র নন। কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক কোনও প্রমাণ নেই। অন্তত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ সব কথা শুনে রাজার মতো ছেলেদের খুব মুশকিল হয়ে যেত, স্যারের কথা ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারত না। আবার একেবারে উড়িয়েও দিত না। বাড়িতে ফিরে মাম্মিকে বলত। মাম্মি তখন বলত, এটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার উনি যদি নিজে বিশ্বাস না করেন, তাতে কার কী এসে গেল? দেখবি, এমন একটা দিন আসবে, যেদিন তোদের ওই স্যারই মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে।" মায়ের কথাই

ঠিক হয়েছিল। স্যারের একমাত্র মেয়ে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারল না হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসল। তারপর থেকেই স্যার কেমন যেন বদলে গেল। এখন প্রায় দিন সকালে রাজা কাত্যায়ণী মন্দিরে স্যারকে বসে থাকতে দেখে।

'রাধারানি সাগর, তরঙ্গ হ্যায় বিহারী। রাধারানি নথলি, তো কঙ্কণবিহারী। মৃদুল গাইছে। শ্রোতাদেরও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে বলছে। মন্দিরের ভেতরে মনে হচ্ছে, সুরের মায়া জাল বিস্তার করেছে মৃদুল। রাজাও বিড়বিড় করে গাইতে শুরু করল। ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লাবণ্যপ্রভা। চোখ বুঁজে হাতজোড় করে। নিমীলিত চোখের কোণে জল। ওই আত্মনিবেদিত মুখটা দেখে রাজা চমকে উঠল। জীবনের সব ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-বিষাদ যেন এসে জমা হয়েছে ওই মুখে। বাঁ পাশেই ওর একটা হাত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিঠু। কেন, রাজা বুঝতে পারল না।

এ বার দ্রুত লয়ে গাইতে শুরু করেছে মৃদুল। 'আয়েঙ্গে বিহারী, চলে আয়েঙ্গে বিহারী।' ওর গানের কলিতে যেন বিশ্বাস ঝরে পড়ছে। সত্যি আসবেন। রাধার নাম জপ করলে সত্যি সত্যিই আসবেন বিহারী। হঠাৎই রাজা টের পেল, ওর বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরেছে মিঠু। ওর শরীর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে। ওর স্তনের স্পর্শে সারা শরীরে একটা তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। রাজা নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটু ডান দিকে সরে এল। কিন্তু মিঠু ওকে ছাড়ল না! বরং নিজের দিকে টানল।

এই সময় হাততালির শব্দে রাজার চমক ভাঙল। চৌকি ছেড়ে মৃদুল নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। ওকে ঘিরে একটা বৃত্ত। শাস্ত্রীজি বিগ্রহ দর্শন করে তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। সে জন্য পর্দা একবার টান দিয়ে খুলে, ফের বন্ধ করে দেওয়া হল। পলকের জন্য দর্শন দিলেন বাঁকেবিহারী। শ্বেতশুভ্র বেলি ফুলের মাঝে কৃষ্ণকান্ত বিহারী। পিছন থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'বাঁকেবিহারীজি কী জয়।" সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি বাঁকেবিহারীজি কী জয়।"

মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ঠিক উল্টো দিকে প্রস্থান মার্গ। প্রণাম সেরে সেদিকে এগোতেই মৃদুল সামনে এসে দাঁড়াল। "আরে ইয়ার রাজা, তুই তো আমাকে চিনতেই পারছিস না বলে মনে হচ্ছে।"

রাজা বলল, "চিনতে পারব না কেন? তুই এখন এত নাম করে ফেলেছিস, তোর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই আমার লজ্জা করছে।"

"রাধে রাধে। এত বড় কথা বলিস না ভাই। শুনলাম, তুইও নাকি খুব তড়াক্কি করেছিস?"

"কে বলল তোকে?"

"বড়ি দিদি। সেদিন মথুরায় দেখা হয়েছিল। তোর খবর অবশ্য আরও একজনের মুখে পাই। আমার কাছে গান শিখতে আসে একটা মেয়ে। নাম নেহা। বলে, তোর দোকানে নাকি প্রায়ই যায়। তোর খুবই ঘনিষ্ঠ।"

পাশেই দাঁড়িয়ে মিঠু সব শুনছে। মৃদুলের কী কাণ্ডজ্ঞান নেই? নেহার কথাটা সবার সামনে বলার কী দরকার ছিল? মৃদুল আরও কিছু বলে না বসে, সে জন্য রাজা প্রসঙ্গ ঘোরাল, "তুই ইউরোপ থেকে কবে ফিরবি রে? একদিন আমাদের বাড়িতে আয় না। মাম্মি তোর কথা খুব বলে।"

"যাব। জুলাইয়ের শেষ দিকে ফিরব। তখন একদিন যোগাযোগ করিস। বউকে নিয়েই একদিন তোর বাড়িতে যাব।"

"তুই বিয়ে করেছিস তা তো জানতাম না?"

"মাস ছয়েক হল। তা তুইও করে ফেল। নেহা মেয়েটা খুব ভাল রে। তোর জন্য পাগল একেবারে। বল, তো ঘটকালি করি। ওর বাবা আমার খুব পরিচিত।" বলেই মৃদুল হাসতে লাগল।

রাজা কী বলবে ভেবে পেল না। নেহা মেয়েটা তো আচ্ছা পাকা। নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন কিছু বলেছে, যাতে মৃদুলের ধারণা হয়েছে, ওদের মধ্যে প্রেম চলছে। না, এবার দোকানে এলে নেহাকে একদম পাত্তা দেবে না। ধর্মেন্দ্র ঠিকই বলে, দোষ ওরই। মেয়েদের সঙ্গে এত পীরিত করার তো দরকার নেই। ওদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে গিয়ে আজ রাজা গাড্ডায়। মিঠুর সামনে একেবারে অপদস্থ। মিঠু আর বিশ্বাস করবে ওকে? একদম না। মিঠুর দিকে তাকিয়ে রাজা দেখল, মুখটা গম্ভীর। ওর মনে হল, মৃদুলের সঙ্গে আজ দেখা না হলেই ভাল হত।

উত্তর দেওয়ার হাত থেকে রাজাকে অবশ্য বাঁচিয়ে দিল মৃদুলের সঙ্গী-সাথীরা। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন' বলতে বলতে ওরাই মৃদুলকে নিয়ে চলতে শুরু করল। ভিড়-ভাট্টায় বেরনো যাবে না। তাই রাজা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাঁকি দর্শন চলছে। বাঁদিকে তাকিয়ে ও লাবণ্যপ্রভাকে খুঁজতে লাগল। মন্দিরে ঢোকার পর থেকে উনি একটা কথাও বলেননি। কেমন যেন আত্মস্থ হয়ে আছেন নিজের মধ্যে। ভিড়ের মাঝে চোখ বোলাতে বোলাতে রাজা আবিষ্কার করল, লাবণ্যপ্রভা পুজোর লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

...মন্দিরে আসার সময় মায়ের সঙ্গে পিছনের সিটে বসেছিল মিঠু। বাড়ি ফেরার সময় ও রাজার পাশে এসে বসল। মুখটা ভার ভার। ও নিশ্চয়ই মৃদুলের কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে। এ ক'দিনে যাও একটু কাছাকাছি এসেছিল, আবার দূরে সরে যাবে।

কথাটা ভাবতেই রাজার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

"খুব ভাল দর্শন হল বাবা।" পিছন থেকে লাবণ্যপ্রভা বললেন, কিন্তু রাধার কোনও বিগ্রহ দেখলাম না কেন বলো তো?"

কারণটা রাজা জানে না। তবুও বলল, "বাঁকে বিহারীর মূর্তিটা তৈরি করা নয়। মাটির নীচ থেকে পেয়েছিলেন হরিদাস স্বামী। তানসেনের গুরু। নিধু বন থেকে বিগ্রহটা উনি পান।"

"বাঁকে বিহারীর হাতে বাঁশি নেই কেন বাবা? ভঙ্গিটা এমন, যেন বাঁশি বাজাচ্ছেন। তা হলে বাঁশি থাকবে না কেন?"

রাজা বলল, "বাঁশি আছে। তবে বছরে মাত্র একদিনই বাঁকে বিহারীর হাতে বাঁশিটা দেওয়া হয়। রাস পূর্ণিমার দিন। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? বাঁকে বিহারীর চরণ দুটো ঢাকা। সারা বছর কেউ দেখতে পায় না। মাত্র একটা দিনই ওই দুটো চরণ লোকে দেখতে পায়। জন্মাষ্টমীর দিন।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "বৃন্দাবনের মন্দিরগুলো ঘিরে কত ইতিহাস, তাই না? আজ ইচ্ছে করছে কী জানো, বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে যাই। কী হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে? যা সম্পত্তি আছে, সব ভাগ-বাটোয়ারা করে দেব। মিঠু আর আমার বউমার মধ্যে। আর আমি এখানে বসে বসে ঠাকুরের নাম করব।"

"কলকাত্তা ছেড়ে থাকতে পারবেন?"

লাবণ্যপ্রভা কোনও উত্তর দিলেন না। রাজা একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, "কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম বলে কিছু মনে করলেন না তো?"

"আরে না, না। তুমি ঠিক প্রশ্নটাই করেছ। উত্তরটা আমি খুঁজছিলাম। আমার অনেক পিছুটান বাবা। তুমি সব জানো না। কার অভিশাপে আজ আমার এই অবস্থা, আমি নিজেও তা জানি না। আমার স্বামী অনেকের ক্ষতি করে গেছেন। সেই পাপের ভার এখন আমাকে বইতে হচ্ছে।"

লাবণ্যপ্রভা নিজেদের পারিবারিক কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এই আলোচনা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। রাজা তাই আর কোনও প্রশ্ন করল না। রাত প্রায় ন'টা। এরমধ্যেই বৃন্দাবন শহরটা ঢুলতে শুরু করেছে। গাড়ি চালানোর ফাঁকে রাজা ছকে নিল। পাথেরপুরায় মিঠুদের নামিয়ে দিয়ে একবার ও ভারত সেবাশ্রমে যাবে। ওখানে আজ সকালে এসে উঠেছেন ছোড়দির অফিস কলিগরা। দুপুরে গাড়ি নিয়ে ওরা ঘুরে এসেছেন গোকুল, নন্দগ্রাম আর বর্ষাণায়। রাতে একবার গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। ভারত সেবাশ্রমের গেট রাত দশটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। যে করেই হোক, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে ওকে রেল স্টেশনের কাছে পৌঁছতেই হবে।

রাধাকুঞ্জে পৌঁছনো মাত্রই লাবণ্যপ্রভা বললেন, "রাজা, তুমি কিন্তু চলে যেও না বাবা। ভেতরে এসে মিঠুর সঙ্গে গল্পগুজব করো। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।"

রাজা নামতে চাইছে না। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাটা বাজে দেখায়। তাই ঘুরিয়ে ও জানতে চাইল, "কোনও দরকার আছে?"

মিঠু বলল, "আঃ, এত প্রশ্ন কোরো না তো? আমার মন ভাল নেই। ভেতরে এসো। আমার সঙ্গে তোমায় খানিকক্ষণ গল্প করতে হবে।"

যা, ভারত সেবাশ্রম সংঘে আজ আর তা হলে যাওয়া হবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা গাড়ি থেকে নামল। লাবণ্যপ্রভা ভেতরে ঢুকে গিয়েছেন। মিঠু হাত ধরে টানল, "চলো, ভেতরে চলো। বিকেলে মা রান্না করে রেখেছে। তোমাকে খাওয়াবে বলে।"

এরপর আর না করা যায় না। লাবণ্যপ্রভা তা হলে কষ্ট পাবেন। মিঠুর পিছন পিছন রাজা ভেতরে ঢুকে এল। এতদিন ও রাধাকুঞ্জের বাইরের টুকুই দেখেছে। আজ ভেতরের চৌহদ্দিতে ঢুকল। ভেতরে যে এত ঘর আছে, রাজা ভাবতেও পারেনি। লাবণ্যপ্রভা অবশ্য একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, পুরো বাড়িতে গোটা তিরিশ ঘর খালি পড়ে আছে। এত ঘর তখন কী প্রয়োজনে লাগত, রাজা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। অন্দরমহলে পা দিয়ে ওর মনে হল, কুঞ্জ না বলে এই বাড়িটাকে প্রাসাদ বলা উচিত।

মিঠু বলল, "রাজা, চলো ছাদে যাই। ভাল লাগবে। কাল একা একা বসেছিলাম। খুব বোর লাগছিল।"

গরমের রাতে ছাদে বা উঠোনে চারপাইতে বসে আড্ডা মারা এখানকার রেওয়াজ। রাতে অনেকেই ঘরে শোয় না। বাড়িতে নিজের ঘরে কুলার লাগানোর আগে পর্যন্ত রাজা প্রায়ই ছাদে শুত। মশারির নীচে আরামে ঘুমোত। রাধাকুঞ্জের ছাদটা নিশ্চয়ই বিরাট। আশপাশেও উঁচু কোনও বাড়ি

নেই। মিঠুর পিছন পিছন ছাদে উঠে আসার পর রাজার মনে হল, আরামসে কয়েকটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়ে যায়। পুব আকাশে চাঁদ উঠেছে। দু'দিন আগে পূর্ণিমা চলে গেল। সেই ফিনকি দেওয়া জ্যোৎস্নাটা আজ নেই। ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা গালিচা পাতা। সেখানে গিয়ে দুজনে বসে পড়ল।

মুখোমুখি বসে মিঠু বলল, "আজ খুব টায়ার্ড লাগছে রাজা।" পিছনে দু হাত দিয়ে শরীরের ভর রেখে ও পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল।

রাজা বলল, "অনেক ঘুরেছ বুঝি?"

'অ-নে-ক। দশজনের ইন্টারভিউ নিলাম।"

"সব বিধবার গল্প তো একইরকম, তাই না?"

'প্রায়। তবে একটা জিনিস দেখলাম, এত কষ্ট এখানে, তবু বৃন্দাবন থেকে কেউ নড়তে চায় না। আমি নিজেও বুঝছি জানো, বৃন্দাবনের একটা আলাদা মায়া আছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর ওই যে চারদিকে ভগবানের নাম-গান, এর একটা আলাদা চার্ম আছে। কলকাতায় সারাদিন ধরে অটো আর বাসের হর্ন শুনে শুনে আমাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।"

"কলকাতায় তোমাদের বাড়িটা কোথায় মিঠু?"

"গ্রে স্ট্রিটে। একেবারে মেট্রো স্টেশনের সামনে। কলকাতায় তুমি কখনও গেছ?"

'বারদুয়েক। ছোড়দির শ্বশুরবাড়িতে। নাগেরবাজারে। তা গ্রে স্ট্রিট জায়গাটা কোথায় মিঠু?"

"নর্থ ক্যালকাটায় সিংহিবাড়ি। সবাই চেনে। প্রায় একশো বছরের পুরনো বাড়ি। তবে দেখলে বোঝা যায় না। খান কুড়ি ঘর। লোক নেই। কলকাতায় আমাদের আরও দশ-বারোটা বাড়ি ছিল। অর্ধেক বেচে দিয়েছে বাবা, অর্ধেক আমার দাদা।"

"তোমার বাবা কী করতেন মিঠু?"

"কিছুই না। ধনী বাপের ছেলে। গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। কিন্তু রোজগার করতে শেখেননি।"

"সারা জীবন বাপের পয়সা উড়িয়ে গেছেন। রেস খেলতেন, উওম্যানাইজিং করতেন। কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল, যারা বাবাকে খুব একনাগাড়ে করতেন এসব ব্যাপারে। বাবার দেখাদেখি দাদাও সব শিখল। মা গড়পারের মিস্তিরবাড়ির মেয়ে। বেথুন কলেজে পড়াশুনো করেছেন। বাবাকে আটকাতে পারেনি বটে, কিন্তু দাদাকে চাবকে রাখত। মা শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে আমাদের যা সম্পত্তি আছে, তাও থাকত না।"

"ভেরি স্যাড।"

"এখানকার মন্দিরে মূর্তি আর বাঁশি চুরি নিয়ে তোমাকে আমি থানায় যেতে বললাম। বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাজটা দাদার। দোলের সময় এসেছিল। দুষ্কর্মটা তখনই করে গেছে। হাতে-নাতে শাস্তি---ওই ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট। মা আর আমি পরে আলোচনা করে দেখেছি। মন্দিরের জিনিস আর উদ্ধার করা যাবে না। যাক গে, আমাদের দুঃখের কথা শুনে তুমি কী করবে?"

এই সময় রাজা বলল, "তোমাদের হনুমান মূর্তিটা আমার কাছে আছে।"

মিঠু চমকে উঠে বসল। তারপর বলল, "তার মানে? তোমার কাছে ওই মূর্তিটা কী করে গেল?

"অনেক বড় গল্প। যতটুকু জেনেছি, বলছি। দুপুরে স্টোর রুম থেকে তুমি নেমে যাওয়ার পরই আমি আবিষ্কার করি, তোমাদের মূর্তিটা কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় ওখানে পড়ে রয়েছে। তোমাকে রিকশায় তুলে দেওয়ার পর দোকানে ফিরে আমি লাডলাকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, কিছুই জানে না। সেই সময় সুমন দোকানে ছিল না। ওকেই সন্দেহটা করেছিলাম। ফেরার পর ওকে আলাদা জেরা করতেই আমার মাথায় হাত।" মিঠু জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"লাডলা...যার উপর আমার এত বিশ্বাস ছিল, সে আমাকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করছিল। এতদিন আমি জানতামই না, লাডলা আমার দোকান থেকে দুনম্বরি মালও বিক্রি করে। কী করে ওর হাতে হনুমান মূর্তিটা গেল, সেটা এখনও জানতে পারিনি। একজনকে অবশ্য আমার সন্দেহ হচ্ছে। তবে আমি সিওর নই।"

"কে গো, সে?"

"ঘনশ্যাম পাণ্ডা। বহুদিন আগে যখন দোকানটা আমি স্টার্ট করি, ও তখন আমার সঙ্গে গোপনে একটা ডিল করতে এসেছিল। কিছু অ্যান্টিক মূর্তি মাঝেমধ্যে ও এনে দেবে। আর সেগুলো আমাকে বিক্রি করে দিতে হবে। তখনই বুঝেছিলাম, ফাউল প্লে আছে এর মধ্যে। তাই কড়া ধমক দিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিই। সেই থেকে আমার উপর ওর রাগ অনেক বেড়ে যায়। হয়তো ওই লাডলাকে পাঠিয়েছে। আমার অজান্তে ওই সব মূর্তি বিক্রি করাচ্ছে, দোকান থেকে। কী হতো বলো তো, যদি ওই ঘনশ্যামই পুলিশকে খবর দিয়ে কোনও মাল উদ্ধার করাত আমার দোকান থেকে?"

"তুমি লাডলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছ না কেন?"

"সে তো পালিয়েছে। দুপুরে খেতে যাওয়ার নাম করে সেই যে বেরিয়েছে, তারপর ওর আর কোনও পাত্তা নেই। সুমনকে ওর বাড়ি পাঠালাম। শুনলাম, সে বাড়িতেও যায়নি। উফ, কী বাঁচান বেঁচে গেছি ভাবতেও পারছি না।"

"এখন তা হলে কী করবে?"

"মূর্তিটা আমার গাড়ির ডিকিতে আছে। সেটা তোমাদের পজেশনে আগে দিই। তারপর ভাবা যাবে। আগে আমায় খুজে বের করতে হবে, মূর্তিটা লাডলা পেল কী করে?"

মিঠু বলল, "সব শুনেও আমি তোমায় বলছি, এ আমার দাদার কাজ। হয়তো কাউকে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। সে বিক্রি করতে দিয়েছে তোমার লাডলাকে।"

"হ্যাঁ, এটাও সম্ভব। একটা ভাল শিক্ষা হল আমার আজ। কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। এই ছেলেটার হাতে দিনের পর দিন দোকানের চাবি আমি বিশ্বাস করে ফেলে রেখেছি। কত কী ঝেড়েছে, তার হদিশও করতে পারব না।"

মিঠু বলল, "ছাড়ো তোমার লাডলার কথা। মূর্তিটা পাওয়া গেছে। এখন পুলিশ যদি বাঁশিটা উদ্ধার করে দেয়, ভাল। না পেলেও আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি অন্য কথা বলো?"

"কী শুনতে চাও বলো?"

"ওই যে তোমার গায়ক বন্ধুটা আজ বলে গেল...নেহা না কী নাম যেন মেয়েটার, তোমার জন্য নাকি পাগল?

মজা করার জন্যই রাজা বলল, "লিস্টের মাত্র একজনের নাম তুমি শুনেছ। আরও অনেক আছে। ওয়ান অফ দেম ইজ এ ফরেনার।"

'বাব্বা, তুমি তো দেখছি, খুব বড় মাপের প্রেমিক।"

"হ্যাঁ, বলতে পারো। আমার রেটিং খারাপ না।"

"নিজের উপর খুব আস্থা তোমার তাই না?"

"অস্বীকার করব না। তবে কী জানো, এদের কাউকেই আমি বিয়ে করতে পারব না। তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে কেন? আসলে আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল কলকাত্তার কোনও মেয়েকে আমার বউ করে আনবেন। কিন্তু কলকাত্তার কোনও মেয়ে বৃন্দাবনে আসতেই চায় না। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি কলকাত্তার মেয়ে ছাড়া কাউকে বিয়েই করব না।"

"আমি যদি ঘটকালি করে দিই, কী দেবে?"

"তুমি নিজের জন্য করলে পুরস্কারটা একরকম। অন্যের জন্য করলে একটা ফ্রি রাইড আপ টু তাজমহল ইন ফুলমুন।"

"আমার বয়ে গেছে নিজের জন্য ঘটকালিতে। আমি সুন্দরী, শিক্ষিতা, প্রচুর সম্পত্তির হবু মালকিন। জেনে রাখো, এখনও অনেক ছেলে আমার পিছনে ঘোরে।"

"কলকাতার সব মেয়েই কি তোমার মতো মিঠু?"

"আমার মতো মানে?"

"এই...যাদের পিছন পিছন ছেলেরা ঘোরে? তা হলে মনে হয়, কলকাত্তার মেয়ে আমার কপালে নেই।" রাজা ঠাট্টা করেই বলল কথাটা।

"অত হতাশ হচ্ছ কেন রাজা সোনা? আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে রাখ। ভেবে দেখি তোমার জন্য কী করতে পারি।"

রাজা আরও মজা করে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছাদে উঠে এলেন লাবণ্যপ্রভা। মিঠুর শেষ কথাটা বোধহয় উনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের অ্যাপ্লিকেশন রে মিঠু?"

মিঠু কথা ঘোরাল, "চাকরির মা। রাজা কলকাতায় গিয়ে চাকরি করতে চাইছে। তা শুনে আমি বললাম, আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে রাখ। দেখি, তোমার জন্য কী করতে পারি।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "সে তো খুব ভাল কথা। রাজাকে কলকাতায় নিয়ে চল। আমাদের বাড়িতেই না হয় থাকবে। এখন তোরা নীচে চল। কাজের মেয়েটা খাবার সাজিয়ে বসে আছে। আমি নীচে নামছি। তোদের জন্যই উঠে আসতে হল।"

বলেই লাবণ্যপ্রভা নীচে নামতে শুরু করলেন। গালিচা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাজা বলল, "ব্যস, ঠিক হয়ে গেল। কলকাত্তায় গেলে আমি কিন্তু তোমার ঘরেই থাকব।"

মিঠু বলল, "থাকাচ্ছি।" বলেই ও রাজার হাতে চিমটি কাটল।

সকাল থেকেই নানা কাজে ব্যস্ত বিমলা। দৈনিক জাগরণ কাগজটা পড়ার সময় পাননি। বেলা ন'টা নাগাদ হঠাৎ কাগজটা হাতে নিয়ে ঢুকলেন সুধাময়। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, "খবরটা দেখেছ?"

কাগজে আবার বোধহয় কোনও বাঙালি মেয়ের ধর্ষণের খবর বেরিয়েছে। এসব নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। তাই পড়ার আগ্রহ না দেখিয়ে বিমলা বললেন, "কী খবর?"

"তোমাদের সুষমা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

বিমলা ঠিক বুঝতে পারলেন না কী অ্যাওয়ার্ড। সুষমা কী এমন করেছে যে অ্যাওয়ার্ড পাবে? তাই জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"সমাজসেবার জন্য।"

বিমলা হা করে তাকিয়ে রইলেন সুধাময়ের দিকে। এই তো বছর খানেক আগে সুষমা এল এ বাড়িতে। বাঙালি বিধবাদের জন্য কিছু করতে চায় বলল। এরই মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেল? আর তিনি গত সাত আট বছর ধরে বিধবাদের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। নিজের সংসারটাই ভাল করে দেখার সময় পেলেন না। তিনি কোনও স্বীকৃতি পাবেন না?

সুধাময় কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখো। তা হলেই বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, আমি দাড়ি কামিয়েই বেরিয়ে যাব। বিদ্যুৎ ডেকেছে। ওখানেই ব্রেকফাস্ট।"

স্বামীর জলখাবারের ব্যবস্থা করছিলেন বিমলা। সব উৎসাহ চলে গেল। অ্যাওয়ার্ডের কথাটা মাথায় ঘুরছে। কাগজের ভাঁজ খুলে তিনি খবরটা খুঁজতে লাগলেন। তিনের পৃষ্ঠার তলার দিকে চোখ গেল। হেডিং, সমাজসেবিকা পুরস্কৃত। সুষমার ছবিও বেরিয়েছে। কার হাত থেকে যেন পুরস্কার নিচ্ছে। ছবিটা দেখে বিমলার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। ঈশ্বর নেই। থাকলে এমন অবিচার কখনই হতে দিতেন না। টেবলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিলেন বিমলা। চশমা ছাড়া আজকাল কাগজের খুদে অক্ষরগুলো তিনি পড়তে পারেন না।

খবরটা পুরো পড়ে বিমলা হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। মিথ্যের ছড়াছড়ি। বৃন্দাবনের অসহায় বিধবাদের জন্য সুষমা গৌতমের লড়াই এতদিনে স্বীকৃতি পেল। সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করল ফিকি। বৃন্দাবন নিঃস্ব বিধবাদের জন্য নবনীড় বলে একটা আশ্রম চালাচ্ছেন সুষমা। প্রায় দেড়শোজন বিধবাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ফিকি-র মহিলা বিভাগ তাঁর এই উদ্যোগ দেখে চমৎকৃত। তাই তারা বছরের সেরা মহিলার সম্মান দিল সুষমা গৌতমকে।

ফিকি-র মহিলা বিভাগের সভাপতি দীপা সাহানি পুরস্কার হাতে দিয়ে বলেন, আমরা এতদিন জানতাম, মহিলাদের জন্যই মহিলারা সবথেকে বেশি নিগৃহীত হন। কিন্তু এখানে আমরা এমন একজনকে দেখছি, যিনি মহিলাদের মধ্যে ব্যতিক্রম।" কাগজে সুষমার বক্তব্যও ছাপিয়েছে। ও বলেছে, অনেক কষ্ট করে নবনীড় গড়ে তুলেছে। অনেকেই বাধা দিয়েছেন। এখনও কুৎসা রটাচ্ছেন। কিন্তু ও পিছিয়ে যাবে না। জীবন দিয়ে রক্ষা করবে নবনীড়কে। বিধবাদের জন্য শেষ শক্তিটুকু দিয়ে লড়বে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরো খবরটা দু' বার পড়ার পর একটু একটু করে রাগ হতে থাকল বিমলার। তারপর থম মেরে বসে রইলেন। ফিকি ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংস্থা। তা হলে বেশ বড় গাছে ডাল ধরেছে সুষমা। এরকম একটা সংস্থার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর অর্থ, অনেক বড় বড় লোকের নজরে পড়ে যাওয়া। সুষমা বড় একটা মই ধরে ফেলেছে। এরপর সেই মই বেয়ে আরও উপরে উঠবে। অনেকদিন আগে সুষমা একদিন বলেছিল, ও লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। এই পুরস্কারটা ওকে সাহায্য করবে নমিনেশন পেতে। আমার ঘাড়ে বন্দুকটা রেখে ও চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে। একবারও আমার নামটা করেনি পুরস্কার নেওয়ার সময়। কথাটা ভাবতেই বিমলার মাথা গরম হয়ে গেল।

মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? বিমলা একবার ভাবলেন, ফিকি-র প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখে তিনি সব কথা জানাবেন। পর মুহূর্তেই সেই চিন্তাটা সরিয়ে দিলেন। নাহ, কোনও লাভ নেই। বরং দৈনিক জাগরণের রিপোর্টার সতীশ স্বরূপকে একবার ফোন করে দেখা যাক। ছেলেটা অনেক খোঁজখবর রাখে। কথাটা মনে হতেই তিনি ফোন করলেন সতীশকে। পেয়েও গেলেন এক চান্সে।

"সতীশ তোদের কাগজে সুষমার খবরটা দেখলাম। তুই ছিলিস না কি অ্যাওয়ার্ড ফাংশানে?"

সতীশ বলল, "না বড়দিদি। ফাংশানটা তো হয়েছে দিল্লিতে। খবরটা ওখানকার রিপোর্টাররা করেছে।"

"অ্যাওয়ার্ডটা ওকে কে পাইয়ে দিল রে?"

"শুনেছি সোহিনী গিরি। উনি স্ট্রংলি রেকমন্ড করেছেন।"

"বিধবাদের জন্য সুষমা কী এমন করল যে অ্যাওয়ার্ড পাবে? উল্টে বিধবাদের টাকা মেরে তো ও নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াচ্ছে।"

"আপনাকে কতদিন আগে সাবধান করে দিয়েছিলাম দিদি? তখন আমার কথা আপনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"মানলাম, আমি না হয় ভুল করেছি। কিন্তু যারা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে তারা খোঁজ নেবে না, কাকে দিচ্ছে?"

"ও সব কথা এখন বলে লাভ আছে দিদি? আমার মনে হয়, এখন আপনার চুপ করে থাকা উচিত। সুষমাজির এগেনস্টে কিছু বললে আপনার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। লোকে কিন্তু বলতে শুরু করেছে, বিমলা বাসুকে আগে অ্যাওয়ার্ড না দিয়ে কেন সুষমা গৌতমকে দেওয়া হল?"

কথাটা শুনে মনে মনে খুশি হলেন বিমলা। লোকে তা হলে বলছে। বলাই তো উচিত বৃন্দাবনের সব লোক জানে। কে কতটা আন্তরিক। সতীশ ঠিকই বলেছে। এখন বিমলার চুপ করে থাকাই শ্রেয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সুষমা ফিরেছে?"

"হ্যাঁ। আজ সকালে। বিকেলের দিকে আমাদের সবাইকে মিঠাই খাওয়াবেন বলে ওঁর বাড়িতে ডেকেছেন।"

"ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারবি? নবনীড়ে বিধবাদের সবাইকে কয়েদ করে রেখেছে কেন?"

"কয়েদ করে রেখেছে মানে?"

"আরে, কাউকে বেরোতে দেয় না। ঢুকতেও দেয় না। কলকাতার উইমেন্স ফোরাম থেকে একটা মেয়ে এসেছে। নবনীড়ের দারোয়ান তাকে নাকি ভেতরে ঢুকতেই দেয়নি।"

"দিদি, মেয়েটা উঠেছে কোথায় জানেন?"

"রাধাকুঞ্জে। মেয়েটা তো ক্ষেপে লাল।"

"ঠিক আছে। আমি যোগাযোগ করে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আরেক জনের সম্পর্কে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। দীপালি মণ্ডল। আপনার বাড়িতে মেয়েটাকে আমি দেখেছি। ও একটা জায়গায় আপনার সম্পর্কে খুব খারাপ খারাপ কথা বলে এসেছে।"

"তাই নাকি? কী বলেছে?"

"শুনলে আপনার রাগ হবে। না শোনাই ভাল। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই জানিয়ে রাখলাম। দিদি, ছাড়ি তা হলে?"

"ঠিক আছে।" বলে বিমলা এসে বসলেন কুলারের সামনে। মনের ভার লাঘব করতে গিয়ে তিনি আরেকটা পাথর চাপিয়ে ফেললেন। কী বলে বেড়াচ্ছে দীপালিটা? সতীশ ভুল খবর দেয় না। মাস ছয়েক আগে ফোন করে ও বলেছিল, দিদি, একটা কথা আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছি না। সুষমাজিকে কিন্তু বলবেন না। "অস্ট্রিয়া থেকে একটা মেয়ে এখানে এসে বিধবাদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তুলেছিল, আপনার মনে আছে?"

বিমলা বলেছিলেন, 'কেন মনে থাকবে না? ওই ফিল্মের জন্য মেয়েটা আমার একটা ইন্টারভিউও নিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সেই ফিল্মটার কথাই বলছি। ওই ক্যাসেটটা কি আপনি সুষমা গৌতমকে কোনও সময় দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, কেন রে?"

"ক্যাসেটে আপনার ইন্টারভিউটা ইরেজ করে, সুষমাজি নিজের ইন্টারভিউ লাগিয়ে দিয়েছেন। ক্যাসেটটা আপনি দেখিয়েছিলেন বলে আমার মনে আছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমাদের ফোটোগ্রাফার রবি চর্তুবেদীকে দিয়ে উনি সুপার ইম্পোজের কাজটা করিয়েছেন।"

"তুই এই নতুন ক্যাসেটটা কোথায় দেখলি?"

"দিল্লির এইচ আর ডি মিনিস্ট্রি থেকে একজন অফিসার মথুরায় এসেছেন। সুষমাজি তাঁকে এই ক্যাসেটটা দেখালেন। আমিও ছিলাম। ক্যাসেটে কোথাও আপনি নেই দিদি। পুরো ক্রেডিটটা নিয়ে গেলেন সুষমাজি। উনি অবশ্য জানেন না, জোচ্চুরিটা আমি ধরে ফেলেছি।"

"খুব বাজে মেয়ে তো সুষমা! ওই অফিসারটার নাম কী রে?"

"এন স্বামীনাথন। প্লিজ দিদি, আমার নামটা কিন্তু সুষমাজির কাছে করবেন না।"

"না, না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

এই ক্যাসেট সম্পর্কে পরে সুষমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিমলা। শুনে আকাশ থেকে পড়েছিল সুষমা, "দিদি, কী বলছেন আপনি? আপনার ক্যাসেট আমার ঘরে পড়েই আছে। বিশ্বাস না হয়, দেখবেন চলুন।"

কোন ক্যাসেট সুষমা তখন স্বামীনাথনকে দেখিয়েছে, সেটা ধরা মুশকিল। কিন্তু সে দিন থেকেই বিশ্বাসটা টলে গেছিল সুষমার উপর থেকে। যেমন, আজ বিশ্বাসটা ভেঙে গেল দীপালির উপর। জগতে কারও জন্য কিছু করতে নেই। সবাই উচ্চাকাঙ্খী, লোভী, স্বার্থপর। সুধাময় মাঝেমধ্যে বলেন বটে, এখন বিমলা বুঝতে পারছেন, সেটাই সত্যি। "বিধবাদের পিছনে সময় নষ্ট না করে, তুমি বরং স্কুলটাকে বড় করার চেষ্টা করো। তাতে সমাজের অনেক বেশি উপকার করবে।" কিন্তু বিমলা যে পারেন না। দু চারদিন আড়ালে থাকেন। তারপরই বুকের মাঝখানটায় খা খা করতে থাকে। অসহায় মানুষগুলো যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, অন্যায় অবিচারের কথা বলে, তখন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেন না।

গীতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমলা জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবি?"

"স্বাতীর মা এসেছে। কান্নাকাটি করছে।"

"ওর আবার কী হল?" উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন বিমলা। "উফ্, এরা আমাকে একদণ্ডও সুস্থির থাকতে দেবে না।"

বাইরে চাতালে এসে বিমলা দেখলেন, স্বাতীর মা হাউ হাউ করে কাঁদছে। চৌকিতে বসে স্বাতীর বাবা সুশীল। দু'জনের বয়স বেশি না। চল্লিশের আশ-পাশ হবে। কিন্তু দারিদ্র আর অপুষ্টির ছাপ সারা শরীরে। তাই বয়সটা আরও বেশি মনে হয়। স্বাতীর মা কাজ করে ব্রজবাসীদের বাড়িতে। ঠিকে ঝিয়ের কাজ। সুশীল প্লাম্বার। একদম মাথামোটা। ওকে দেখে মাথায় রাগ চড়ে গেল বিমলার। নিশ্চয় কোথাও কোনও অপকর্ম করে এসেছে। স্বাতীরে মাকে তিনি বললেন, "কী হয়েছে রে মঙ্গলা?"

পায়ের কাছে বসে পড়ল মঙ্গলা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার স্বাতীরে আপনে বাঁচান মা।"

"কী হয়েছে ওর?"

"ঘনশ্যাম পাণ্ডা অরে আটকাইয়া রাখসে।"

"কোথায় আটকে রেখেছে?"

"গোপীনাথ বাজারের একটা বাড়িতে।"

বিমলা ঠিক বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। বছর দেড়েক আগে স্বাতীর বিয়ে দিয়েছিল সুশীল। কারও পরামর্শ না নিয়ে। মেয়েটার বয়স তখন ষোলো সতেরো। পাত্র বংশীবটের দিকে থাকে। কাঠের মিস্ত্রি। বাবা হিন্দুস্তনি, মা বাঙালি। ছেলেটা সম্পর্কে তখন খোঁজখবর নেয়নি। বিয়ের পর জানা গেল, রোজগারপাতি তেমন নেই। ঘনশ্যাম পাণ্ডার খিদমত খাটে আর সারাদিন চুল্লু খায়। বিয়ের সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই স্বাতী বাড়ি ফিরে এসেছিল। তখন ওর মুখে সব শুনে বিমলা যা তা বলেছিলেন সুশীলকে। পোড়া কপাল মেয়েটার। ওর বর এসে ফের ওকে নিয়ে গেছিল বংশীবটে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বাতীর পেটে বাচ্চা। তারপর থেকেই অশান্তি। বাচ্চাটা খুব সুন্দর আর ফর্সা হয়েছে। স্বাতীর বরের বক্তব্য, এত সুন্দর বাচ্চা ওর হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ঘনশ্যাম পাণ্ডার। সে এক নোংরা ব্যাপার। হতেও পারে। ঘনশ্যাম প্রায় দিনই বংশীবটে যেত। স্বাতীকে জোর করে শোয়াতেও পারে। ওর বরকে নিয়ে স্বাতী একবার এ বাড়িতে এসেছিল। তখন ছেলেটাকে দেখেই মনে হয়েছিল, বদমাস টাইপের। বাচ্চা নিয়ে ঝামেলা করায় ঘনশ্যাম প্রচণ্ড পিটুনি দেয় ছেলেটাকে। তখন স্বাতী বাচ্চা নিয়ে বাপেরবাড়িতে চলে আসে।

স্বাতী জেদ ধরে, বংশীবটে আর ফিরে যাবে না। ওর বিয়ের সময় খাট, আলমারি, আর ভরি তিনেক গয়না জোগাড় করে দিয়েছিলেন বিমলা। সেগুলো ওর শ্বশুরবাড়িতেই পড়ে ছিল। ওর বর কিছুতেই সেগুলো ফেরত দেবে না। এ নিয়ে দু বাড়ির মধ্যে খুব অশান্তি চলছিল। এ পর্যন্তই জানতেন বিমলা। থানার ও সি শ্রীবাস্তবকে বলে সব উদ্ধার করার চেষ্টাও করেছিলেন কয়েকদিন আগে। এর মধ্যে ধনশ্যাম পাণ্ডা জুটল কী করে বিমলা বুঝতে পারলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "স্বাতীকে গোপীনাথ বাজারে কী করে নিয়ে গেল রে ঘনশ্যাম?"

মঙ্গলা বলল, "অরে একটা ভাড়া বাড়িতে নিয়া তুলসে।"

"তোরা যেতে দিলি কেন?"

"আমি জানি না মা। কামে গেসিলাম। ফিইর‍্যা আইস্যা হুনলাম, অর বাবা পৌঁছাইয়া দিসে। কন দেহি, এইডা মাইনষের কাম?"

দপ করে জ্বলে উঠলেন বিমলা। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "কী রে সুশীল, তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? মেয়েটাকে বদমাসের হাতে তুলে দিলি?"

সুশীল বলল, "আমি বুঝতে পারি নাই মাইয়ি। আইজই বংশীবট থেইক্যা জিনিস আনার কথা ছিল। ঘনশ্যাম কইল, তর বাড়িতে তো জিনিস রাখার জায়গা নাই। এত জিনিস ঢুকাইবি কই? সত্যই আমার বাড়িতে জায়গা নাই।"

"তখন ঘনশ্যাম ভাড়া বাড়ির কথা বলল?"

"হ। কইল মাইয়াডারে কাছে রাইখ্যা কী করবি? তর খরচা বাড়ব। তার চে আমি একডা বাড়ি ভাড়া কইর‍্যা দিতাসি। তর মাইয়া রে লইয়ায়। অরে আমি নার্সের কাম জুগাড় কইর‍্যা দিমু। নিজে কিছু কইর‍্যা খাক। হেই লইগ্যা স্বাতীরে লইয়া আমি এই বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিলাম।"

সুশীলের কথা শুনে বিমলা থ। বললেন, "তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হবে রে? ঘনশ্যাম বলল, আর তুই বিশ্বাস করে নিলি? মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়ে এলি?"

"আমারে যে কইল, নার্সের কাম দিব?"

"তোর মুণ্ডু। নার্স হতে গেলে ক'বছর ট্রেনিং নিতে হয় তুই জানিস? কত পড়ালেখা জানা মেয়ে নার্স হতে পারছে না। আর তোর মেয়ে তো মুখ্যুর ডিম। ঘনশ্যাম তাকে নার্স করে দেবে? এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?"

বিমলা এত রেগে গেলেন যে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন চেয়ারে। মঙ্গলা এসে পা দুটো জড়িয়ে ধরল, "মা, আপনে স্বাতীরে না বাঁচাইলে মাইয়াডা নষ্ট হইয়া যাইব। আপনে মাথা ঠাণ্ডা করেন।"

"কী বলছিস তুই মঙ্গলা? তোর মেয়েটাই বা কী রকম? বাপের কথায় গিয়ে উঠল ঘনশ্যামের কাছে? তা হলে তোর জামাই তো ঠিক সন্দেহই করেছিল। তোকে বলছি, এর মধ্যে সুশীলও আছে। ঘমশ্যামের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এ্যাই সুশীল, তুই সত্যি কথা বল, না হলে এক পাও আমি নড়ব না। আর যদি স্বীকার না করিস তা হলে থানায় খবর দিচ্ছি। বলব, মেয়েটাকে তুই বিক্রি করে দিয়েছিস।"

বিমলার রণমূর্তি দেখে আর থানার কথা শুনে সুশীল খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। ও বলল, "হ মাইয়ি। নিসি। সকালে তিন হাজার ট্যাহা দিসে। আমারে রিকশা কিনতে অইব। আর প্লাম্বারের কাম করুম না।"

"ছি ছি। তাই বলে তুই মেয়েটাকে ওর মতো পিশাচের হাতে তুলে দিয়ে আসবি? তুই কেমন ধারা বাপ রে?"

মঙ্গলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সুশীল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে বিমলার মনে হল, ঠাস করে এক চড় মারেন। ঘাড় ধরে বের করে দেন বাড়ি থেকে। পরক্ষণেই স্বাতীর কচি মুখটার কথা মনে পড়ল বিমলার। ইস, মেয়েটাকে কিছুদিন ভোগ করেই ঘনশ্যাম বিক্রি করে দেবে অন্য লোকের কাছে। বাপের পাপ। প্রায়শ্চিত্ত করবে মেয়েটা। হাত বদল হতে হতে একটা সময় চলে যাবে মুম্বাইয়ের কোনও বেশ্যাপট্টিতে। ছি ছি। এরা মানুষ? এরা জন্ম দেয় কেন বাচ্চাদের? রাগ সামলে বিমলা ঘরের ভেতর গেলেন। গোপীনাথ বাজারে মেয়েটাকে আনতে একা যাওয়া ঠিক হবে না। ঘমশ্যামের দলবল আছে।

বৃন্দাবন থানায় ফোন করে বিমলা ও সি-কে ধরতে পারলেন না। শ্রীবাস্তব রাউন্ডে বেরিয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে ঘনশ্যাম যদি সর্বনাশ করে দেয় মেয়েটার? সে কথা মনে হতেই বিমলা ফোনে ধরলেন রাজাকে। বললেন, "লালা, তুই এখুনি একবার আসতে পারবি গোপীনাথ বাজারে?"

রাজা জিজ্ঞেস করল, "কা ব্যাপার বড়ি দিদি?"

"এখন বলার সময় নেই। তুই স্কুটারে করে চলে আয়। মিঠাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস। আমি যাচ্ছি।" বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখলেন বিমলা। তারপর বাইরে বেরিয়ে সুশীলকে বললেন, "মেয়েটা কোন বাড়িতে আছে আমাকে দেখাবি চল।"

সুশীল বেঁকে বসল, "না মাইয়ি, আমি যামু না। ঘনশ্যাম আমারে কাইট্যা ফেলব। আমারে কইয়া দিসে বাড়িডা কাউরে দেখাইবি না। আপনের কথা জানলে আমারে মাইর‍্যা ফেলবে।"

বিমলা রেগে বললেন, "তোর মরে যাওয়াই উচিত। যে বাপ তার মেয়েকে বেচে দেয়, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এই মঙ্গলা, তুই আমার সঙ্গে থানায় চল তো।

এজাহার দিবি, তোর মেয়েকে ও বেচে দিয়েছে। তারপর দেখছি, সুশীলকে কে বাঁচিয়ে রাখে।"

ভয় দেখানোয় কাজ হল। সুশীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি দূর থেইক্যা দেখামু। কাছে যাম না।"

"চল, তাই চল। এই মঙ্গলা, তোর ভাসুর কোথায় থাকে যেন?"

"গোপীনগর কলোনিতে।"

"সেখানে তুই চলে যা। আমি স্বাতীকে নিয়ে যাচ্ছি। তোর বাড়িতে

রাখলে ফের ঘনশ্যাম ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।"

এই বয়সেও নিজে স্কুটার চালান বিমলা। সুশীলকে পিছনের সিটে বসিয়ে তিনি ছুটলেন গোপীনাথ বাজারের দিকে। মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে? মেয়েকে বিক্রি করে দিয়ে এসে বলে কী না, বুঝতে পারি নাই? কথাটা মনে হতেই চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। সুষমা হলে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিত। আর আমি? বোকা কোথাকার। স্কুটারের পিছনে বসিয়ে ওর মেয়েটাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। কথাটা মনে হতেই বিমলা নিজেকে ধিক্কার দিলেন।

বেলা এখন সাড়ে দশটা। রাস্তায় বেশ গরম। হঠাৎই বিমলা দেখলেন, লউ বাজারের দিক থেকে সীমা এদিকে আসছে। হাতে বাজারের থলে। স্কুটার থামিয়ে বিমলা বেশ জোর গলায় ডাকলেন, "সীমা, এই সীমা।"

ডাক শুনে হাসিমুখে এগিয়ে এল সীমা। বলল, "দিদি কোথায় চললেন?"

"একটা কাজে। খবর কী বল। আজ কাগজটা দেখেছিস?"

সীমা ঠাট্টা করে বলল, "দেখেছি। সুষমা দেবি জিন্দাবাদ।"

"আজ নাকি ওর বাড়িতে সংবর্ধনা?"

"হ্যাঁ। আপনি যাবেন?"

"তোর মাথা খারাপ? আমি যাব কোন আনন্দে? আমাকে ও নেমন্তন্নই করেনি।"

"না করলেও আপনার যাওয়া উচিত দিদি।"

এই সেদিন নবনীড়ের মিটিংয়ে যেতে মানা করেছিল সীমা। আজ যেতে বলছে। তা হলে সীমাও ভিড়ে গেল ওদিকে? কেন যেতে বলছে সুষমার বাড়িতে? প্রশ্নটা করতেই সীমা বলল, "দিদি, সেদিন মিটিংয়ে গিয়ে একটা জিনিস বুঝেছিলাম। ও সবাইকে বুঝিয়েছে, আপনি ওকে ঈর্ষা করেন। অনেকে দেখলাম বেশ কনভিন্সড! আপনি আজ গেলে সবার ভুল ধারণাটা ভাঙবে।"

বিমলা বললেন, "কে কী ভাবল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না রে সীমা। আমি তো ভাবছি, নবনীড়ের কমিটি থেকে রিজাইন করব। সুষমাদের মতো ফ্রডদের সঙ্গে থাকব না।"

"আমার কর্তা একই কথা বলছে। জানেন দিদি, আমিও ভাবছি ওখানে থাকা আর উচিত হবে না। কবে কীসে জড়িয়ে দেবে কে জানে?"

"নবনীড় আমার একটা ড্রিম প্রোজেক্ট ছিল। সুষমা সেটা নষ্ট করে দিল।"

সীমা হঠাৎ বলল, "সুরদাস কৌশলকে আপনি চেনেন দিদি?"

"না রে। তবে কাগজে প্রায়ই নামটাম দেখি। ভদ্রলোক কুম্ভ মেলায় কী যেন একটা ঝামেলায় ফেঁসে গেছিলেন।"

"ঠিক ধরেছেন, সেই ভদ্রলোকই। খুব পাওয়ারফুল লোক। এখন বিধবাদের পেনশন দেওয়ার ব্যাপারটা কৌশলই দেখাশুনো করছেন। সুষমার হাত থেকে ওই দায়িত্বটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। খবরটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

"এই ভদ্রলোক কোথায় থাকে জানিস?"

"আমার কর্তা বলতে পারবে। সম্ভবত মোতি বাগ এলাকায়।"

"ঠিক আছে! খবরটা দিয়ে ভাল করলি। চলি রে।আমি এখন একটা রেসকিউ অপারেশনে যাচ্ছি।"

"দিদি আপনি পারেনও বটে, নানা ঝামেলায় জড়াতে।"

হাসিমুখে বিমলা স্কুটারে ফের স্টার্ট দিলেন। এই সুরদাস কৌশল লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। বৃন্দাবনে যদি কেউ সুষমাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, তা হলে সে এই লোকটাই। সীমার সঙ্গে দেখা না হলে বিমলা জানতেই পারতেন না, সুষমার ডানা ছেঁটে দেওয়া হ য়েছে। নিশ্চয় কেউ কোনও কিছু লাগিয়েছে প্রশাসনে। সকালের দিকে বিমলা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করছিলেন, খবরের কাগজটা দেখে। এখন একটু একটু করে যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

"মাইয়ি, ওই যে হইলদা রঙের বাড়িডা।" গোপীনাথ বাজারে ঢোকার মুখেই সুশীল বলে উঠল, "আমারে নামাইয়া দ্যান। আমি যাই।"

বিমলা স্কুটার থামাতেই লাফ দিয়ে নেমে সুশীল পালাল। আর তখনই সামনে এসে দাঁড়াল রাজা। ওর চোখে মুখে উদ্বেগ। জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বড়িদিদি?"

"আমার সঙ্গে আয় তা হলেই বুঝতে পারবি।"

হলুদ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই যে ছেলেটা বেরিয়ে এল, তাকে চিনতে পারলেন বিমলা। দীনদয়াল গৌতম। স্কুলের এইট্থির ব্যাচ। বিমলা বললেন, "দীনা, তুই? এটা তোর বাড়ি নাকি রে?"

সমান অবাক দীনদয়ালও! বলল, "না, এটা আমার নানির বাড়ি। তা বড়িদিদি, আপনি এখানে কী মনে করে? আসুন, আগে ভেতরে আসুন।"

রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন বিমলা। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "দীনা, তোর এই নানির বাড়িতে আজ কেউ ভাড়া এসেছে?"

"হ্যাঁ, আজই এল। ওই যে ডান দিকের ঘরটায়। নানি এ বাড়িতে একা থাকেন। ভাড়ার টাকায় কোনও রকমে বেঁচে আছেন! কিন্তু এ সব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন "বড়িদিদি?"

"কারণ আছে।" কথা বলেই বিমলা ডান পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে বেশ উঁচু স্বরে ডাকলেন, "স্বাতী, এই স্বাতী। তুই বেরিয়ে আয়। আমি বিমলা মাইয়ি।"

কেউ বেরিয়ে এল না। ঘরের ভেতর হাসাহাসির শব্দ। জানলা দিয়ে রান্নার ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে। বোধহয় ফোড়ন দিয়েছে। বিমলা বুঝতে পারলেন না, এত বড় সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও স্বাতী বেরিয়ে আসছে না কেন? হাত-পা বেঁধে ঘনশ্যাম ওকে ফেলে রেখেছে নাকি? আরও জোরে তিনি স্বাতীকে ডাকতে লাগলেন।

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি পর ঘর থেকে উদয় হল ঘনশ্যাম। ছেলেটা প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। ফর্সা টিকটকে চেহারা। এখানকার ব্রজবাসীরা প্রায় সবাই সুপুরুষ হয়। ঘনশ্যামও ব্যতিক্রম নয়। দেখে বোঝার উপায় নেই, ছেলেটা এক নম্বরের বদমাস। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে ঘনশ্যাম বলল, "স্বাতী আসবে না মাইয়ি। আপনি বেকার চিল্লামিল্লি করছেন।"

কথাগুলো ও এমন ভাবে বলল, যেন কোনও অপরাধই করেনি। বিমলা ধমক দিয়ে বললেন, "স্বাতীকে আটকে রেখেছ কেন? জানো, আমি পুলিশ ডেকে আনতে পারি? আমাকে ভেতরে যেতে দাও। না হলে তুমি খুব মুশকিলে পড়বে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, "যান, মাইয়ি, আপনি ভেতরে যান। কেউ ওকে আটকে রাখেনি। ভেতরে গিয়ে আপনি কথা বলুন না ওর সঙ্গে?"

বিমলা ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। এক কোণে বসে স্টোভে রান্না করছে স্বাতী। খাটে ওর বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। ওর চোখ মুখে উদ্বেগের কোনও ছাপই নেই। বরং ওকে দেখে মনে হল, ঘরকন্না গুছিয়ে এই মাত্র ও রান্না চাপিয়েছে। বিমলা কড়া গলায় বললেন, "এই চল। আমি তোকে নিতে এসেছি। তোর বাবা মা আমার বাড়িতে বসে রয়েছে। শিগগির বেরিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

স্বাতী খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে, স্টোভ থেকে কড়াইটা নামাল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না মাইয়ি। আমি যামু না। তুমি যাও।"

"কী বলছিস কী তুই?" বিমলা অবাক হয়ে বললেন, "পাগলামি করিস না মা। এই লোকটা তোর সর্বনাশ করে দেবে।"

স্বাতী এবার খুব বিশ্রী ভাবে বলল, "আমার ব্যাপারে নাক গলাইতাছ ক্যান? তোমার স্বভাবডা খুব খারাপ মাইয়ি। যাও, এহান থেইক্যা চইল্যা যাও। আমাগো বিরক্ত কইরো না।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে বিমলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আজ দ্বিতীয়বার তিনি পরাজয়ের স্বাদ পেলেন।

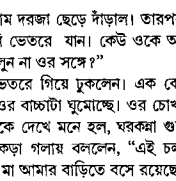

কাল বিকালে আশ্রমে ফেরার সময় একটা পোস্ট কার্ড কিনে এনেছিল ননীবালা। চাঁপার বাড়িতে চিঠি পাঠানোর জন্য। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও চাঁপাকে ডাকল, "এ্যাই ছেমড়ি, ওঠ। দাদার কাছে চিঠি পাঠাইবি না?"

ধড়মড় করে উঠে ননীবালাকে দেখে চাঁপা ফের শুয়ে পড়ল। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। দেখেই মনে হচ্ছে, মেয়েটা ভাল নেই। সেদিন ভোর বেলায় কলতালায় ওকে বমি করতে দেখেই ননীবালা বুঝে গেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর কিছু দিনের মধ্যে মেয়েটা ধরা পড়ে যাবে। ওর কপালে কী লেখা আছে, কে জানে? বৃন্দাবনে এ রকম অনেক মেয়ের কপাল পুড়তে দেখেছে ননীবালা। অনেক ঘটনার সাক্ষী। অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল গোঁসাই-মোহান্তদের লোভের শিকার হয়ে।

চাঁপা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। চিঠি লেখানোর জন্য কোনও আগ্রহই দেখাচ্ছে না। একটু অবাক হয়েই ননীবালা বলল, "কি রে ছেমড়ি, চিঠিতে কী

লিখুম ক।"

তবুও চাঁপা উত্তর দেয় না। দু'তিন বার জিজ্ঞেস করার পর ননীবালা টের পেল উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে চাঁপা কাঁদছে। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল, "না লিখতে অইব না।"

"ক্যান?"

"এই প্যাট লইয়া দাদার কাছে মুখ দেখামু কী কইরা?"

কথাটা শুনে ননীবালা চমকে উঠল। সত্যিই, এ কথাটা তো মনে হয়নি! ভরা পেট নিয়ে ও দেশে যাবে কী করে? সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই ঠাকুরের উপর প্রচণ্ড রাগ হল। শয়তানের বাচ্চা। ভণ্ড লোকটাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া উচিত না। বিমলা মাইয়ির কাছে গিয়ে সব ঘটনাটা বলতে হবে। লোকটার শাস্তি হওয়া দরকার। তারপর চাঁপার একটা গতি করা যাবে।

চাঁপা পাশ ফিরেই শুয়ে আছে। ওকে বিরক্ত না করে ননীবালা বেরিয়ে এল। এত ভোরে কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। আশ্রমে যারা থাকে, তারা বেশিরভাগই অশক্ত, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষ। তাদের অনেককেই জন্মা, চাঁপা, কনকরা চান করিয়ে দেয়। পায়খানা করিয়ে দেয়। তবে কাউকে খাইয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেটা নিজেরাই পারে। ননীবালা এমনও দেখেছে, খেয়ে উঠে একটু সময় পরেই ভুলে যায়, খেয়েছে কী না? তখন য্যান য্যান করে, "অ চাঁপা, অ কনক, আইজ আমারে খাইতে দিলি না ক্যান? সব তরা নিজেরা খাইয়া ফেললি?"

এই যেমন পারুল বুড়ি। গত দু'দিন ধরে পারুল বুড়ি ননীবালার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। সেদিন কী কুক্ষণে কথায় কথায় সবার সামনে ও বলে ফেলেছিল, লউবাজারে প্রচুর আম উঠেছে। দামও বেশি না। ব্যস, তারপর থেকে পারুল বুড়ি মাথা খেয়ে ফেলছে, "অ ননীবালা, আমায় দুটো আম এনে দে না। কদ্দিন খাইনি।"

জয়ামঞ্জরী সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ ঝামটা দিয়ে ও বলে উঠেছিল, "আম কী গাছ থেইক্যা পাইড়া আনব? পয়সা লাগব না?"

পারুল বুড়ি তখন বলেছিল, "আমার কাছে এক ট্যাকা আচে। দুটো আম হয়ে যাবে। অ ননীবালা, তুই আম নে আয়। আমি ট্যাকা দিয়ে দেব। ট্যাকার ভয় আমায় দেখাস নে।"

শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। প্রায়ই পারুল বুড়ি টাকার গরম দেখায়। ওর কাছে একটা পয়সাও কেউ কোনও দিন দেখেনি। তবু ওর কথা শুনে মনে হয়, যখন তখন প্রচুর টাকা ও বের করে দিতে পারে। এক টাকায় এখন আর দুটো আম কেনা যায় না। কথাটা বিশ্বাস করেনি পারুল বুড়ি। বরানগরের বাজারে এক টাকায় এক ঝুড়ি আম পাওয়া যেত। আমের এত দাম বাড়ে কী করে? গত দুদিন ধরে ননীবালা আশ্রমে ফেরা মাত্র লাঠি ভর দিয়ে টুকটুক করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পারুল বুড়ি। জানতে চেয়েছে, "এনেচিস, আম? আজও ভুলে গেলি?"

ননীবালা ঠিক করে রেখেছে, আজ আম কিনে ও আনবেই। মনে রাখার জন্য দরকার হলে আঁচলে আজ গিঁট দিয়ে বেরোবে। ভজনাশ্রম থেকে পাওয়া ছ'টা টাকা ওর কাছে আছে। গোটা তিনেক আম তাতে হয়ে যাবে। বুড়ো মানুষ। একটা জিনিস খাওয়ার জন্য আবদার ধরেছে। কবে বলতে কবে মরে যাবে। অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরবে। কী দরকার, দোষের ভাগী হয়ে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই ও স্নানের ঘরে ঢুকল।

সাধনার কাছে পারুল বুড়ি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে ননীবালা। "ওর ছেলে থাকে কলকাতায়। আগে বছরে একবার করে আসত। মায়ের সঙ্গে দেখা করে টাকা দিয়ে যেত। তারপর কী যেন একটা ঝামেলা হল। ছেলে বৃন্দাবনে আসা বন্ধ করে দিল। সেদিন সাধনা বলছিল, পারুল বুড়িকে অনেকদিন ধরে চিনি। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম। পাটনাওয়ালি কুঞ্জে। বরাবরই ক্ষ্যাপাটে মার্কা মেয়েছেলে। বুঝলে, ওর ঘরে কোনওদিন কাউকে ঢুকতে দেবে না। আগে রোজ ভিক্ষে করতে বেরুত। তখন দরজায় তালা লাগিয়ে যেত। আমরা হাসাহাসি করতুম। ঘরে মণি-মাণিক্য আছে বোধহয়। নইলে কেন এত রাখঢাক।"

সত্যি সত্যি টাকা পয়সা আছে না কি? প্রশ্নটা উঠতেই সাধনা হাসে। "তোমার মাথা খারাপ দিদি? আসলে খুব পিটপিটে। ছুচিবাই আছে। এই কারণেই তো ছেলের বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে পারল না। বামুনের ঘরের বেধবা। ওদের কত আচার কানুন। পেরথম পেরথম আমরা দূর থেকে দেখতুম। দেখে ভক্তি হত। তারপর তো সব আচার কানুন চুলোয় গেল। এখেনে ওর বিছানায় গিয়ে একদিন বোসো। দেখবে, তিড়বিড় করে উঠবে। এখন তো তাও কমেচে। শরীরটা বেঁকে গেচে। নাওয়া-হাগা সব করিয়ে দিতে হয়। মাঝে একটা সময় খেতে পেত না। গোঁসাইকে বলে আমি এনে তুললুম এখেনে।"

এ সব শুনে চাঁপার মতো, "পারুল বুড়ির উপরও খুব মায়া পড়ে গেছে ননীবালার। আশ্রমের অন্যরা মাঝে মধ্যে ওর উপর বিরক্ত হয়। তখন ননীবালা উপযাচক হয়ে বলেছে, ছাড়েন না দিদি, ক'দিনই বা বাঁচব? দুষ নিয়েন না।"

তখন এই সাধনাই বক্রোক্তি করেছে, "নতুন এয়েচ, তাই এ কথা কইচ। দিন কয়েক থাকো, তকন বুইঝতে পারবে, বুড়ি কেমনধারা মানুষ।"

ইদানীং মনটা খুব বিক্ষিপ্ত ননীবালার। এই চাঁপার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। তারপরেই রাগ হচ্ছে গোঁসাই ঠাকুরের উপর। খানিক পরে পারুল বুড়ি এসে উদয় হয় মনে। যতক্ষণ বাইরে থাকে, ভাল থাকে। যতক্ষণ আচুকি কাছে থাকে, কথা বলে, ততক্ষণ ভাল লাগে। আগে বিমলা মাইয়ির ওখানে একদিন না গেলে মনে হত কী না বাকি রয়ে গেছে। এখন যেতেই ইচ্ছে করে না। আশ্রমে আসার পর থেকে ওর মনের ভেতর অনেক বদল হয়ে গেছে।

বলা যায়, সেদিন সেই বাঁশির সুর শোনার পর থেকেই এই পরিবর্তন। শৃঙ্গার বটে থাকার সময় আশ পাশের কোনও কিছুতেই ওর মনে প্রতিক্রিয়া হত না। গরীব গুর্বো কিছু মানুষের ঘেরাটোপে বাস করে ননীবালা অভ্যস্ত হয়ে গেছিল নির্দিষ্ট একটা জীবনযাত্রায়। ওখানে ও অনেক উদাসীন থাকতে পারত। এখানে পারছে না। জড়িয়ে পড়ছে। আর পাঁচটা মানুষ, যাদের সঙ্গে ওর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, এই কিছুদিন আগেও ও যাদের চিনত না, সেই লোকগুলো ওকে খুব ভাবাচ্ছে। হঠাৎই ননীবালার মনে হল, গত দু'দিন ও গোবিন্দর মন্দিরে যায়নি। বিকেল হলেই মন টানে আশ্রমের দিকে। হঠাৎ ওর এ কী হল, ননীবালা বুঝতে পারছে না।

এ ক'দিনই আশ্রমের সবার আদ্যপান্ত ওর জানা হয়ে গেছে। এই সাধনা। ওর স্বামীর ছিল মাছের ব্যবসা। কলকাতার হাতিবাগান বাজারে দোকান ছিল। তিন দিনের জ্বরে লোকটা মরে গেল। তারপর ওকে ঘাড় ধরে একদিন বাড়ি থেকে বের করে দিল ওর শাশুড়ি। এই মলিনা। স্বামী মরে যাওয়ার পর ছেলেরা ততদিন ভাল ব্যবহার করেছিল, যতদিন কাগজপত্রে সম্পত্তি ও লিখে দেয়নি। তারপর ওরা একদিন পাণ্ডার সঙ্গে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিল। বলল, সংসারে অশান্তি না বাড়িয়ে ওখানে গিয়ে পড়ে থাকো। এই করালী। স্বামী মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে মানুষ করেছিল মেয়েকে। ধার দেনা করে সেই মেয়ের বিয়ে দিল। জামাইটা এমন, কুমন্তর দিয়ে মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই বিষিয়ে দিল। রাগে, দুঃখে করালী বৃন্দাবনে চলে এল। আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। আশ্রমে প্রত্যেকের পিছনেই এক একটা গল্প। এক টা দুঃখের ইতিহাস! ননীবালা এ সব জানতে পারে, যখন ওরা চিঠি লেখাতে আসে। পরামর্শ নেয়।

নিশ্চিন্তে স্নান সেরে ননীবালা নীচে নেমে এল। আজকাল সকালে ভজনাশ্রমে যাওয়ার আগে ও কিছুক্ষণ রাধামাধবের মন্দিরের দালানে বসে জপ করে যায়। জয়া, কনকরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই। আজ খানিকক্ষণ জপ করার পর ননীবালা দেখল, পাশে এসে বসেছে আচুকি। চোখা চোখি হতেই বলল, "কাল হামি চলে যাচ্ছি রে।"

ননীবালা জিজ্ঞাসা করল, "কোনহানে যাবি?"

"ওই যে সেদিন তুকে কইলাম, জগন্নাথ ধাম।"

হ্যাঁ, গত পূর্ণিমার রাতে আচুকি বলেছিল বটে। কথাটা মনে পড়তেই ননীবালার মন খারাপ হয়ে গেল। এ আশ্রমে আচুকিই ওকে টেনে এনেছিল। ও থাকবে না। তখন কী ননীবালার থাকতে আর ভাল লাগবে? কিছু না ভেবেই ও জিজ্ঞেস করল, "তুই কবে ফিইর‍্যা আইবি?"

"দেখি, যবে ব্রজমাঈ টানে।"

"তাইলে চাঁপার কী অইব, ভাবছস? তুই তো চইল্যা যাইবি।"

খিঁচিয়ে উঠল আচুকি, "হামি ভাবার কে রে? গোবিন্দ আচেন। কাল গোঁসাই ঠাকুরকে হামি খুব ডেটেছি। কইলাম, তু মাইয়াটারে বরবাদ করে দিলি কেন? তুকে হামি শাপ দিব। তু বহুত বুড়া আদমি আচিস।"

ননীবালার জপ বন্ধ হয়ে গেল শুনে। কোনও রকমে শ্বাস নিয়ে ও বলল, "শুইন্যা গোঁসাই কী কইল?"

"কী কইবে? হামার পা চেইপে ধরল। কইল কেউ যেন না জানে। তো হামি কইলাম, যা চাঁপারে পরিষ্কার কইরে আন। আজ শায়দ নার্সিং হোমে লিয়ে যাবে।"

দালান দিয়ে খর পায়ে হেঁটে আসছে জয়ামঞ্জরী। ওকে দেখে চুপ করে গেল আচুকি। ননীবালা জপে আর মনই বসাতে পারল না। উঠে ও বাইরে বেরিয়ে এল। উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে বলতে লাগল, হে গোবিন্দ, চাঁপারে রক্ষা করো। গর্ভপাত, মহাপাপ। মাইয়াডার কুনও দুষ নাই। তুমি তো সবই জানো, চাঁপারে, ফিরাইয়া আইনো। গর্ভ নষ্ট করতে গিয়ে কত মেয়ে মারা যায়! সে রকম কিছু যেন চাঁপার না হয়। এই প্রথম রাস্তায় বেরিয়ে ননীবালার মনে হল, কোথাও ও যাওয়ার নেই।

অন্য দিন ভজনাশ্রমে যাওয়ার তাড়া থাকে। টোকেন নেওয়ার জন্য ব্যস্ততাও। আজ মনে হল, দুটো টাকা আর এক মুঠো চাল-ডাল নেওয়ার জন্য ভণ্ডামি করে লাভ আছে? বৃন্দাবন-মথুরা রোডে এসে ও উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। না, আজ আর ভজনাশ্রমের দিকে যাবে না। গোবিন্দ মন্দিরের চাতালে গি য়ে বসে থাকবে।

খারাপ লাগছে। খুবই খারাপ লাগছে। গোবিন্দকে ও যত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে, ততই তিনি জড়িয়ে দিচ্ছেন নানা জাগতিক সমস্যায়। না, ননীবালা আর ভাববেই না। চাঁপা কে, যে ওর কথা ভাবতে হবে? পরক্ষণে চাঁপার মায়া মাখানো মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মনটা ডুকরে উঠল। আহা রে।

গঙ্গা ভবনের কাছাকাছি পৌঁছতেই ননীবালা দেখল, পাতোদিয়া ধর্মশালার রোয়াকে বসে আছে ভানুমতী। খুলনার লোক। নিজে ওপার বাংলার বলে ভানুমতীকে খুব পছন্দ করে ননীবালা। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু' দণ্ড কথা বলে মনের ভারটা আপাতত কাটানো যাবে। ভানুমতী থাকে সেবাকুঞ্জের দিকে। দেড়শো টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে। ওর মধ্যে লোভ-টোভ কম। হ্যাংলামি নেই। বৃন্দাবনের আর পাঁচটা বিধবার থেকে একটু আলাদা। সামনা সামনি হতে ননীবালা ধর্মশালার রোয়াক দেখিয়ে ভানুমতীকে বলল, "আহেন দিদি, দু'দণ্ড জিরাইয়া লই।"

দু'জনে পাশাপাশি বসে পড়ল। কুশল বিনিময়ের পর ভানুমতী জিজ্ঞেস করল, "আপনে পেনছনের কার্ড পাইছেন নাহি দিদি?"

পেনশনের কথাটা এই ক'দিন আগেও কে যেন বলেছিল। তখন ননীবালা পাত্তা দেয়নি। সবাই সত্যি কথা বলে না। পাছে নিজে বাদ পড়ে যায়, কিছু পাওয়া থেকে। ভানুমতী অবশ্য সে প্রকৃতির মানুষ না। ওপার বাংলার লোক বলে অনেক সহজ সরল। ননীবালা সরাসরিই জিজ্ঞেস করল, "আপনে পাইসেন নাহি দিদি?"

"হ। এই দেহেন।" বলে ঝুলি থেকে ছোট্ট একটা আইডেনটিটি কার্ড বের করে আনল ভানুমতী।

তাতে ছবি লাগানো দেখে ননীবালা বলল, "আপনের ছবি তুলসিল নাহি?"

"হ। ট্যাহাও দিসে। দ্যাড়শত ট্যাহা। অহন তেইক্যা ইংরাজি মাহের চাইর তারিহে ট্যাহা দিব।"

দেড়শো টাকা! মন্দ কী? অনেকের ঘর ভাড়াটা উঠে যাবে। ননীবালার কৌতূহল বেড়ে গেল। ও বলল, "ট্যাহা কোনহান থেইক্যা আনতাসেন দিদি?"

"ক্যান ব্যাঙ্ক? পাস বই কইর‍্যা দিসে। টিপসই দিলে ট্যাহা পাইয়া যাই। ম্যানেজারেরে কইয়া দিসি, আমার ট্যাহা আপনে জমা রাহেন। অহন নিমু না। মইর‍্যা গেলে তহন দিবেন। এহানে আমাগো কেউ নাই। মইর‍্যা গেলে শরীরীডারে কেউ য্যান যমনায়। ফ্যালাইয়া না দেয়। দাহ করে। এক মুঠা রজ দেয়। কী কন দিদি, ভাল করসি না?"

শুনে চিন্তা হল ননীবালার। ভানুমতী তবু নিজের একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওর তো সে সঙ্গতিও নেই। আজ যদি হঠাৎ মরে যায়, তা হলে? এতদিন এই চিন্তাটা ওর মাথায় আসেনি। টাকা পয়সা জমানোর কথা কখনও ও ভাবেনি। একটা আশঙ্কা থেকে ও জিজ্ঞেস করল, "আপনের এই পেনছনের ব্যবস্থা কে কইর‍্যা দিসে দিদি? আমাগো অইব না?"

"সুরদাস কৌছল। নাম শুনছেন বাবাজির? মোতি বাগে আশ্রম করসেন। হের বাসায় গিয়াই তো আমরা ছবি তুললাম।"

সুরদাস কৌশলকে ননীবালা চেনে না। নামটাও কোনওদিন শোনেনি। ও বলল, "বিমলা মাইয়িরে জিগাইলে চিনব?"

"মনে হয়, চিনব।" কথাটা বলেই উঠে পড়ে ভানুমতী। তারপর বলল, "ওঠেন দিদি, আমি বজরঙ্গ ধর্মশালায় যামু। ওহানে আইজ আম দিব।"

আমের কথা শুনে ননীবালার হঠাৎই পারুল বুড়ির কথা মনে পড়ল। দু'চারটে আম নিয়ে গেলে খুব খুশি হবে বেচারি। তাই ও বলল, "চলেন আমিও যাই।"

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ওরা ধর্মশালায় পৌঁছল। বাইরে রোয়াকে দশ বারো জনের ভিড়। তার মানে, আম বিতরণের খবরটা ছড়ায়নি। চেনা কারও সঙ্গে বোধহয় দেখা হয়েছে। ভানুমতী অন্য দিকে গিয়ে কথা বলছে। হঠাৎ ননীবালার চোখ গেল ধর্মশালার ভেতরে। দালানের দিকে। বড় একটা দাড়ি পাল্লা টাঙানো রয়েছে। এক পাশে আমের ঝুড়ি। দৃশ্যটা দেখেই ননীবালা বুঝে গেল, কী হতে যাচ্ছে। শেঠদের কেউ বোধহয় অসুস্থ। তার আরোগ্য কামনায় এই আম বিতরণ। একদিকে পাল্লায় অসুস্থ মানুষটিকে বসানো হবে। অন্যদিকে চাপানো হবে সমান ওজনের ঝুড়ি ঝুড়ি আম। এই আমই বিলি করা হবে গরীব দুঃখীদের মধ্যে।

দাড়ি পাল্লাটা দেখেই ননীবালার অস্বস্তি হতে লাগল। এ সব জায়গায় ও সাধারণত আসতে চায় না। কেন জানে না, ওর মনে হয়, দানের জিনিসপত্তর যারা নেয়, রোগ তাদের শরীরে ঢুকে যায়। আর অসুস্থ লোকটা ধীরে ধীরে ভাল হতে থাকে। ননীবালার একবার মনে হল, উঠে যায়। পরক্ষণেই ইচ্ছেটা ও চাপা দিল। রোদ্দুরে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। আশপাশে কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। যেতে হলে, সেই বাঁকেবিহারী কলোনি। অনেকটা দূর। তাই চুপ করে রোয়াকে বসে ও অন্যদের কথা শুনতে লাগল।

কলকাতায় বোধহয় ভোট। সে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজনের মধ্যে। একজন সদ্য এসেছে কৃষ্ণনগর থেকে। মুখে এক গাদা দাড়ি-গোঁফ। সে-ই মূল বক্তা। কাগজে পড়েছে, ভোট হয়ে যাওয়ার পর নাকি গরমেন্ট থেকে এখানে লোক এসে জনে জনে জানতে চাইবে। বিধবারা দেশে ফিরে যেতে চায় কী না? গরমেন্ট থেকে বাড়ি করে দেবে। সেখানে নিয়ে, তোলা হবে বিধবাদের। কেউ বিশ্বাস করল কথাটা। কেউ করল না। বক্তা অসন্তুষ্ট, গরমেন্টের সম্মান রাখতে পারল না বলে। এবার বেশ রেগে কথা বলছে। নিন্দে করছে বৃন্দাবনের বাঙালিদের।

লোকটা কথা শেষ করার আগেই রোয়াকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। আমের ঝুড়ি নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান। এবার বিলি শুরু হবে। এক লাফে দাড়ি-গোঁফওয়ালা একেবারে লাইনের সামনে চলে গেল। যেন সব ফস্কে যাবে। এই লোকগুলোকে দেখলে ননীবালা বিরক্ত হয়। আরে জোয়ান শক্ত সমর্থ মানুষ তোরা। কেন দানের জিনিস নিতে আসবি আমাদের মতো? কেন ভাগ বসাবি আমাদের লাইনে? কেন কাজ করে খাবি না রে? প্রশ্নগুলো পাক খেতে থাকে মনে।

ননীবালা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ততা দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমের ঝুড়িগুলো ও আগেই দেখেছে। একেক জনকে দশ বারোটা করে দিলেও শেষ হবে না। একেক জন কোঁচড় ভর্তি করে আম নিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে কোনও দোকানে সেই আম রেখে এসে ফের লাইনে দাঁড়াচ্ছে। দারোয়ানটা হাসছে ওদের কাণ্ড দেখে। পাশ ফিরে একজনকে ও বলল, "ইয়ে বাঙালি লোগ, কাঙালি য্যায়সা হ্যায়।" শুনে ননীবালার খুব বিচ্ছিরি লাগল। লাইনের একেবারে সামনে এসে ও আঁজলা পেতে দাঁড়াল। না, দুটো বেশির আম ও নেবে না। দারোয়ানটা অন্তত বুঝুক, ও কাঙালি না।

আম দুটো জপের ঝুলিতে ফেলে ননীবালা হাঁটা দিল গোবিন্দর মন্দিরের দিকে। ফের চাঁপার কথা মনে হচ্ছে। আশ্রমে ফিরে ওকে আর দেখতে পাবে কী না, কে জানে? এত ক্ষণে গোঁসাই নিশ্চয়ই চাঁপাকে নিয়ে গেছে নার্সিংহোমে। মেয়েটা ভালয় ভালয় ফিরে এলে হয়। গর্ভপাত করানোর সময় কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। কথাটা ভাবতেই ননীবালার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আশ্চর্য, অতখানি হেঁটে মন্দিরের কাছাকাছি আসার পর হঠাৎই ওর মন টানতে শুরু করল আশ্রমের দিকে। নিশ্চয়ই কোনও খারাপ কিছু হয়েছে। সেটা শোনার জন প্রস্তুত হয়েই ননীবালা দ্রুত পায়ে গুরুকুলের দিকে হাঁটতে লাগল।

বেলা দশটা নাগাদ আশ্রমে পৌঁছে ননীবালা দেখল, নীচের হলঘরে পারুল বুড়ি জবুথুবু হয়ে বসে। দু'হাঁটুর মাঝখান থেকে মুখটা তুলে ও বলল, " জানিস, আজ আমায় এরা খেতে দেয়নে। ডেকে ডেকে গলা ব্যথা হয়ে গেল। চাঁপা নীচে নামচেই না।"

ননীবালা বুঝে গেল, চাঁপা তা হলে নেই। ও না থাক, জয়া বা কনক, নিশ্চয়ই পারুল বুড়িকে খেতে দিয়েছে। বুড়ির মনে নেই। প্রায়ই ও এ রকম করে। একটা কথা হঠাৎ হঠাৎ ওর মাথায় ঢুকে যায়। সারা দিন সেই কথাটা বলে যাবে। কাল যেমন বারবার একই কথা বলে গেছে, "জানিস, দু'দিন আমার পাইখানা হয়নে। খেতে দেয়নে। পাইখানা হবে কোত্থেকে?" শেষে জয়ামঞ্জিরী খুব কড়া ধমক দেওয়ায় পারুল বুড়ি চুপ করে।

বুড়িকে চুপ করানোর জন্যই ননীবালা ঝুলি থেকে আম দুটো বের করে ওর হাতে দিল। দেখে কী খুশি! "সেদিন তোকে ট্যাকা দিলুম। আজ আননি? ভাল করেচিস মা। রাধামাধব তোকে সুখি করুক।" পুরু চশমার ফাঁকে উজ্জ্বল দুটো চোখ। ফোকলা গালে হাসি। পারুল বুড়ি বলল, "এখনই খেয়েনি। নইলে সাধনাটা চোর। আম দুটো ঠিক বের করে নেবে, যেকানেই রাকি।"

পারুল বুড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ননীবালা উপরে উঠে এল। এ কথাটা কানে গেলে সাধনা খুব রেগে যাবে। কিন্তু পারুল বুড়ি এ রকমই। এই যে বলল, 'সেদিন তোকে ট্যাকা দিলুম', আদৌও দেয়নি। টাকা দেওয়ার কথা একবার বলেছিল। তবে আম কিনে এনে দেওয়ার পর। অন্য কেউ হলে রেগে যেত। ননীবালা রাগল না। একটা মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। এদের উপর রাগ করে কী হবে?

ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল ননীবালা। চাঁপা শুয়ে আছে। তা হলে নার্সিং

হোমে যায়নি? নাকি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে? ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে ও ভাল করে তাকাল চাঁপার দিকে। গভীর ঘুমে ডুবে আছে! হয়তো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। ওকে বিরক্ত না করে ননীবালা কলতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। আজ প্রায় দিন পনেরো হল ও এই আশ্রমে এসেছে। কখনও দুপুরের এই সময়টায় আশ্রমে থাকেনি। হাতে অখণ্ড অবসর। তাই ও বই নিয়ে বসল। আশ্রমের অফিস ঘরে কাচের শো কেসে অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। সুযোগ পেলেই ননীবালা একেকটা বই নিয়ে আসে। দু'দিন আগে ও নিয়ে এসেছিল শ্রীকৃষ্ণ লীলা উপাখ্যান। বসে বসে ও পড়তে লাগল।

বেলা একটা নাগাদ কনক এসে বলে গেল, নীচে খাবার তৈরি। ইচ্ছে হলে খেয়ে আসতে পারে। বই বন্ধ করে, বালিশের তলায় রেখে ননীবালা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে একে একে সবাই নীচে নামছে। এমন সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পারুল বুড়ি বলল, "অ ননীবালা, তোর আমগুলো এত তিতে কেন রে? কষটা কষটা লাগছে। কী আম কিনে আনলি?"

শুনে বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে উঠল ননীবালার। অসুস্থ মানুষকে পাল্লায় চাপিয়ে দেওয়া আম। বুড়িকে এনে না দিলেই ও ভাল করত। দৃষ্টিশক্তি ভাল না। পারুল বুড়ি ঠাওর করতে পারছে না, ঘরের ভেতরে কেউ আছে কী না। কোনও উত্তর না পেয়ে ও টুকটুক করে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

আশ্রমে দুপুরে খাওয়া বলতে ভাত, ডাল আর আলু ভাজা। পাতলা জলের মতো ডাল। তাই চেটেপুটে খাচ্ছে সবাই। বাড়তি ভাত চাইলেই কনক বিরক্ত, "যা দিসি, খাইয়া উইঠা যাও। আইজ সব ঝামেলা আমার উপর চাপাইয়া দিসে। তোমাগো লইয়া আর পারি না। এত লুকে মরে, তোমরা মরতে পার না?"

খেতে খেতে ননীবালা প্রশ্ন করে, "জয়ামঞ্জিরীরে আইজ দেহি না যে?"

"শ্যাঠের বাড়িতে গেছে। গোঁসাই ঠাকুরের লগে। পাঠ আসে মথুরায়।"

"ও, গোঁসাই ঠাকুর তা হলে ভাগবত পাঠ করতে গেছে শেঠের বাড়িতে। চাঁপাকে নিয়ে নার্সিংহোমে যায়নি! কৌতূহল মেটাতেই ননীবালা জিজ্ঞেস করল, "জয়া আইব কহন?"

"আইব। টাইম হইলেই আইব। শ্যাঠের বাড়ি না খাওয়াইয়া কী আর ছাড়ব? অগো আইতে আইতে বিহান হইয়া যাইব। না, আর বকবক কইরো না। বাসনডা মাইজ্যা দিয়া যাইও। আমি হগলের বাসন মাইজতে পারুম না।"

খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর ননীবালা নিজে সবার বাসন নিয়ে বসল। কনক এতটা আশা করেনি। নিজে চট করে খাওয়া শেষ করে ও বলল, "তোমার মতো বুঝদার যদি হগলে অইত, তাইলে আমাগো কষ্ট অইত না। কেউ একটা কুটা নাড়ব না। কও দেহি, এই ভাবে আশ্রম চলে?"

ননীবালা ঘনিষ্ঠ হয়, "এহানে কবে আইস কনক?"

"হইল গিয়া দুই বৎসর।"

"ভাল লাগতাসে?"

"গোঁসাই ঠাকুরের স্যাবার জন্য আইসি। ভাল লাগব না? সোয়ামী ঘর থেইক্যা বাইর কইর‍্যা দিল। আরেকডা বিয়া করসে! আমি যাই কোনহানে। রোইজ মাইরধর করে। একদিন মনে মনে কইলাম, দুত্তোর! দু'চোখ যেহানে যায়, চইল্যা যামু।

"কোনহানে ছিল তোমার বাড়ি?"

"রিষড়া। চেনো নাহি? হাওড়া টিশন থেইক্যা যাইতে হয়। আল ধইর‍্যা টিশনের দিকে আইতাসি, দেহি এক মন্দিরে পূজা পাঠ হইতাসে। ঠাকুরের নাম কীর্তন করত্যাসেন গোঁসাই ঠাকুর। রূপ দেইখ্যা চক্ষু জুড়াইয়া গেল। পাঠ শুনতে শুনতে মনে হইল, গোঁসাই ঠাকুরের পা দু'হান জড়াইয়া ধরি।"

বাসন মাজতে মাজতে ননীবালা কনকের কথা শুনছে, "তারপর?"

"পাঠ হইয়া গেলে তাই করলাম। গাঁয়ের লোকেরা গোঁসাই ঠাকুররে কইল, বাবা এই মাইয়াডা অভাগী। হেরে আপনের চরণে স্থান দ্যান। গোঁসাই ঠাকুর আমারে জিগাইলেন, বৃন্দাবনে যাবি? আমারে স্যাবা করতে অইব, পারবি? কইলাম, পারুম ঠাকুর। আমারে আপনে নিয়ে চলেন। যা কইবেন, করুম।"

"তারপরই চইল্যা আইলা?"

"না। রিষড়া থেইক্যা আমরা গেলাম নবদ্বীপ। গোঁসাই ঠাকুর দীক্ষা দিলেন। গেরুয়া দিলেন। কইলেন, আইজ থেইক্যা তর নাম কনকমঞ্জরী। অহন, তর এই দেহডা হইল মন্দিরের মতো। মন্দিরের যেমন সব সময় সুন্দর আর পরিষ্কার রাখতে হয়, তেমনই তর এই দেহডারে সব সময় সাজাইয়া গুজাইয়া রাখবি। হেই দিন থেইক্যা গোঁসাই ঠাকুরের স্যাবায় লাইগ্যা গেলাম।"

"জয়া তহন ছিল না?"

মুখে একটা পান ফেলে দিয়ে কনক বলল, "না, ও তহন এহানে। গোঁসাই ঠাকুর যহন এহানে থাকেন, তহন এক দিন জয়ামঞ্জরী মন্দিরের কাজ করে। আর একদিন গোঁসাই ঠাকুরের স্যাবা করি আমি। পালা কইর‍্যা করি। আমরা দুইজনেই গোঁসাই ঠাকুরের স্যাবাদাসী।"

"তোমাগো কী করতে হয়?"

"গোঁসাই ঠাকুরের সব কিছু করাইয়া দেই। চান করাইয়া দেই। সারা গায়ে চন্দন মাখাইয়া দেই। কহনও গোঁসাই ঠাকুরের মনের মতো কইর‍্যা সাজাই। কহনও উনি গোপাল হইয়া যান। কহনও কৃষ্ণ। কহনও আমাগো লগে খেলা করেন। যা চান, তাই করি। আমরা গোঁসাই ঠাকুরের সখী না। আমরা স্যাবাদাসী। আমাগো নামের লগে মঞ্জরী। অনেকে গুলাইয়া ফ্যালে।"

বাসনগুলো জলে ধুতে ধুতে ননীবালা বলে, "দ্যাশের কথা মনে হয় না?"

"না গো। ভুইল্যা গেসি। গোঁসাই ঠাকুর আমারে আনন্দে রাখসেন। ভগমান এই দেহডা দিসেন সুখের জন্য। ভোগের জন্য। কিচ্ছুসাধনের জন্য না। আমরা হইলাম গিয়া রাধা মাধবী ছপ্রদায়। আমাগো নিয়ম আলাদা। হত্য কথা কই ননীবালা, গোঁসাই ঠাকুর হইলেন গিয়া রাধামাধব। অঁরে ছাইড়া আমরা এক মুহূর্ত বাঁচুম না।"

কনকের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ননীবালার বাসন মাজা শেষ। রাগে গা জ্বলছে মেয়েটার কথা শুনে। ও যা বলছে, সত্যিই কি তা বিশ্বাস করে? নাকি প্রবল বলশালী এক পুরুষের কাছ থেকে অবাধ শারীরিক তৃপ্তি পাওয়ার তাগিদে কনক কথাগুলো বলে যাচ্ছে। ননীবালা নিজেও একদিন যৌবনবতী ছিল। পুরুষের চোখে অনেক লালসা ও দেখেছে। ধরা দিলে সুখেই থাকত। কিন্তু ও বিশ্বাস করে না, ভোগের মাধ্যমে গোবিন্দকে পাওয়া সম্ভব। ধর্মের নামে এ তো পরিষ্কার যৌনাচার। কনকরা লেখাপড়া জানে না। গোঁসাই ঠাকুর যা বলেছে, বিশ্বাস করে বসে আছে।

বাসন গুছিয়ে রেখে ননীবালা একটু পরেই উপরে উঠে এল। ছাদের একেবারে ডান দিকের ঘরটা পারুল বুড়ির। সেই ঘরে উঁকি মেরে ও দেখল, বুড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে ভেবে ননীবালা আর ওকে ডাকল না। একটু আগে বড় বড় দুটো আম খেয়েছে। পেট ভরা আছে। বুড়ি একটু ঘুমোক। নিশ্চিন্তে ও নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

দেখল, চাঁপা চুপ করে বিছানার উপর বসে আছে। প্রথম প্রশ্নটাই ননীবালা করল, "কী রে, গোঁসাই তরে নার্সিংহোমে নিয়া যায় নাই?"

চাঁপা মুখ ফিরিয়ে বলল, "নিয়া যাইতে চাইসিল। আমি যাই নাই।"

"ক্যান?" ননীবালার গলা থেকে বিস্ময় ঝরে পড়ে।

"অনেক ভাইব্যা দ্যাখলাম মাসি। প্যাটের হেইডা আমি নষ্ট করুম না। আমি বিয়াম।"

কথাটা শুনে ননীবালা ধপ করে চৌকির উপর বসে পড়ল।

বিকেল বেলায় রাধাকুঞ্জে গিয়ে রাজা দেখল, বাইরের ঘরে আসর জমিয়ে বসেছে কানাই পাণ্ডা। গোল টেবলের একদিকে লাবণ্যপ্রভা আর মিঠু। অন্য দিকে কানাই পাণ্ডা, আর এক ভদ্রলোক। ওকে দেখেই লাবণ্যপ্রভা বললেন, "এসো বাবা, আমার পাশে এসে বসো। কানাই পাণ্ডা আজ খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন।"

লাবণ্যপ্রভার পাশে গিয়ে রাজা বসার ফাঁকেই কানাই পাণ্ডা বলল, "আমরা পাণ্ডা না মা। যারা পিণ্ডদানের পয়সায় সংসার চালায়, তারা পাণ্ডা। এদের আপনি পাবেন গয়ায়। আমরা হলাম ব্রজবাসী। খোদ ব্রজের মানুষ।"

লাবণ্যপ্রভা ইষৎ বিব্রত হয়ে বললেন, "দোষ নেবেন না বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে।"

"না, না, মনে করব কেন? এই ভুলটা সবাই করে। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডাদের তফাত গুলিয়ে ফেলে। পাণ্ডারা কী চায় জানেন মা? লোকে তাড়াতাড়ি মরে যাক। তা হলে আত্মীয়স্বজনরা পিণ্ড দিতে যাবে। ওদের রোজগার হবে। আর আমরা ঠিক উল্টোটা চাই। আমরা চাই মানুষ অনেক দিন বাঁচুক। যতদিন বাঁচবে, তত বেশি বার সে তীর্থ করতে আসবে।"

মিঠু বলল, "বাহ আপনি ভাল বলেছেন তো?"

কানাই পাণ্ডা হাসল, "আমরা যজমানদের পয়সায় সংসার চালাই। যজমান কাদের বলে জানেন তো মা? লিয়ে দিয়ে রাখে মান, তার নাম

যজমান।"

"আপনার কত যজমান আছে?"

"তিন হাজারের মতো তো হবেই। আমি দিদি বাঙালির দেওয়া ভাত খেয়ে বড় হয়েছি। এখনও খাচ্ছি। আমার বাবা, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা— আমাদের সাত পুরুষ যজমানি করেছে। আমাদের সবাই চেনে এক ডাকে।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "আপনার বাবাকে আমি দেখেছি। খুব লম্বা, পুরুষালি চেহারার লোক ছিলেন। বছরে একবার করে উনি কলকাতায় যেতেন। আমার শ্বশুর মশাই ওকে খুব মান্য করতেন।"

"জানি মা। আপনার শ্বশুরমশাই শ্রী জগদীশপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। নানা ব্যাপারে উনি পরামর্শ নিতেন। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের বাবা নৃসিংহপ্রসাদ সিংহ নামী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর বাবার নাম ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ। তাঁর বাবা গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ। আপনার শ্বশুরবাড়ির সাতপুরুষের নাম আমরা বলে যেতে পারি।"

রাজা দেখল, মিঠুর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। আজ ও খুব সেজেছে। দুপুরে হঠাৎ ফোন করে বলল, বিকেলে নিধু বন দেখতে যাবে। রাজা তাই ওকে নিতে এসেছে। এখনই বেরিয়ে না গেলে নিধু বন দেখানো সম্ভব হবে না। কেননা সন্ধে সাড়ে ছ'টার পর ওখানে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কানাই পাণ্ডা যেভাবে জমিয়ে বসেছে, তাতে খুব তাড়াতাড়ি উঠবে বলে মনে হয় না। রাজা একবার মিঠুকে ইশারা করল উঠ পড়ার জন্য। কিন্তু ও পাণ্ডাই দিল না। উল্টে কানাই পাণ্ডাকে বলল, "মাই গড, আমি তো দাদুর বাবার নামটাও জানতাম না। আপনি আমাদের সাত পুরুষের নাম বলে যেতে পারবেন?"

কানাই পাণ্ডা বলল, " জানি বলেই তো বললাম দিদি। শুধু আপনাদেরটা নয়, আমার যত যজমান আছে, প্রত্যেকের বংশ তালিকা আমি বলে যেতে পারি।"

"এত মনে রাখেন কী করে?"

"আপনি তো এম ও পাশ দিয়েছেন দিদি। আপনি অত মোটা মোটা বই সব মনে রেখেছেন কী করে?"

মিঠুকে জব্দ করে কানাই পাণ্ডা হাসল, লাবণ্যপ্রভা বললেন, "আপনার আরও দুই ভাই ছিল না? তারা কী করে?"

"একজন আমাদের লাইনে আছে। আমার মেজভাই। ওর যজমানরা সব তিলি সম্প্রদায়ের। আমাদের সব ভাগ ভাগ আছে মা। আমার যেমন যজমানরা সব উচ্চ বর্ণের। আমার ছোটভাই আমাদের লাইনে আসেনি। ও হোটেল খুলেছে রঙ্গনাথজির মন্দিরের সামনে। আমাদের কাছে তীর্থযাত্রীরা যারা আসেন, ওর হোটেলে নিয়ে তুলি। ভালই চালাচ্ছে।"

লাবণ্যপ্রভা বাড়িতে দু'জন কাজের মেয়ে রেখেছেন। একজন এসে টেবিলে সন্দেশ আর ঠাণ্ডাই রেখে গেল। সন্দেশ খেতে খেতে কানাই পাণ্ডা বলল, "মা, আপনি সেই যে এলেন, তারপর তো আর বেরলেনই না। চলুন, একবার ব্রজ পরিক্রমা করিয়ে আনি। কথায় আছে না, যে না করে বন, তার কিসের বৃন্দাবন?"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "যাবো বাবা, একটু গুছিয়ে নিই। তারপর যাবো। এখন আছি এখানে কিছুদিন।"

মিঠু জিজ্ঞাসা করল, "ব্রজ পরিক্রমা করে কী হয় মাম?"

কানাই পাণ্ডা বলল, "মানব জনম সার্থক হয় দিদি। শাস্ত্রে আছে, চুরাশি লক্ষ যোনি ভোগ করে মানুষ জন্মায়। তার সঙ্গে মিল রেখেই ব্রজ পরিক্রমায় আপনাকে চুরাশি ক্রোশ পার হতে হবে। চুরাশি কেন, ওটা তো আশিও হতে পারত। তা হবে না। চুরাশি সংখ্যায় একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে। আপনি মেপে দেখুন, আপনার বডির হাইট ঠিক চুরাশি আঙুল। এক আঙুল কম বা বেশি হবে না।"

মিঠু অবিশ্বাসী গলায় বলল, "যাঃ তাই হয় নাকি? প্রত্যেক মানুষের হাইট চুরাশি আঙুল?"

"বিশ্বাস না হয় মেপে দেখুন। হতেই হবে। আঙুলগুলো হরাইজেন্টালি মাপবেন।"

"কাল মেপে দেখব তো।"

"যদি না হয়, তা হলে আমার নামে বেড়াল পুষবেন দিদি। আপনাররা আজকালকার মেয়ে। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন। আছেন। থাকবেন। এই বৃন্দাবন তো কালের গর্ভে প্রায় হারিয়েই গেছিল। আপনাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যরা এসেই, এই বৃন্দাবনকে জগতের সামনে তুলে ধরলেন। এসব কথা আপনাদের জানা উচিত দিদি।"

"জানি। এখানে এসে ইসকনের মন্দির দেখতে গেছিলাম। ওখান থেকে একটা বই কিনে এনেছি। কৃষ্ণ কনসাসনেস। ওই বইতে পড়লাম।"

"এটাই তো প্রবলেম দিদি। সাহেবরা সার্টিফাই করবে, তারপর আপনারা জানবেন আর বিশ্বাস করবেন। চৈতন্য মহাপ্রভু আপনাদেরই। কিন্তু সাহেবরা আপনাদের চেয়েও ওঁর বড় ভক্ত হয়ে দেছে।"

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজা দেখল, প্রায় ছ'টা বাজে। এ বার ওঠা দরকার। না হলে অন্ধকার হয়ে যাবে। নিধু বনে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ও ফের ইশারা করল মিঠুকে, চলো, এ বার যাওয়া যাক। কিন্তু মিঠুর ভ্রুক্ষেপ নেই। মনে হচ্ছে, নিধু বনে যাওয়ার ওর কোনও ইচ্ছে নেই। তাহলে ফালতু ডেকে আনার মানেটা কী?

মিঠু বোধহয় কিছু বলেছিল। তার উত্তর দিচ্ছে কানাই পাণ্ডা, "আপনারা ভুল সময়ে এসেছেন দিদি। দোল, ঝুলন বা জন্মাষ্টমীর সময় যদি আসতেন, তাহলে দেখতে পেতেন এই বৃন্দাবনেরই অন্য চেহারা। আপনার মা বেশ কয়েকবার ওই সময়ে এসেছেন আপনার দাদুর সঙ্গে। উনি জানেন,"

মিঠু বলল, "আমিও একবার পঞ্চম দোলের সময় এসেছিলাম মা-বাবা আর দাদার সঙ্গে। অনেক বছর আগের কথা। তখন স্কুলে পড়ি। এখন অত মনে নেই।"

মিঠুর কথা শুনে ঝট করে সেই সময়টার কথা মনে পড়ে গেল রাজার। ও মনে মনে বলল, তখন তুমি আরও সুন্দর ছিলে মিঠু। একেবারে পুতুলের মতো। তোমার হয়তো মনে নেই। আমি কিন্তু ভুলিনি। আমি ভাবতেই পারিনি, জীবনে ফের কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তোমার এত কাছাকাছি আসা যাবে। এই ক'দিনে তোমাকে দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, যদি কাউকে বিয়ে করি, তো তোমাকেই। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রাজা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মিঠুর দিকে।

"কম মহাপুরুষের পদরেণু আছে এই ব্রজধামে? মহাপ্রভু, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, হরিদাস স্বামী থেকে শুরু করে মীরাবাঈ, কে না?" কানাই পাণ্ডা পুরনো দিনের গল্প বলছেন। "মীরাবাঈ অনেক বছর এখানে ছিলেন। রূপ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে তিনি একবার দেখা করতে গেলেন। রূপ গোস্বামী বলে পাঠালেন, আমি কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা করি না।' সে কথা শুনে মীরাবাঈ কী উত্তর দিয়েছিলেন জানেন? আমি তো জানতাম, ব্রজধামে একজনই মাত্র পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ। বাকিরা তাঁর সখী। ঠিক আছে আমি চললাম। সে কথা রূপ গোস্বামীর কানে যেতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। যে নারী একথা বলতে পারেন, তিনি সামান্য নারী নন। মীরাবাঈকে তিনি নিজে ডেকে নিয়ে গেলেন।"

কানাই পাণ্ডার পাশে বসা ভদ্রলোক এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। তিনি উসখুস শুরু করেছেন। সম্ভবত চোখের ইশারায় কিছু বলে থাকবেন। সেটা বুঝে কানাই পাণ্ডা হঠাৎ বললেন, "মা, আমরা তাহলে কাজের কথা শুরু করি। দ্বিজদাসবাবু আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান।"

কথাটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাজা। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়াল। মিঠুকে বলল, "তুমি কি যাবে?"

মিঠুও উঠে পড়ল, "চলো যাই।"

বাইরে বেরিয়ে এসে রাজা দেখল, সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু এখনও আধ ঘণ্টার মতো আলো থাকবে। নিধুবনে যাওয়ার এটাই ভাল সময়। স্কুটারের পিছনে ও মিঠুকে তুলে নিল। দু'দিন আগে হলে একটু অস্বস্তি করত। এখন মিঠুকে খুব আপনার বলে মনে হচ্ছে। আজ সকালেই সঙ্গীতা ভাবি জিজ্ঞেস করেছিল, "রাজা ভাইয়া সেদিন বাঁকে বিহারীর মন্দিরে তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি গেছিল, সে কে গো?" রাজা কায়দা করে কথাটা এড়িয়ে গেছে। হয়তো পাড়া প্রতিবেশীর কারও চোখে পড়ে থাকবে। গিয়ে বাড়িতে লাগিয়েছে। আজ নিধু বনে যদি কারও নজরে পড়ে, এবং সেটা ভাবির কানে যায়, তাহলে ধরেই নেবে, কোনও চক্কর চলছে।

পিছনের সিটে বসেই মিঠু বলল, "কানাই পাণ্ডা কিন্তু বেশ কথা বলতে পারে।"

রাজা বলল, "ওটাই তো ওদের পেশা। কথা বেচে খাওয়া।"

"কোন প্রফেশনে এটা লাগে না বলো তো?"

"ঠিক বলেছ। আমিও তো কথা বেচে খাই।"

"বলো লোককে টুপি দিয়ে।"

কথাটা রাজা বুঝতে পারল না, "তার মানে?"

"ওটা কলকাতার নিজস্ব ভাষা। তুমি বুঝবে না।"

"সত্যি, বাংলা ভাষাটা এত কম জানি, মাঝে মধ্যে অনেক কথা বুঝতে পারি না। তুমি সেদিন বললে ওষ্ঠোগত। তার মানেটা কী গো?"

ওষ্ঠোগত নয়, ওষ্ঠাগত। ওষ্ঠ মানে ঠোঁট। ওষ্ঠাগত মানে ঠোঁটের কাছে চলে আসা।"

"আই সি। তা এত সহজ একটা কথা বলার জন্য এত ভারী শব্দ ব্যবহার করার কোনও দরকার আছে?"

মিঠু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "উফ, রাজা তোমার ভাষাচর্চা থামাবে?"

রাজা চুপ করে গেল। গলির ভেতর দিয়ে ও এখন শর্টকাট করছে। সামনে একটা রিকশা। একটু এদিক ওদিক হলে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। দুপাশে দোকান। লোকের ভিড়। এই সব রাস্তায় স্কুটার চালানো বিরক্তিকর। গলির ও মুখে সাহজির মন্দির। তারই উল্টো দিকে নিধু বন। একটু ফাঁকা রাস্তায় এসে রাজা বলল, "তোমার স্টাডি কেমন চলছে?"

"ভাল। কাল কলকাতায় ফোন করেছিলাম। আমাদের উওমেন্স ফোরামের ডিরেক্টরকে খানিকটা ব্রিফ করলাম। আমি ইনপুট দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি উনিই পেপারটা তৈরি করবেন।"

"কী নাম ভদ্রলোকের?"

"ডঃ কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। খুব পণ্ডিত মানুষ। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন। জানো, উনি নিজে এখানে আসছেন।"

"এই গরমে আসবেন?"

"আসলে উনি আসছেন দিল্লিতে। কী একটা কাজে। তো, দিল্লি কাছে বলে আমাদের বাড়ি ঘুরে যাবেন। আরও একটা মিশন আছে। স্যারের কাকিমা দীর্ঘদিন আগে এই বৃন্দাবনে এসে আর ফিরে যাননি। স্যার তাঁর হদিশ পেতে চান। শুনলাম এখানকার খবরের কাগজেও নাকি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন উনি।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এত বছর পর ভদ্রমহিলাকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব?"

"হোপ এগেনস্ট হোপ। আর কী? তা ছাড়া স্যারকে আমি তোমার কথা বলেছি। উনি তোমারও একটু হেল্প নিতে চান।"

কথা বলতে বলতে রাজা নিধু বনে পৌঁছে গেল। স্কুটার থামিয়ে ও বলল, "এই হচ্ছে নিধু বন। চলো রাধা কৃষ্ণ একসঙ্গে গিয়ে ঢুকি।"

রাধা কৃষ্ণ কথাটা শুনে মিঠু হাতে চিমটি কাটল। রাজা বলল, "মিঠু, কলকাতায় মেয়েদের স্কুলে কি চিমটি শেখানোর ক্লাস হয়? এত ভ্যারাইটি ডোজ। সেই কারণেই বলছিলাম। উফ, হাতটা জ্বলে যাচ্ছে।"

মিঠু বলল, "তুমি ধরেই নিয়েছ, তুমি কৃষ্ণ। তাই না?"

"হ্যাঁ, গায়ের রঙের দিক থেকে তো বটেই, এটা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে।" বলতে বলতে রাজা স্কুটারটা মন্দিরের সামনে দাঁড় করাল। দিনের আলো এখনও যায়নি।

স্বচ্ছন্দে এখনও আধ ঘণ্টার মতো নিধু বনে থাকা যাবে। কয়েকটা সিঁড়ি টপকে তারপর নিধু বনের সিং দরজায় পৌঁছতে হয়। সিঁড়ির দু'পাশে লাইন দিয়ে বসে ভিখারি। তাদের কথা শুনে মিঠু বলল, "এরা সবাই বাঙালি, তাই না?"

রাজা গম্ভীর, "হ্যাঁ। এরাই এখানে এসে বাঙালিদের বদনাম করে দিল।"

সিং দরজায় এবং আশ পাশে প্রচুর বাঁদর। দেখে মিঠু রাজার গা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল। ওর স্তনের একটা অংশ কনুইয়ে ঠেকছে। রাজার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। ঠিক এই রকম অনুভূতিই ওর হয়েছিল। স্টেফানি যে দিন গেস্ট হাউসের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে চুমু খেয়েছিল। স্পর্শটা এড়ানোর জন্যই রাজা একটু সরে গিয়ে বলল, "সাবধান, বাঁদরগুলো তোমার ব্যাগ ছিনতাই করতে পারে।"

মিঠু ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "ভেতরেও আছে নাকি?"

"প্রচুর। ওদের খুশি না করে তুমি ভেতরেই যেতে পারবে না।"

"না বাবা, আমি তা হলে ভেতরে যাব না। বাঁদরকে আমার ভয় করে। পরশু দিন বাড়ির ভেতর একটা ঢুকে পড়েছিল। খুব মুখ খিচোচ্ছিল।"

"দূর কিচ্ছু করবে না। আমি তো আছি। দু টাকার চানা কিনে দিচ্ছি। তা হলে আর ভয় দেখাবে না!"

নিধু বনে ঢোকার মুখে সিঁড়িতে চানাওয়ালা বসে। রাজা ছোলা কিনে সামনে ছড়িয়ে দিতেই বাঁদরগুলো হুপহাপ করে লাফিয়ে পড়ল। আর তখনই মিঠুকে নিয়ে রাজা নিধু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারপাশে বাড়ির দেওয়াল। জায়গাটাও বড় নয়। বছর আটেক আগে ছোড়দির সঙ্গে রাজা একবার নিধু বনে এসেছিল। এ বার এসে দেখল, জায়গাটা আর খোলামেলা নেই। ভেতরে প্রচুর গাছ। একেবারে ছাতার মতো। কিন্তু কোনও গাছই চার ফুটের বেশি উঁচু নয়। গাছের ফাঁকে পায়ে চলার রাস্তা। ডান দিকে রাধার শৃঙ্গারঘর। বাঁ দিকে হরিদাস স্বামীর সমাধি স্থল। গাছের ফাঁকে ঘাসহীন রাস্তায় অনেক মহিলা ঝাঁট দিচ্ছেন। তাঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা।

মিঠু অবাক হয়ে বলল, "এরা ঝাঁট দিচ্ছে কেন রাজা?"

"মনের ইচ্ছে ফুলফিল করার জন্য। ঝাঁট দেওয়ার সময় মনে মনে যে যা চাইবে তা পাবে।"

"তা হয় নাকি?"

"নিশ্চয়ই হয়। না হলে সকাল বিকাল ভাল ভাল ঘরের মহিলারা এখানে আসবেন কেন বল?"

"তুমি কোনও দিন এসে ঝাঁট দিয়েছ রাজা?"

"না, এতদিন ঝাঁট না দিয়েই আমি যা চেয়েছি, পেয়ে গেছি। এ বার একদিন আসব ভাবছি। একটা জিনিস চাওয়ার আছে।"

"সেটা কী? আমাকে বলা যাবে?"

"এই, তুমি কী সত্যি সত্যিই ভাবলে, ঝাঁট দিলে ইচ্ছেপূরণ হয়? আসলে আমার কী মনে হয় জানো? এখানে ঝাঁট দেওয়ার অর্থ, এখানে এসে আত্ম অহংকার ঝেড়ে ফেলা। তুমি যেই হও, ধনী অথবা দরিদ্র, পণ্ডিত অথবা মূর্খ, নিধু বনে তুমি আর পাঁচটা মানুষের মতো।"

মিঠু বলল, "তোমার এই ব্যাখ্যাটাই ঠিক।"

"ব্যাখ্যা মানে?"

"উফ, আবার তোমাকে মানে বলে দিতে হবে? আমি তো দেখছি, বাংলা ভাষায় তোমার বুৎপত্তির অভাবে আমার মনস্কামনা পূরণ হবে না।"

"মিঠু বুৎপত্তি কথাটার মানে কিন্তু আমি বুঝলাম না।'"

"তোমাকে বুঝতে হবে না। "বলে মিঠু রাজার হাত ধরে টানল। "এসো, একটু ঘুরে দেখা যাক জায়গাটা।"

সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নীচে নেমে এল। পায়ের তলায় রুক্ষ জমি। ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই। মিঠু বলল, "এখানে বসার কোনও জায়গা নেই তাই না?"

রাজা বলল, "আনফর্চুনেটলি না। এখানে বসে প্রেম করার অধিকার শুধু রাধা আর কৃষ্ণ ভগবানের।"

'বয়েই গেছে আমার প্রেম করতে। জানো, আমি কী ঠিক করেছি? এ বার মা যার গলায় ঝুলিয়ে দেবে, তাকেই বিয়ে করব।"

এ বার কথাটা শুনে রাজার খটকা লাগল। তার মানে আগে একবার মিঠুর বিয়ে হয়েছিল নাকি? যাঃ, তা কী করে হয়? কথাটা পরে একবার কায়দা করে তুলতে হবে। গাছের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিঠু ফের বলল, "আমার ভাবতেই অবাক লাগছে, রাধা আর কৃষ্ণ এই জায়গায় লীলা করে গেছেন।"

রাজা বলল, "গেছেন মানে? এখনও করেন। শ্যামানন্দ স্বামীর ঘটনাটা তুমি জানো?"

"কে শ্যামানন্দ স্বামী?"

"মহাপ্রভুর শিষ্য। এই বনে হাঁটতে হাঁটতে একদিন তিনি রাধার নূপুর খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই নূপুর কপালে ঠেকিয়ে তিনি ঘরে নিয়ে যান। রাতে রাধা স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিলেন। বললেন, আমার ওই নূপুর চিহ্ন তোরা সবসময় কপালে রাখবি। রাধার নির্দেশেই শ্যামানন্দের শিষ্যরা কপালে নূপুর চিহ্ন আঁকতে শুরু করেন। সেটাই রসকলি। এখানে বিধবাদের কপালে নিশ্চয়ই তুমি দেখে থাকবে।"

"রাজা, তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জানো।"

"তেমন কিছু না। বাড়িতে মাম্মি-ছোড়দিদের মুখে শুনেছি। আমার এক বন্ধু আছে ধর্মেন্দ্র। ও অনেক কিছু জানে। বৃন্দাবন নিয়ে ও খুব চর্চা করে।"

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এসে দাঁড়াল রাধার শৃঙ্গার কক্ষের কাছে। একটা গোলাকৃতি ঘর। চার পাশটা কাচ দেওয়া। বাইরে থেকে ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভেতরে একটা বেদির উপরে রাধার মূর্তি। শ্বেত পাথরের। শৃঙ্গাররতা। মূর্তিটার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেল। আগের বার লক্ষ্য করেনি। মূর্তিটা ভাল করে দেখার জন্য ও মিঠুকে বলল, "চলো ভেতরে যাই।"

একটু ঘুরে ঘরের ভেতরে ঢুকে রাজা দেখল, উপাসনা করার জায়গায় অনেকে চোখ বুঁজে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে বীণা, তবলা, মৃদঙ্গ ও এসরাজ। মাঝে মধ্যে এখানে ভজনের আসর বসে। রাজা ছোড়দির মুখে শুনেছে, রাধার এই শৃঙ্গার কক্ষে নাকি এক সময় মীরাবাঈ গান করে গেছেন। বেদির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেবাইত রাধা মাইয়ের পুজোর আয়োজন করছেন। এ দিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ মিঠুর দিকে চোখ যেতেই রাজা চমকে উঠল। হুবহু রাধা মাইয়ের মুখটা যেন বসানো।

"রাজা, হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন?'"

গলাটা শুনেই রাজা বুঝতে পারল স্টেফানি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে স্টেফানি ঠিক ওর পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে রাজা প্রমাদ গুণল। মিঠুর সামনে স্টেফানি যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, তা হলে সব গেল। মেয়েটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখানে ওর সঙ্গে যথাসম্ভব ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি ও বলল, "আরে নির্মলা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

আমার গাড়ি তোমায় কেমন সার্ভিস দিচ্ছে?"

"ভাল, খুব ভাল। আগে সকালের দিকে এখানে ঝাঁট দিতে আসতাম। এখন আমার প্রোগ্রামের জন্য সকালে আর সময় পাই না। সময় পেলে তাই বিকালের দিকে এখানে আসি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে

রাজা। তুমি চলো না আমার সঙ্গে। তোমার সাহায্য আমার দরকার।"

রাজা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। বলল, "ঠিক আছে। ঘণ্টা খানেক পর আমার দোকানে ফোন কোরো। তখন বলতে পারব।"

"নাইস অফ ইউ রাজা। আসার চেষ্টা কোরো কিন্তু. আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।" কথাগুলো বলেই স্টেফানি ওর গালে হালকা চুমু দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

চুমু দিয়েই ও সর্বনাশটা করে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর রাজা পাশ ফিরে দেখে মিঠু বাইরে বেরিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। দ্রুত পা চালিয়ে রাজা ওকে ধরল। তারপর বলল, "এই কোথায় যাচ্ছ? হরিদাস গোস্বামীর সমাধি দেখবে না?"

"না, আমি দেখব না, তুমি দেখো।"

"তুমি রেগে গেছ মনে হচ্ছে?"

"মোটেই না। বাড়িতে আমার একটা দরকার আছে। এখুনি যেতে হবে।"

"একা একা যাবে? ও দিকে কিন্তু বাঁদর আছে।"

কথাটা শুনে মিঠু দাঁড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে এসে রাজার হাত ধরে বলল, "তুমি রাস্তা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে, চলো।"

রাজা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "বাহ্, চমৎকার। তোমার মতো সেলফিশ মেয়ে আমি জীবনে একটাও দেখিনি।"

মিঠু ভ্রু কুঁচকে বলল, "আমাকে সেলফিশ বললে? কতটুকু চেনো আমাকে?"

রাজা বলল, "কেন সেলফিশ বলব না বল। তোমার দরকারে তুমি আমাকে ডেকে আনলে। আর এখন আমাকে ফেলেই একা একা চলে যাচ্ছ? হঠাৎ তোমার কী হল, শুনি?"

কোনও উত্তর না দিয়ে মিঠু উল্টো মুখে হাঁটতে শুরু করল। হরিদাস স্বামীর সমাধিস্থলের দিকে। ওর রাগ দেখে রাজা মুখ টিপে হাসছে। সমাধিস্থলের উপর দু'তিনটে বাঁদর বসে আছে। মিঠু বোধহয় লক্ষ্য করেনি। চোখে পড়লেই ফের এ দিকে ছুটে আসবে। রাজা তাই ধীরে সুস্থে হাঁটতে লাগল। মিঠুর কাছাকাছি গিয়ে ও বলল, "এই সমাধিস্থলের কাছেই সম্রাট আকবর একবার এসেছিলেন হরিদাস স্বামীর গান শুনতে।"

মিঠু রেগে বলল, "আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই শোনার।"

রাজা হাসিমুখে বলল, "তুমি এত রেগে রয়েছ যে, তোমাকে ওদের মতো দেখাচ্ছে।" বলেই ও ইঙ্গিত করল বাঁদরগুলোর দিকে।

দু'তিন হাতের মধ্যে বাঁদরগুলো দেখে মিঠু লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল রাজাকে। ভয় মিশ্রিত গলায় বলল, "এই, ওদের তাড়াও। আমার শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করছে।"

বুকে মুখ লুকিয়ে মিঠু মিশে রয়েছে শরীরের সঙ্গে। ওর চুল থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরেচ্ছে। এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে অন্য হাত দিয়ে রাজা বাঁদর তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। নিধু বনে এই মুহূর্তে আশপাশে কেউ নেই। রাজা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, বাঁদরগুলো যেন ওর কথা না শোনে। ও নিজে মিঠুকে কাছে টানেনি। মিঠুই এসে ওর আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে। ও কোনও অন্যায় করছে না।

হঠাৎই ছিটকে সরে গেল মিঠু। তারপর রেগে বলল, "এই, এটা কী হচ্ছে? আমাকে ধরে ছিলে কেন তুমি?"

রাজা হাসবে, না রাগবে—বুঝতে পারল না। ও বলল, "আশ্চর্য, বাঁদরের ভয়ে তুমিই তো এসে আমায় জাপটে ধরলে।"

"তাই বলে তুমি আমায় এতক্ষণ ধরে রাখবে? কেউ দেখলে কী ভাবত বল তো? ছি ছি।" বলেই রাগে বড় বড় পা ফেলে মিঠু সিংদরজার দিকে এগোতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে হতভম্ব রাজা এ বার পা চালিয়ে ওকে ধরে ফেলল। তারপর বলল, "প্লিজ মিঠু, সিন ক্রিয়েট কোরো না। কী হয়েছে আমায় বলো। আমি যদি খারাপ কিছু করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

কোনও উত্তর না দিয়ে মিঠু গটগট করে হাঁটছে। বাইরে রাস্তায় স্কুটারের সামনে এসে ও বলল, "তোমাকে ক্ষমা করতে বয়ে গেছে। আমাকে একটা রিকশা ডেকে দাও। আমি একাই চলে যাব।"

সামনেই তিনটে রিকশা দাঁড়িয়ে। যে কোনও একটাতে উঠে মিঠু চলে যেতে পারে। ওর ছেলেমানুষি দেখে রাজা মনে মনে হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি রিকশা ঠিক করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, এরপর ডাকলে আর কোনওদিন রাজা মিত্রকে পাওয়া যাবে না।"

কথাটা শুনে মিঠু ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে। এই শেষবার স্কুটারে উঠছি। আর কখনও তোমাকে ডাকব না।"

রাজা স্কুটার স্টার্ট দেওয়ায় কোনও আগ্রহই দেখাল না। কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ও বলল, "দেখো মিঠু, জানি, কেন তুমি আমার উপর চটেছ। প্লিজ মিসআন্ডারস্ট্যান্ড কোরো না। ওই আমেরিকান মেয়েটার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ও আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। আমি রাজি না। এ কথা আমার বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব সবাই জানে। এতে কোনও লুকোচুরি নেই।"

মিঠু বলল, "কেন, অত সুন্দরী মেয়েও তোমার পছন্দ নয়?"

"তোমার মাথা খারাপ? স্টেফানি একটা মতলবে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। আমাকে বিয়ে করলে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবে। কৃষ্ণভক্ত সাহেবরা এই কারণেই এখানে এসে ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করছে। এর আগে এক বার পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল স্টেফানি। অমন মেয়ে ঘরে নিয়ে গেলে মাম্মি আমাকে তাড়িয়ে দেবে। বিশ্বাস করো, আমি একবর্ণও মিথ্যে বলছি না। নাও, এবার চলো। এখানে আসার সময় স্কুটারে যেমন ক্লোজ হয়ে বসেছিলে, লক্ষ্মী মেয়ের মতো সেটাই করো।"

ফেরার সময় পুরো রাস্তায় একটা কথাও বলল না মিঠু। রাধাকুঞ্জে নেমে যাওয়ার সময় শুধু বলল, "নামবে না? মা কিন্তু তোমায় খেয়ে যেতে বলেছিল।"

রাজা বলল, "না। আজ না। আমার একটু তাড়া আছে।"

...রাতে দোকান বন্ধ করে ফেরার সময়, পেনসিল ব্যাটারি কিনবে বলে রঙ্গনাথজির মন্দিরের সামনে রাজা স্কুটার থেকে নামল। রাত প্রায় ন'টা। আশপাশের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজনও খুব নেই। ব্যাটারি পকেটে পুরে ও যখন ফের স্কুটারে উঠতে যাবে, সেই সময় পথ আগলে এসে দাঁড়াল ঘনশ্যাম ও আরও দুটো ছেলে। ঘনশ্যাম মুখ খারাপ করে বলল, "এই বাঙালির বাচ্চা,'তোর খুব বাড় বেড়েছে ইদানীং। দাঁড়া, তোর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।"

শরীরটা ভাল নেই বিমলার। দু'দিন ধরে কারও সঙ্গে দেখাই করছেন না। সুধাময় ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। রক্ত পরীক্ষা করালেন। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেছেন, সুগার বেড়েছে। টেনশন কমাতে হবে। কী করে কমাবেন টেনশন বিমলা? যাদের ভাল তিনি করতে যান, তারাই উল্টো বোঝে। সেদিন স্বাতীর ব্যবহারে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন বিমলা। ওইটুকু মেয়ে, সেও মুখের উপর বলে দিল, পরের ব্যাপারে নাক গলানো আপনার বিশ্রী স্বভাব!

বিমলা ঠিক করেছেন, কারও জন্য আর কিছু করবেন না। চুলোয় যাক বিধবারা। আপদ-বিপদে কেউ এলে ডাকলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। সেদিন স্বাতীর কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে এসে ওর বাবা আর মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এত রাগ হয়েছিল, নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি।

সুধাময়কে অবশ্য স্বাতীর ব্যাপারে কিছু বলেননি। বললে উনি মনে মনে কষ্ট পেতেন। সুধাময় কতবার বারণ করেছেন, ফালতু ঝামেলায় না জড়াতে। বিমলা তাতে কান দেননি। এখন পস্তাচ্ছেন।

এই সব সমাজসেবা করতে গিয়ে নিজের কম ক্ষতি করেছেন বিমলা? একটা মাত্র ছেলে। তাকে ভালমতো মানুষ করতে পারলেন না। চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হোক। হল মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিটিভ। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে সে এখন দিল্লিতে থাকে। তবে মা-বাবাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মধ্যে আসে ছুটিছাটা পেলে। বিমলা কোনওদিন জানার চেষ্টা করেননি, ছেলের মনে কোনও অভিমান আছে কী না?

বিমলা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সুধাময় রিসার্চ ইন্সটিটিউটে যাচ্ছেন না। রাধাকুঞ্জ থেকে থেকে কী একটা দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে এসেছেন। সেটাই পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন! বাড়িতে বসে অফিসের অন্য কাজেও ব্যস্ত। সময় পেলে অবশ্য এসে বসছেন বিমলার কাছে। সুধাময়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসছেন বৃন্দাবনের বিশিষ্ট লোকেরা। সব জ্ঞানীগুণী মানুষ। ওঁদের আলোচনা শুনতেও ভাল লাগে। আজ যেমন এসেছেন বিদ্যুৎবাবু। সীমার হাজবেন্ড।

গীতা ঠাগুই করে দিয়েছে। বিনোদবাবু খুব পছন্দ করেন। আর কিছু

নয়। পুদিনা পাতা, মৌরী বাটা দিয়ে সরবত। গরমের দিনে এখানে অতিথিদের চা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। কেউ কারও বাড়িতে এলে ঠাণ্ডাই খাওয়ায়। আগে নিজে বানাতেন। ইদানীং শিখিয়ে দিয়েছেন গীতাকে। ও-ই করে এনে দেয়। বিমলা একবার ভাবলেন, উঠে গিয়ে আড্ডায় বসবেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় সদর দরজায় খটখটানির শব্দ। বেলা দশটায় আবার কে এল? বিমলা ঠিক করে নিলেন, চেনাশুনো কেউ এলে দেখা করবেন না।

দরজা খুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে গীতা। এসে বলল, "মাইয়ি, দেখো তো কে এসেছে! ইংরাজিতে কী বলছে, আমি বুঝতে পারছি না।'"

বোধহয় বিদেশ থেকে কেউ এসেছে। বিমলা বললেন, "ভেতরে নিয়ে আয়।"

বারান্দায় বসেই তিনি দেখতে পেলেন, লোহার গেটে মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে এল বিদেশি একটা মেয়ে। পরনে গেরুয়া রঙের শাড়ি। বিমলা দেখেই বুঝতে পারলেন, সাহেবদের মন্দিরের মেয়ে। হঠাৎ কী কারণে এখানে? উঠে দাঁড়িয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তিনি বললেন, "কাকে চাই?"

"আপনাকে। আপনিই তো রামকৃষ্ণ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল তাই না?"

"হ্যাঁ। ভেতরে আসুন।"

"আমার নাম নির্মলা দাসী।" বলতে বলতে মেয়েটা ভেতরে ঢুকে এল। ছিপছিপে, বেশ লম্বা। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি না। আসল নাম নিশ্চয়ই নির্মলা নয়। অন্য কোনও ক্রিশ্চান নাম আছে। এত অল্প বয়সে এই বিদেশি মেয়েগুলো সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয় কী করে, বিমলা বুঝতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের টানে দূর দেশ থেকে একা একাই চলে এসেছে। সত্যি সাহস আছে। আমাদের মেয়েগুলো যদি এ রকম সাহসী হত, তা হলে সমাজটা অনেক এগিয়ে যেত।

বিমলা জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কাছে কী জন্য এসেছ নির্মলা?"

"বলছি। আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? সকাল থেকে খালি রোদ্দুরে ঘুরছি।"

গীতাকে ঠাণ্ডা দিতে বলে বিমলা উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। গত বছর নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে একটা মেয়ে ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল। এও বোধহয় বিধবাদের সম্পর্কে কিছু জানার জন্য এসেছে। বিমলা ঠিক করে নিলেন, এই মেয়েটা যদি ও সব কথা তোলে, তা হলে সোজা সুষমা গৌতমের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর এক ফোটাও সমাজসেবা নয়। অনেক হয়েছে।

ঠাণ্ডাইয়ে চুমুক দিয়ে মেয়েটা বলল, "মিসেস বাসু, আমি সাহেবদের মন্দির থেকে আসছি। আমরা রিসেন্টলি একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি, ফুড ফর লাইফ। সেই ব্যাপারেই আপনার সাহায্য নিতে এসেছি।"

ওহ, তা হলে গরীব বিধবাদের খাওয়ানোর প্রোগ্রাম নিয়েছে এরা। ভালই তো। দরিদ্র ভোজন অবশ্য বৃন্দাবনে নতুন কিছু নয়। অনেক মারোয়াড়িই এই পুণ্য কাজটা করে। বিমলা বললেন, "আপনি একটা কাজ করুন। সুষমা গৌতমের কাছে যান। উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"ওই ভদ্রমহিলার কি স্কুল আছে?"

"স্কুল কেন?" বিমলা ঠিক বুঝতে পারেন না মেয়েটার কথা।

"আমরা তো স্কুল স্টুডেন্টদের খাওয়ানোর প্রোগ্রাম নিয়েছি। প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে ওদের খাইয়ে যাব। অলরেডি আমরা দশটা স্কুলের ছেলে মেয়েদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছি।"

বিমলা বললেন, "না, না। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভাল পরিবারের। ওদের অভিভাবকরা এই ধরনের খাওয়ানো পছন্দ করবেন না। আপনি এক কাজ করুন, এখানে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু স্কুল আছে সেখানে যান।"

মেয়েটা একটু নিরাশ হল বলে মনে হল। তারপর বলল, "আই অ্যাম সরি। আচ্ছা, চলি তা হলে।"

মেয়েটাকে গেট অবধি পৌঁছে দিতে দিয়ে বিমলা দেখলেন, বাইরে টা টা সুমো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভারের পাশে বসে রয়েছে একটা চেনা ছেলে— রবি চর্তুবেদি। ভিডিও ফটোগ্রাফার। ওকে দেখে কৌতূহল মেটানোর জন্যই বিমলা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এদের সঙ্গে কী করছিস রে লালা?"

রবি বলল, "এরা আমাকে ভাড়া করেছে বড়িদিদি। স্কুলে স্কুলে এরা যখন খাবার দিচ্ছে তখন আমাকে ছবি তুলতে হচ্ছে।"

শুনেই মাথাটা গরম হয়ে গেল বিমলার। গরীব ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ভিডিওতে ছবি তোলা হচ্ছে। এ তো একেবারে সুষমার কেস। ছবি তুলে ক্যাসেট বানাবে। তারপর সেটা বিদেশে পাঠিয়ে বলবে, দেখ গরীবদের জন্য আমরা অনেক কিছু করছি। তোমরা অর্থ সাহায্য দাও। না দিলে এরা না খেতে পেয়ে মরে যাবে। পাছে রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলেন, সেই ভয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে এলেন বিমলা। সারা শরীর জ্বলছে। সমাজসেবাটাও শেষ পর্যন্ত ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। ছি ছি।

ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই সুধাময় জিজ্ঞেস করলেন, "কে এসেছিল গো?"

বিমলা সংক্ষেপে সব বলতেই বিদ্যুৎ বললেন, "এই মেয়েটা আমাদের পাড়ার একটা স্কুলেও গেছিল। বাচ্চাদের পকেড়া, বড়া—এই সব দিনকয়েক খাইয়েছে। সব থেকে খারাপ ব্যাপার হল, খাওয়ানোর পর বাচ্চাদের দু'হাত তুলে কৃষ্ণনাম করতে বলে। স্কুলের মাস্টার মশাই আর দিদিমনিরাও টিফিন আনা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে আছি। খবরটা আমার কানে আসার পর কমিটির মিটিং ডেকে সব বন্ধ করে দিয়েছি।"

সুধাময় বললেন, "সাহেবদের অত্যাচার তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে দেখছি। পুরো বৃন্দাবনটাই এরা কিনে নেওয়ার মতবল করেছে।"

বিদ্যুৎ বললেন, "কেন এরা আবার কী কিনল?"

"কী কেনেনি বলো? অত বড় বৃন্দাকুঞ্জ। মণিপুর রাজার বাড়ি। সেটাই কিনে ফেলল। ভেতরে একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের চূড়োয় একটা মণি ছিল। একটা সময় রাতে সেটা জ্বলজ্বল করত। কৃষ্ণভক্ত এক জার্মান পুরো কুঞ্জটাই কিনে ফেলল। সব হাত বদল হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। একদিন দেখবে আমাদের আর কিছু নেই। সেবাকুঞ্জের গিরিধারী মন্দির। এখন পয়সার অভাবে সেবা হয় না। কোনও দিন দেখব, সাহেবরা ওখানে বসে খোল বাজাচ্ছে।"

বিদ্যুৎ হাসতে হাসতে বললেন, "হিন্দুত্বের গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে। তোমার আক্ষেপ করার কী আছে?"

সুধাময় বললেন, "ঠাট্টা কোরো না ভাই। মন্দিরগুলোর অবস্থা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। ওই যে লালাবাবুর অত বড় গুরুস্থান। কিনে নিলেন টাটাম্বরি বাবা। যমুনাকুঞ্জ। ময়নমসিংহ রাজাদের বাড়ি। একটা সময় কী আড়ম্বরই না ছিল। সবাই বলল, ঢাকায় জন্মাষ্টমীর দিন মিছিল বেরোয়। ওখানে অত জাঁক হয়। এখানে হবে না? নবাবগঞ্জের প্রিয়নাথ পালমশাই এগিয়ে এসে বললেন, আলবাত হবে। কী ছিল বৃন্দাবনের বাঙালি! আর কী হয়ে দাঁড়াল। একটা সময় ধনী বাঙালিরা দাঁড়িয়ে থেকে দরিদ্র ভোজন করাতেন। আর এখন দরিদ্র ভোজনের লাইনে প্রায় সবাই বাঙালি।"

সোফায় বসে বিমলা দু'জনের কথা শুনছেন। বিদ্যুতের মতো সুধাময় বৃন্দাবনের লোক নন। উনি লখনউয়ের। বিয়ের পর থেকে উনি এখানে। বিদ্যুতের জন্ম-কর্ম সবই এখানে। কলেজে পড়ান। সমাজ সচেতন মানুষ। সে জন্য আক্ষেপটা আরও বেশি। সুধাময়ের কথা শুনে বিদ্যুৎ বললেন, "অত বাঙালি বাঙালি কোরো না তো ভাই। আমারও একটা সময় মোহ ছিল। এখন কেটে গেছে। জানো, আমার বাড়িতে একটা অল্পবয়সী সধবা মেয়ে কাজ করত। রানাঘাটের মেয়ে। মাসখানেক কাজ করার পর বলে কী না, তোমাদের বাড়ি কাজ করবুনি। হিন্দুস্তানিদিগের বাড়িতে করব। ওরা অনেক মাইনে দেয়। ভাবতে পার? কাজ ছেড়ে চলে গেল! বলে গেল, তোমাদের বাড়িতে খুব বাইরের লোকের বাসন মাজতে হয়। আমি আর কাজ করতে পারবুনি।"

সুধাময় বললেন, "ওদের শুধু চাইতে শেখানো হয়েছে। বদলে কিছু দিতে বলা হয়নি। গোটা সমাজের দোষ।"

বিদ্যুৎ বললেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গলে কী হচ্ছে বল তো? ওখানে যখন বন্যা হয়, কাগজে পড়ে তখন সিঁটিয়ে থাকে। আবার একদল লোক এসে হাজির হবে রিকশা চালাতে, নাহয় ভিক্ষা করতে।"

এ বার বিমলা বললেন, "না না, সেদিন আমার কাছে কলকাতার একটা মেয়ে এসেছিল। ও বলল, ওয়েস্ট বেঙ্গল গর্ভমেন্ট নাকি ভাবছে, বাঙালি বিধবাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে।"

"রাখুন তো বউঠান।" বিদ্যুৎ উত্তেজিত "ও সব ফাঁকা বুলি। ভোট আসেছে। এখন তো এ সব কথা বলতেই হবে।"

বিমলা মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন, "মেয়েটা কিন্তু জোর দিয়ে বলল, স্টাডি করার জন্যই ওকে পাঠানো হয়েছে। পরে উইমেন্স কমিশন থেকেও নাকি বেলা দত্তগুপ্ত বলে কে একজন আসবেন।"

"আগে কিছু করুক, তারপর বিশ্বাস করব। এই যে বছর কয়েক আগে দিল্লি থেকে আমাদেরই প্রফেশনের একটা ছেলে বিধবাদের নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম করে গেল... কী নাম যেন ছেলেটার? বলুন না বউঠান। আহ আজকাল নামগুলো সব সময় মনেও থাকে না আবার..."

বিমলা বললেন, "পঙ্কজ ভুটালিয়া।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ছেলেটার ফিল্ম দেখলেই তো জানা হয়ে যায়, এখানে বিধবারা আছেন কী ভাবে? এর জন্য খরচ করে কলকাতা থেকে আসার দরকারটি কী? দু' একদিনের জন্য এসে কোনও লাভ আছে? ওই পঙ্কজ

ছেলেটা কী খেটেছিল বলুন বউঠান? প্রায় পাঁচমাস এখানে পড়ে রইল। ফিল্মটা বানিয়েছিল বটে!"

কথার মাঝে গীতা কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কার ফোন এল আবার এ সময়? হ্যালো বলতেই ও প্রান্তে রাজার গলা শুনতে পেলেন বিমলা। বললেন, "কী খবর রে লালা? দু'দিন বিছানায় পড়ে রয়েছি। একবার আসতে পারলি না?"

রাজা বলল, "বড়িদিদি, কাল রাতে ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার একচোট তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।"

"কেন? তুই আমার সঙ্গে স্বাতীকে আনতে গেছিলি বলে ওর রাগ?"

"সেটা একটা কারণ তো বটেই। আমার উপর ওর অনেক দিনের রাগ।"

"বদমাশটা কি একা ছিল?"

"না। লোকজন ঠিক সময়ে এসে গেছিল। না হলে আমি ওদের তিনজনের সঙ্গে পেরে উঠতাম না।"

"তোর কোনও ইনজুরি হয়নি তো?"

"তেমন কিছু না। আমার আখড়ার প্রচুর ছেলে আছে। ওকে আমি বুঝে নেব। আপনি চিন্তা করবেন না। যে কারণে ফোন করলাম, এখন আপনার কাছে একজনকে নিয়ে যাচ্ছি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।"

"আয়। আয়, আমি বাড়িতেই আছি।"

সুধাময় আর বিদ্যুৎ খুব উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ফোন টেবলের উপর রেখে বিমলা বললেন, "কাল রাতে আমাদের রাজাকে একা পেয়ে চোটপাট করেছে ঘনশ্যাম পাণ্ডা। রাজা ফোন করে জানাল।"

বিদ্যুৎ বললেন, "এই ছেলেটা খুব বেড়েছে। বৃন্দাবনের নর্থে ঘনশ্যাম আর ওয়েস্টে অশোক। এই দুটো ছেলে সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে এরা যে ভাবে টাকা নেয়, দেখলে তোমার গা জ্বলে যাবে।"

"কালাবাবুর কুঞ্জটা এই অশোক পাণ্ডা কী ভাবে দখল নিল, দেখলে বিদ্যুৎ? যমুনার তীরে অত বড় বাড়ি। রামকৃষ্ণদেব দেহ রাখার পর শ্রীমা ওই বাড়িতে এসে প্রায় একটা বছর কাটিয়ে ছিলেন।"

"বাড়িটা জমিদার নিকুঞ্জবিহারী বসুর ছিল না?"

"হ্যাঁ, রামকৃষ্ণদেব যাঁর সম্পর্কে বলতেন, আমার রসদদার। ওই বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কিছুদিন। তা, বাড়িটা উদ্ধারের কত চেষ্টা করল রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা। কিছুতেই পারল না।"

"রামকৃষ্ণদেবও তো এসেছিলেন বৃন্দাবনে। কোথায় ছিলেন, জানো?"

"চৈতন্য ফৌজদার কুঞ্জে। সেবার এসেছিলেন রানি রাসমনির সঙ্গে। মাস দুতিন এখানে ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রও আসেন দু'বার। সব নথিপত্তর আছে আমাদের রিসার্চ ইন্সটিটিউটে।"

হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বিদ্যুৎ বললেন, "বউঠান, এ বার উঠি। একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন। অনেকদিন আসেননি। সীমা বলছিল, এখন তো গরমের ছুটি। আপনার কোনও অসুবিধা নেই।"

বিমলা বললেন, "শরীরটা সুস্থ হোক। যাব এরদিন।"

বাড়িতে যেই আসুক, তাঁকে গেট অবধি পৌঁছে দেন বিমলা। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে এলেন। দরজার বাইরে পা দিয়েই বিদ্যুৎ বললেন, "এই দেখুন বউঠান, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সীমা জিজ্ঞেস করতে বলে দিয়েছিল, আপনি কি সুরদাস কৌশলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?"

বিমলা বললেন, "ফোনে কথা বলেছি। উনি একদিন দেখা করতে বলেছেন।"

"লোকটা এ বার এম পি হওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছে। জিতবেই। সুষমা ওর সঙ্গে পারবে না। এখন থেকেই লোকটার সঙ্গে লাইন করে রাখুন।"

লাইন করে রাখুন কথাটা বিমলার ভাল লাগল না। তবুও বিদ্যুৎকে বললেন, "যেদিন যাব, সীমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

দরজা বন্ধ করে বিমলা ফিরে আসছেন, এমন সময় ফের টোকা। বোধহয় বিদ্যুৎবাবু। নিশ্চয় ছাতা অথবা চশমা ফেলে চলে যাচ্ছিলেন। ফের দরজা খুলতেই দেখলেন, বিদ্যুৎবাবু নন, রাজা। ওর সঙ্গে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এবং অল্প বয়সী একটা মেয়ে। অচেনা দু'জনকে দেখেই মনে হচ্ছে, ওদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। রাজাকে তিনি বললেন, "আয় আয়, ভেতরে আয়।"

ড্রয়িং রুমে বসে রাজা বলল, "বড়িদিদি, এই মেয়েটার নাম পায়েল। অনেক দিন আগে এই মেয়েটা একবার একটা ট্রুপের সঙ্গে আমার দোকানে এসেছিল। তখনই আমার সঙ্গে পরিচয়। আর ইনি পায়েলের বাবা। এঁরা দিল্লিতে থাকেন। আপনার সাহায্য চাইতে এসেছেন। একটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। পায়েল, তুমি গুছিয়ে বলো।"

পায়েল বলল, "আমার দিদি হলেন সুষমা গৌতমের জেঠানি। আজ ভোরে আমরা দিল্লিতে হঠাৎ একটা ফোন পেলাম। আমার দিদিকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। আশুনে পোড়া অবস্থায়"

বিমলা চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। এ নিশ্চয়ই সুষমার কাজ। ও সব পারে। পরপর এই দুটো কথা মনে হল, তবুও জিজ্ঞেস করলেন, "কোন নার্সিং হোমে? যেটা সুষমার হাজবেন্ডের?"

"হ্যাঁ, মিসেস বাসু। ফোনটা পেয়েই আমরা তিনজন মথুরায় ছুটে আসি। এসে দিদিকে যে অবস্থায় দেখলাম..."বলে কথাটা আর শেষ করতে পারল না পায়েল। কাঁদতে শুরু করল।

রাজা বলল, "পায়েলের দিদির উপর অনেক দিন ধরেই অত্যাচার করছিল সুষমা গৌতম। দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু উনি সম্পত্তি বুঝে না নিয়ে, বেরিয়ে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। এদের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পিছনে সুষমাদির হাত আছে।"

বিমলা জিজ্ঞেস করলেন, "পায়েলের জিজাজি কোথায়?"

"তিনি মারা গেছেন বছর চারেক আগে। তারপর থেকেই ওর দিদিকে মারধর করত সুষমাজি। সেটাই কালমিনেট করল এই মার্ডার করার চেষ্টায়"

বিমলা একটু একটু করে উত্তেজিত হচ্ছেন। পুরো ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। এই সুযোগ, সুষমার আসল চেহারাটা পৃথিবীশুদ্ধ লোককে দেখানোর। বাইরে বিধবা কল্যাণের নাম করে পুরস্কার নেওয়া হচ্ছে। আর তখন বাড়ির ভিতর বিধবা জেঠানির উপর অত্যাচার! বিমলা নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। তারপর পায়েলের বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নার্সিং হোমে আপনি মেয়েকে কী অবস্থায় দেখলেন? তখনকী কথা বলার মতো অবস্থায়ছিল?"

"প্রায় আনকনসাস। একটা মশারির মধ্যে পড়ে আছে। মুখের একাংশও ঝলসে গেছে। ইশারায় বোঝাল, গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে।"

"ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?"

"কেউ নেই। একজন নার্স আমার ছেলেকে বলল, সেভেন্টি পার্সেন্ট বার্ন। বাঁচার কোনও চান্স নেই।"

"আপনার ছেলে কি এখন নার্সিং হোমে?"

"হ্যাঁ। ওঁর একটু মাথা গরম। ওখানে গিয়ে হইচই করায় নার্সিং হোমের স্টাফরা ভয়ে কয়েকটা কথা বলে ফেলেছে। মেয়েকে ওরা নার্সিং হোমে নিয়ে এসেছিল রাত বারোটার সময়। তখন ভাল মতো জ্ঞান ছিল। আমার মেয়ে নাকি তখন পরিচিত এক নার্সকে বলে, সুষমার সঙ্গে রাতে ওর ঝগড়া হয়েছিল। তারপর ওকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। তারপর দরজা খুলে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।"

"আপনি পুলিশে কোনও কমপ্লেন করেছেন?"

"না। এখনও যাইনি। সুষমা মাঝে মাঝে আমাকে ধমকাত, পুলিশে কমপ্লেন করে লাভ হবে না। পুলিশ আমার হাতের মুঠোয়। এখানে ওর খুব ইনফ্লুয়েন্স আছে, আমি জানি। কী করব ভেবেই পাচ্ছি না।"

বিমলা বললেন, "আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"দিদি, আপনি আমাকে হেল্প করুন। শুলাম, এখানে পুলিশ আপনার কথা ফেলতে পারে না। আমাদের কমপ্লেনটা অন্তত নিক।"

রাজা এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিল। ও বলল, "বড়ি দিদি, ফোনে একটা কথা আপনাকে তখন বলিনি। কাল ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, তখন হঠাৎ ও বলল, তোর বিমলা বাসুকে আমরা হাতকড়ি পরাব। সুষমা গৌতম তৈরি হচ্ছে। বলেই আপনার নামে একটা গালাগাল দিল। তখনই বুঝলাম, সুষমাজির সঙ্গে ঘমশ্যামের ভাল যোগাযোগ আছে। পায়েলরা এখানে যদি কিছু করতে যায়, তা হলে ঘমশ্যামকে এদের পিছনে লাগিয়ে দিতে পারে। আমি সেই কারণেও আগে আপনার পরামর্শ নিতে চলে এলাম।"

বিমলা বললেন, "ভাল করেছিস। তুই একটা কাজ কর লালা। এদের নিয়ে থানায় শ্রীবাস্তবের কাছে চলে যা। তোর সঙ্গে তো খুব ভাল চেনা। একটা কথা, কোথাও আমার নামটা করবি না। সুষমা তা হলে অন্য কালার দেবে। এ দিকে আমি যা করার, করছি।"

রাজা ওদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কুলারের সামনে গিয়ে বসলেন বিমলা। পুরো ব্যাপারটা ভাল করে ভাবা দরকার। সুষমা চেষ্টা করলে পুরো ঘটনাটা ধামাচাপা দিতে পারে। সেভেন্টি পার্সেন্ট বার্ন হলে কারও পক্ষে বাঁচা মুশকিল। ওই মেয়েটা আজ না হোক, দু'চার দিনের মধ্যে মারা যাবেই। সুষমাদের নিজেদেরই নার্সিং হোম। কত সুবিধে। রাতের দিকে টাকা পয়সা খাইয়ে ডেড বডিটা নিয়ে গিয়ে মুর্দা ঘাটে ওরা পুড়িয়েও ফেলতে পারে। তখন কোনও প্রমাণ থাকবে না। তার আগে, আজই একটা হইচই বাঁধিয়ে

দেওয়া দরকার নার্সিং হোমের সামনে। যাতে আরও লোক জানাজানি হতে পারে। স্রেফ পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। সুষমার প্রচুর টাকা। ও টাকার লেনদেন করে পুলিশকে কিনে নিতে পারে।

মনে মনে জেদ চেপে গেল বিমলার। খুব বাড় বেড়েছিল সুষমার। আরে, মাথার ওপর গোবিন্দ আছেন। আমরাও রোজ গোবিন্দকে মিছরি-মাখন দিই। তুই একা দিস না। পাপ কখনও বাপকেও ছাড়ে না। তোকে আমি টেনে নামাবই। আমাকে তুই হাতকড়া পরাবি? যে হাতে তুই ওই অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে এসেছিস, সেই হাতে যদি আমি হাতকড়ি না পরাই, তা হলে আমার নাম বিমলা বাসু না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বিমলা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চট করে শাড়ি বদলে সুধাময়ের স্টাডি রুমে গিয়ে বললেন, "এই, আমি একটু বেরোচ্ছি। আমার দেরি হলে তুমি ভাত খেয়ে নিও।"

সুধাময় বললেন, "এই ভর দুপুরে অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"এসে বলব। মারাত্মক একটা ব্যাপার। সুষমাকে জব্দ করার এই সুযোগটা আমি হাতছাড়া করতে পারব না।"

উত্তরের প্রত্যাশা না করেই বিমলা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর একটা রিকশা ধরে সোজা মোতিবাগ। সুরদাস কৌশলের বাড়ি। এম পি ইলেকশনের আগেই বিমলা জিতিয়ে দিতে চান সুরদাস কৌশলকে। আজকের ঘটনায় এই লোকটাকে নামিয়ে দিতে পারলেই, সুষমার উপর শোধ নেওয়া যাবে। সীমাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন। বিমলা। এতদিন বৃন্দাবনে থেকেও তিনি জানতেন না, সুষমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন এত কাছে।

...বেলা তিনটে নাগাদ বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার জন্য সবে বিছানায় এসে বসেছেন বিমলা। হঠাৎ সতীশের ফোন। দৈনিক জাগরণের রিপোর্টার। উত্তেজিত গলায় ও বলল, "বড়িদিদি, খবরটা শুনেছেন?"

উৎসাহ না দেখিয়ে বিমলা বললেন, "কী খবর রে?"

"সুষমাজির নার্সিং হোম ভাঙচুর হয়েছে আজ।"

অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বিমলা প্রশ্ন করলেন, "কেন? কারা করেছে?"

"মহিলা মোর্চার সদস্যারা। প্রায় হাজার খানেক মহিলা ওখানে গিয়ে আজ যা ইচ্ছে, তাই করে এসেছে।"

"তুই ওখানে ছিলিস নাকি?"

"হ্যাঁ, দিদি। খবর পেয়ে ওখানে গেছিলাম। সুষমাজির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ। বিধবা জেঠানিকে নাকি পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছেন।"

"তাই নাকি? জেঠানি কি মারা গেছেন?"

"না। তবে বাঁচবেন না। নার্সিং হোমে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। মহিলা মোর্চার মেয়েরা দরজা ভেঙে জেঠানির সঙ্গে কথা বলে এসেছে। ঘটনাটা শুনে মথুরার এস পি নিজে নার্সিং হোমে এসেছিলেন। সুষমাজি খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন কিন্তু দিদি। বেইলেবল অফেন্স না। পুলিশ অ্যারেস্ট করলে নব্বই দিনের আগে কিছুতেই ছাড়া পাবে না।"

"তোর কী মনে হল, পুলিশ অ্যারেস্ট করবে? সুষমার অনেক চ্যা নেল আছে।"

"না দিদি, আমার মনে হয়, যত বড় চ্যানেলই থাক, এ যাত্রায় বাঁচা কঠিন।"

"তোদের কাগজে এই খবরটা বেরোচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ। দিল্লির সব কাগজেও বেরোচ্ছে। আসলে উনি এই কয়েকদিন আগে বিধবাদের সেবা করার জন্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। আর এ দিকে এক বিধবাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। এই অ্যাঙ্গেল থেকেই সব কাগজ স্টোরিটা করবে।" ফোন ছেড়ে বিমলা এ বার চোখ বুঁজলেন। অনেকদিন পর আজ তিনি শান্তিতে ঘুমোবেন।

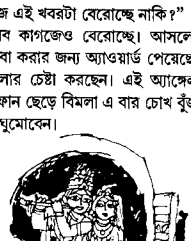

"ইয়ার, তোর কী হয়েছে বল তো? তোকে এত অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড লাগছে।" মুখ তুলে রাজা দেখল, ধর্মেন্দ্র। পরনে ফতুয়া আর ধুতি। কপালে চন্দনের বড় টিপ। তার মানে ও মন্দির থেকে এল। আজ বোধহয় বিশেষ কোনও তিথি আছে। ব্রজবাসীরা এ সব খুব মানে। শত কাজের মধ্যে মন্দিরে যেতে ভোলে না। ধর্মেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে ও বলল, "হ্যাঁ রে, তুই ঠিকই বলেছিস। আজ সারাদিন মনটা খুব খিঁচড়ে আছে।"

"ঘনশ্যামের হুমকিতে তুই ভয় পেয়ে গেলি নাকি?"

ঘনশ্যামের কথা ওকে বলেনি। তা সত্ত্বেও, ধর্মেন্দ্র কী করে জানল ভেবে রাজা একটু অবাক হল। ও বলল, "তুই কার কাছ থেকে শুনলি?"

"সুমনের কাছে। শালাকে দুটো ঝাপড় মারলি না কেন? তারপর দেখা যেত। ও আমাদের আত্মীয় হয়, জানিস তো? কিন্তু দেখা হলে আমি কথা বলি না।"

দোকানে এখন কাজ করছে শুধু সুমন। লাডলা সেই যে সেদিন পালিয়ে গেছে, আর কেউ ওকে বৃন্দাবনেই দেখেনি। দোকানে তাই এখন অনেকটা সময় রাজাকে দিতে হচ্ছে। ও বলল, "দূর, ঘনশ্যামের কথা আমি ভাবছিই না।"

"তা হলে মুখটা বাঁদরের মতো করে আছিস কেন? ওই আমেরিকান মেয়েটা ফের তং করেছে বোধহয়?"

" না রে। অন্য ব্যাপার।" বলেই রাজা পায়েলের দিদির ব্যাপারটা বলল। থানায় প্রথমে শ্রীবাস্তব এজাহার নিতে চায়নি। তারপর মহিলা মোর্চার ভাঙচুরের খবরটা থানায় পৌঁছতেই শ্রীবাস্তব নার্সিং হোম দৌড়েছে। পায়েলরা উঠেছে, বজরঙ্গ ধর্মশালায়। সন্ধেবেলায় ওদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে রাজা দোকানে এসেছে। চলে আসার সময় পায়েলের বাবা ওর হাত দুটো ধরে খুব কাঁদছিল। ওরা সবাই বুঝে গেছে, পায়েলের দিদির বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সামান্য সম্পত্তির জন্য একজন মানুষ আর একজন মানুষকে এমন ভাবে পুড়িয়ে মারতে পারে? রাজা ভাবতেই পারছে না। সুষমা গৌতমকে আগে বেশ কয়েকবার বড়িদিদির বাড়িতে ও দেখেছে। ভদ্রমহিলা তখন খুব চড়া মেকাপ করে আসতেন। হড়বড় করে কথা বলতেন। হ্যা হ্যা করে হাসতেন। দেখে মনেই হত না, এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন। খ্যাতি, ক্ষমতা আর উচ্চাশা মানুষকে কত নীচে নামিয়ে দেয় এই মহিলাটি তার উদাহরণ। সুষমা গৌতম হঠাৎই যেন বদলে গেলেন।

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে রাজা এই আলোচনাই করছিল। এমন সময় ওর দোকানের ছেলেটা এসে বলল, "অনেক কাস্টমার এসেছে। এখুনি যেতে হবে।" পরে শুনব বলে ধর্মেন্দ্র উঠে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে রাজা দেখল, সাহেবদের মন্দিরে আজ প্রচণ্ড ভিড়। তার মানে, একটু পরে ওর দোকানেও কাস্টমার আসতে শুরু করবে। পায়েলের কথা ভাবলে এখন চলবে না। বধূ নির্যাতনের ঘটনা রোজ কত ঘটছে।

সুষমা গৌতমের কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিতেই মনে ভেসে উঠল মিঠুর মুখটা। কাল রাতে রাধাকুঞ্জে ঢুকে যাওয়ার সময় মিঠু ঠিক কী বলেছিল, রাজা মনে করার চেষ্টা করল। তখন কি ওর গলায় রাগ রাগ ভাব ছিল? না, তেমন তো কিছু ছিল না। বরং একটা আন্তরিকতার ছাপই ছিল। মা তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছে। তার মানে, ও চাইছিল, রাজা ভেতরে যাক। ইস, তখন ভেতরে ঢোকা উচিত ছিল। একবার রাধাকুঞ্জে ঢুকে গেলে, ফেরার সময় ঘনশ্যামের পাল্লায় পড়তে হত না।

মিঠুর সঙ্গে কথা বলার জন্য রাজার মনটা ছটফট করে উঠল। কিন্তু আগ্রহটা কি একটু বেশি বেশি দেখানো হয়ে যাবে? সিনেমায় জিতেন্দ্রকে ও একবার এই অবস্থায় পড়তে দেখেছিল। সিনেমা দেখার অভ্যাস ওর নেই। তবুও মোহন টুরিং টকিজে ধর্মেন্দ্র ওকে একবার নিয়ে গেছিল। বৃন্দাবনে পার্মানেন্ট সিনেমা হল নেই। মোহন টুরিং টকিজ শহরের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সিনেমা দেখায়। তা, জিতেন্দ্রর সেই সিনেমার নামটা এখন মনে নেই। রাগ ভাঙাতে জিতেন্দ্র নিজেই শ্রীদেবীর বাড়িতে চলে গেছিল।

জিতেন্দ্রর মতো সাহস পাচ্ছে না রাজা। যদি মিঠু খারাপ ব্যবহার করে? অনেক ভেবে চিন্তে ও শেষ পর্যন্ত ফোন করল।

ও প্রান্তে রিসিভার তুলেই মিঠু বলল, "রাজা, তোমার কাছেই আমরা যাচ্ছিলাম। ভাল হল, তুমি ফোন করেছ। এই তুমি একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে? ভীষণ দরকার। স্যার এসেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।"

গলায় রাগের বিন্দু মাত্র চিহ্ন নেই। বরং উচ্ছ্বাস। শুনতে শুনতে রাজার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। অযথাই ও তা হলে এতক্ষণ টেনশনে ভুগছিল। ও বলল, "কে এসেছেন বললে?"

"আমাদের উওমেন্স ফোরামের ডিরেক্টর। ডঃ কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। কালকেই তো ওঁর কথা তোমাকে বললাম।"

"আমাকে ওঁর কী দরকার?"

"আঃ, রাজা, এত প্রশ্ন কোরো না তো? তোমাকে আসতে বলেছি। চলে আসবে। স্যার আজ রাতেই দিল্লি ফিরে যাবেন। দশ মিনিটের মধ্যে চলে

এসো।"

মিঠুকে চটানোর জন্যই রাজা বলল, "এখন যদি না যেতে পারি, তা হলে কি তুমি কিছু মনে করবে? মানে, দোকানে এখন অনেক কাস্টমার।"

মিঠুর আহত গলায় বলল, "আমার চেয়ে দোকানের কাস্টমার তোমার কাছে বড় হল? ঠিক আছে, যাও তোমাকে আসতে হবে না।" বলে ঠক রিসিভারটা রেখে দিল।

এ প্রান্তে রিসিভারটায় চুমু খেয়ে রাজা মনেমনে বলল, চল ব্যাটা। দশ নয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোকে রাধাকুঞ্জে যেতে হবে। দোকানের অন্য প্রান্তে সুমন ব্যস্ত এক কাস্টমারকে নিয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে রাজা হিসেব করে নিল। যাতায়াত আর কথা বলা মিলিয়ে ঘণ্টা খানেক। ন'টার মধ্যে ফিরে এলেই দোকান বন্ধ করা যাবে। মিঠু একটু আগে বলল, আমার চেয়ে দোকানের কাস্টমার তোমার কাছে বড় হল? উত্তরটা তখন রাজা দেয়নি। এখন মনে মনে বলল, কাস্টমার কেন মিঠু, তুমি আমার দোকানের চেয়েও বড়।

বেহুদার মতো স্কুটার চালিয়ে রাজা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাধাকুঞ্জে পৌঁছে গেল। বাইরের ঘরে বসে আছেন হ্যান্ডসাম এক ভদ্রলোক। বয়স খুব বেশি বলে মনে হল না রাজার। বড় জোর পঁয়তিরিশ। ওর থেকে চার পাঁচ বছরের বড়। পরনে ফুলহাতা শার্ট। ইনিই তা হলে কল্যাণব্রত। রাজা ঘরে ঢুকতেই খুশিতে উচ্ছল হয়ে, লাবণ্যপ্রভার পাশ থেকে উঠে এল মিঠু। তারপর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "স্যার, এ রাজা। এর কথাই আপনাকে বলেছি।"

মিঠুর ছেলেমানুষি দেখে লাবণ্যপ্রভা হাসছেন। বললেন, "কল্যাণবাবু এই ছেলেটাই আমাদের লোকাল গার্জেন বলতে পারেন।"

রাজাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মিঠু বলল, "তুমি স্যারের সঙ্গে কথা বলো। আমি এখুনি আসছি।" কথাটা বলেই ও লাফাতে লাফাতে ভেতরে চলে গেল।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "বাবা, এখানে ননীবালা চক্রবর্তী বলে তুমি কাউকে চেনো? ভদ্রমহিলা বিধবা।"

ননীবালা চক্রবর্তী বলে কাউকে স্মরণ করতে পারল না রাজা। ও বলল, "এই ভদ্রমহিলাকে আপনারা খুঁজছেন কেন?"

এ বার কল্যাণব্রত বললেন, "এই ভদ্রমহিলা আমার আপন কাকিমা। বহু বছর আগে নবদ্বীপ থেকে উনি এখানে চলে আসেন। তারপর আর কোনওদিন ফিরে যাননি। বিশেষ প্রয়োজনে ওকে এখন দরকার হয়ে পড়েছে।"

রাজা বলল, "দেখুন এখানে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বিধবা আছেন। তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। চট করে খোঁজ পাওয়া মুশকিল।"

হ্যাঁ সেটাই স্বাভাবিক। উনি বেঁচে আছেন কী না সেটাও আমরা জানি না। আমার মনে হয়, ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার জানা দরকার। কাকিমা যখন এখানে আসেন, তখন ওঁর বয়স একুশ বাইশ। তার তিন বছর আগে উনি বিধবা হন। তা হলে এখন ওঁর বয়স সাতচল্লিশ। আমার কাকিমার খুব ফেয়ার কমপ্লেকশন ছিল। হাইট পাঁচ ফুটের সামান্য কম। ডান চিবুকে একটা তিল ছিল। প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধান। তখনকার ডেসক্রিপশন দিয়ে অবশ্য এখন ওকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।"

রাজা বলল, "মাঝে আপনারা কেউ খোঁজ করেননি?"

"আনফর্চুনেটলি নট। খোঁজ করার লোক বলতে আমার বাবা আর মা। শুনেছি, কাকিমার উপর ওঁরা খুবই অন্যায় করেছিলেন। বুঝতেই পারছেন। সম্পত্তির লোভে। তাই ওঁরা খোঁজ টোজ করেননি।"

"আপনিই বা কেন এতদিন উদ্যোগ নেননি?"

"দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন। ছোটবেলা থেকে আমি শুনেছি, দাদুর সঙ্গে তীর্থ করতে এসে কাকিমা নাকি মারা যান, হরিদ্বারে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে। আত্মীয়স্বজন পাড়া পড়শীরাও এ কথা জানত। একুশ বছর বয়সে আমি অক্সফোর্ডে পড়তে চলে যাই। মাত্র দু'বছর আগে দেশে ফিরেছি। নবদ্বীপে গিয়ে মাস ছয়েক আগে শুনলাম, কাকিমা মারা যাননি। আমার মা-বাবা মিথ্যে কথা বলেছিলেন।"

"কার কাছ থেকে শুনলেন?"

"নবদ্বীপের একটা ফ্যামিলি এখানে তীর্থ করতে এসেছিল। তারা রাস্তায় কাকিমাকে দেখে। তবে কাকিমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি। কথা বলতে যাওয়ার আগেই উনি একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ফিরে গিয়ে তারা আমাকে সব জানায়। তা দেবলীনা যখন বিধবাদের নিয়ে স্টাডি করার জন্য এখানে এল, তখনই ওকে বললাম, কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ননীবালা চক্রবর্তীর কথা মাথায় রেখো। এর মধ্যে দিল্লিতে আমার একটা কাজ পড়েছে। তাই চলে এলাম। আপনি এখানকার ছেলে। আপনি বলুন, কীভাবে আমি কাকিমাকে খুঁজে বের করতে পারি?"

"একটা কথা বলব? ননীবালা চক্রবর্তীকে খুঁজে বের করে আপনার কী লাভ?"

"অ্যাজ সাচ আমার কোনও লাভ নেই। কিন্তু ওঁর আছে। প্রথমত, আমাদেরই বংশের একজন মহিলা এখানে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। সেকেন্ডলি, কাকিমার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ আমি ওঁর হাতে ফেরত দিতে চাই। ইন ফ্যাক্ট, আমার দাদুর সম্পত্তির পুরো অংশটাই আমি কাকিমাকে লিখে দেব। কাকিমার এত সম্পত্তি, অথচ উনি এখানে ভিক্ষা করে দিন কাটাচ্ছেন, দ্যাট ডাজ নট সাউন্ড গুড। উনি একটু রিলিজিয়াস মাইন্ডের ছিলেন। সম্ভবত সে জন্যই এখানে থেকে যান। আর ওঁকে খুঁজে বের করার সব থেকে বড় কারণ যেটা, সেটা হল, নবদ্বীপে আমাদের মন্দিরের বিগ্রহ এখন ঠিক মতো সেবা পাচ্ছেন না। কারণ আমার বা বা-মা কেউ এখন বেঁচে নেই। শুনেছি, আমাদের মন্দিরটা ছিল কাকিমার প্রাণ। সব সময় ওখানে পড়ে থাকতেন। এনি মোর কোয়েশ্চন?"

রাজা হেসে বলল, "না, আপনার মোটিভটা জানতে চাইছিলাম।"

"তাতে আমার আপত্তির কারণ নেই। এখন বলুন, আমাকে আপনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?"

"আমার স্কুলের প্রিন্সিপাল এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। উনি বিধবাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। অনেককে পার্সোনালি চেনেন। নাম জানেন। দাঁড়ান, ওকে ফোন করে আমি জেনে নিচ্ছি ননীবালা চক্রবর্তীকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

রাজা পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল। বড়িদিদি বলতে পারবে। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। ও প্রান্তে রিঙ হচ্ছে। কিন্তু কেউ তুলছে না কেন? লাইনটা কেটে যাওয়ার পর ও ফের রিডায়াল করল। এ বার এসে তুলল গীতা। বলল, "মাইয়ি, সেই বিকেল থেকে ঘুমোচ্ছে। এখনও ওঠেনি। ডাকব?"

রাজা বলল, "না, তুই বড়িদিদিকে বলবি, রাজা ফোন করেছিল। ঘুম থেকে উঠেই যেন আমাকে ফোন করে। খুব জরুরি, বুঝলি?"

সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাজা বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না, ডঃ চক্রবর্তী। আমরা ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করবই।"

এরই মধ্যে মিঠু জল খাবার তৈরি করে এনেছে। কল্যাণবাবু খেতে খেতে বললেন, "দেবলীনা, তোমার কাজের যা প্রোগ্রেস শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে পেপারটা ভালই হবে। এক মাসের মধ্যে আমার কাছে সব পাঠিয়ে দেবে। মাস তিনেকের মধ্যেই কিন্তু আমি পাড়ি দিচ্ছি আমেরিকা।"

"স্যার, আপনি আর ফিরবেন না?"

"বলতে পারছি না। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নেই ভারতে এসে থাকার। আর সত্যি বলছি,

আমিও ওর সঙ্গে একমত। এখানে কাজ করার স্কোপ নেই। কাকিমাকে পাওয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে আমেরিকা যেতে পারি। দ্যাট ইজ দ্যাট।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কল্যাণব্রত উঠে দাঁড়ালেন। রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। গাড়িতে গেলে দিল্লিতে উনি সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। বাইরে গাড়িতে স্যারকে তুলে দিতে যাওয়ার সময় মিঠু ফিস ফিস করে বলে গেল, "কালকের মতো চলে যেও না। কথা আছে।" ওর আগ্রহ দেখে রাজার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ও তখুনি সিদ্ধান্ত নিল ননীবালা চক্রবর্তীকে খুঁজে বের করার জন্য পুরো বৃন্দাবন ছানবিন করবে।

লাবণ্যপ্রভা কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন, "এখানে আসার পর থেকেই মনে একটা ইচ্ছে জাগছে বাবা। তুমি একটা পরামর্শ দেবে?"

রাজা বলল, "কী ব্যাপারে বলুন?"

"আমি মনস্থির করতে পারছি না। এখানে এত বড় বাড়ি। পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় তিরিশখানা ঘর। এই বাড়িটা আমি বিক্রি করে দেব, নাকি কোনও আশ্রমে দান করব। চরণদাস বাবাজি কাল এসেছিলেন। ওর সঙ্গেও পরামর্শ করলাম। উনি কিন্তু দান করে দিতে বললেন।"

রাজা একটু বিহ্বল হয়ে গেল কথাটা শুনে। নিজেকে সামলে তারপর ও বলল, "আপনি নিজে কী ভাবছেন?"

"আমি একটু অন্য কথা ভাবছি। মিঠুর মুখে এখানকার বিধবাদের দুঃখ দুর্দশার কথা যত শুনছি, ততই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এমন একটা ব্যবস্থা করা যায় না, এই বাড়ির একটা অংশ নিজেদের জন্য রেখে বাকিটা বিধবাদের এনে রাখার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কথাটা দু'তিন দিন ধরে ভাবছি। শুধু মিঠুর সঙ্গেই আলোচনা করেছি। কী ভাবে সেটা করা যায় বলো তো?"

"আপনি আমার বড়িদিদির সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। উনি

আপনাকে ভাল সাজেসান দেবেন।"

"মানে, বিমলা বসু। যাকে তুমি একটু আগে ফোন করেছিলে? আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে যেতে পারো?"

রাজা বলল, "আপনি কেন যাবেন? আমি বড়িদিদিকে নিয়ে আসব। এখানে বিধবাদের জন্য আরও কয়েকটা আশ্রম হয়েছে। তবে আপনার এখানে হলে ভাল হবে। আমি দেখাশোনা করতে পারব।"

"তোমার ভরসাতেই তো আশ্রমের কথা ভাবছি বাবা। তোমার সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে। যা মিঠুর সামনে বলা চলবে না। তোমার বাড়িতেও একদিন যাব ভাবছি। তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসব।"

"মাম্মি এখন এখানে নেই। কলকাতায় গেছেন। যে কোনও দিন এসে পড়বেন। তবে মাম্মি না থাকলেও আমাদের বাড়ি যেতে পারেন। আমার ভাবি আছেন। ভাইয়া আছেন। আর এক ছোট্ট ভাতিজা আছে। কবে যাবেন বলুন, আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।"

লাবণ্যপ্রভা আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন। মিঠুকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "তুমি কিন্তু খাওয়া দাওয়া করে যাবে বাবা। আমি যাই। আজ সন্ধেবেলায় জপ করা হয়নি।"

মা বেরিয়ে যাওয়ার পরই মিঠু বলল, "চলো রাজা, আমার ঘরে চলো। গোয়েন্দা কাহিনীটা দুজনে মিলে ছকে ফেলি।"

রাজা বলল, "কিসের গোয়েন্দা কাহিনী?"

"এই যে ননীবালা উদ্ধারের কাহিনী। নান্বার ওয়ান কাজ, সেই পাণ্ডাকে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি ননীবালা ও তাঁর শ্বশুরকে বৃন্দাবনে নিয়ে এসেছিলেন। স্যার বলে গেলেন, তার নাম দ্বারকা পাণ্ডা। নবদ্বীপে তার অনেক যজমান ছিল। সে বার নবদ্বীপ থেকে বড় একটা দল তিনি নিয়ে এসেছিলেন।"

রাজা বেশ অবাক হয়ে বলল, "বাহ, তুমি তো একটা ভাল ইনফর্মেশন এনেছ। ওই পাণ্ডাও ননীবালার খবর দিতে পারবে।"

মিঠু বলল, "দুর্ভাগ্যের কথা কী জানো, মেয়েরাও যে ভাল গোয়েন্দা হতে পারে, তা আজ কেউ ভেবে দেখল না। কোনও লেখকের মাথাতেও এল না। আমি একটা একজাম্পল সেট করব। তুমি হবে আমার অ্যাসিসটেন্ট।"

রাজা বলল, "তোমার মাথা খারাপ? এ গল্পে আমি অন্তত নেই। তার চেয়ে দু'জনেই ইন্ডিপেনডেন্টলি কাজে নামি। দেখা যাক, কে সাকসেসফুল হয়।"

মিঠু হাত মুঠো করে বলল, "চ্যালেঞ্জ?"

রাজা বলল, "না বাবা, আমি চ্যালেঞ্জ করব না। শেষে তুমি হেরে গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে চলো, বসে অন্য গল্প করি।"

"ভীতু কোথাকার।" বলে মিঠু ঘরের দিকে এগোল।

এ বাড়িতে আগে বেশ কয়েকদিন এসেছে রাজা। কখনও মিঠুর ঘরে ঢোকেনি। আজ ঢুকে দেখল, বেশ সাজানো গোছানো। অ্যাটাচড বাথও আছে। ড্রেসিং টেবলের উপর মিঠুর একটা ছবি। বোধহয় কোনও স্টুডিওতে গিয়ে তোলা। রাজা ছবিটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। মিঠু খাটের উপর হেলান দিয়ে বসেছে। মুখোমুখি বসলে ড্রেসিং টেবলটা দেখা যাবে না। তাই রাজা খাটে না বসে সোফায় গিয়ে বসল। ওই ছবিটা বারবার দেখার জন্যই।

কোলে একটা বালিশ টেনে নিয়ে মিঠু বলল, "জানো রাজা, বৃন্দাবনে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। অনেক ভেবে মনে হল, ওয়ান অফ দ্য রিজন তুমি। কাল নিধু বন থেকে ফেরার পর সেটা আরও টের পেলাম। টু বি ভেরি অনেস্ট, কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি শুধু তোমার কথা ভেবেছি।"

রাজা বলল, "কাল রাতে আমারও স্রেফ তোমার কথাই মনে হয়েছে।"

"বানিয়ে বলছ না তো রাজা?"

"একেবারে না। রাজা মিত্র কখনও কিছু বানিয়ে বলে না।"

মিঠু চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, "এই টিউব লাইটটায় বড্ড আলো। যদি কম পাওয়ারের আলো জ্বালাই তা হলে কি তুমি কিছু মনে করবে রাজা?"

"কী অদ্ভুত কথা বলছ মিঠু? এখনও এত ফর্মাল কথা বলছ কেন?"

মিঠু উঠে গিয়ে কম পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর সোফায় রাজার পাশে এসে বলল, "জানো রাজা, আজ যদি তুমি ফোনটা না করতে, তা হলে তোমার মুখই দেখতাম না। সারাদিনটা আমি খুব ছটফট করেছি। কেন এমন হল বলো তো?"

কোনও কথা না বলে মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রাজা। পনেরো বছর আগে যেদিন ও মিঠুকে প্রথম দেখে, সেদিন কি ভাবতে পেরেছিল, একই সোফায় বসে কোনও দিন মুখোমুখি গল্প করতে বসবে? সোফায় মাথাটা হেলান দিয়ে বসেছে মিঠু। ওর পীনোদ্ধত স্তন দুটো রাজার চোখের সামনে। পেটের কাছে খাঁজ নেমে গেছে নাভি বেয়ে। ও আর তাকাতে ভয় পেল। নীল মায়াবী আলোয় মিঠুকে স্বপ্নপুরীর কোনও মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। সারাটা শরীর শিরশির করে উঠল ওর।

"আমি কলকাতায় ফিরে গেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে?"

আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না রাজা। মিঠুর হাতটা কোলে তুলে নিয়ে বলল, "তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে? তুমি এখানেই থাকবে।"

"না রাজা, তুমি আমার সব কথা জানো না। আমার জীবনের উপর দিয়ে এর মধ্যেই অনেক ঝড় বয়ে গেছে। আমার ফ্যামিলিটা অভিশপ্ত ফ্যামিলি রাজা। অন্য কাউকে আর জড়াতে ইচ্ছে করে না।"

মিঠুর হাতটা নিজের গালে ঠেকিয়ে রাজা বলল, "কী হয়েছে তোমার, আমায় বলো। আমি সব কথা শুনতে চাই।"

"না, না। আজ না। আজ থাক। পরে কোনওদিন শুনো। আমায় একটা কথা দেবে রাজা? মা হয়তো আর কলকাতায় ফিরবে না। মা এখানে থাকলে, তুমি রোজ এসে দেখাশুনো করবে তো?"

"এই ডিসিসনটা হঠাৎ উনি কেন নিচ্ছেন মিঠু? আমাকে উনি আজই বলছিলেন এখানে একটা আশ্রম খুলতে চান।"

"মা কি তোমায় বলেছে, কাল যে ভদ্রলোক কানাই পাণ্ডার সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি কেন এসেছিলেন?"

"না। উনি বলেননি।"

"আমি বলছি। কী আর বলব লজ্জার কথা? দোলের সময় এখানে এসে দাদা ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে গেছিল। এই বাড়িটা বিক্রি করবে বলে। সব সম্পত্তি এখন মায়ের নামে। অথচ মা কিছু জানে না। ভাবতে পারো?"

"মাই গড। টাকাটা ভদ্রলোক দিলেন কেন?"

"জাল দলিল দেখিয়েছে। কানাই পাণ্ডা কাল মায়ের কাছে সাধু সাজল। কিন্তু আমার মনে হয়, কানাই পাণ্ডাও এই চক্রে আছে। যাক গে, তোমার কাছে বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই রাজা। মাকে আমি বলেছি, সব বিক্রি করে দিয়ে চলো আমরা কলকাতা ফিরে যাই।"

রাজা বলল, "তোমার ধারণাই ঠিক। কানাই পান্ডাও এর মধ্যে আছে। ওরা ইচ্ছে করলে বহুত ঝামেলা করতে পারে। বাড়ি নিয়ে লিটিগেশন খুব বাজে। মথুরা কোর্টে প্র্যাকটিস করার সময় আমি অনেক কেস দেখেছি।"

"মা ভদ্রলোককে কাল বুঝিয়ে দিয়েছে, এখানে খুব একটা সুবিধে হবে না।"

রাজা বলল, "যতটা সহজ তুমি ভাবছ, ততটা না। বৃন্দাবনে বড় একটা চক্র অনেক দিন ধরেই কাজ করছে। এরা সেই বাড়িগুলোকে টার্গেট করে, যার মালিকানা এখন কোনও বিধবার হাতে। অথবা যে বাড়ির প্রচুর শরিক। বাঙালিদের বাড়ি নিয়েই বেশি লিটিগেশন। এখনকার জেনারেশনের ছেলেদের বৃন্দাবন সম্পর্কে অতটা মোহ নেই। হয়তো স্থানীয় কোনও লোকের উপর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে বাড়ি দেখাশুনোর। নিজেরা কলকাতা বা অন্য কোথাও থাকে। ব্যস, কেয়ারটেকার লোকটা খেল শুরু করে দিল। শরিকে শরিকে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। অথবা বিধবা মালকিনকে গুণ্ডা বদমাস দিয়ে ভয় দেখাতে লাগল। একটা সময় বাড়ির মালিক বা মালকিন বিরক্ত হয়ে গেল। ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত ওই চক্রের কাছেই বাড়িটা বিক্রি করতে বাধ্য হল। এবং খুব অল্প দামে।"

মিঠু সব শুনে বলল, "মা অন্য ধাতুর মানুষ। বুঝলে, এ সব হতে দেবে না। কানাই পাণ্ডা কাল সেই যে ধমক খেয়ে গেছে, আর সারা দিন এদিকে আসেনি।"

দু'জনে কথা বলার মাঝেই লোডশেডিং হয়ে গেল। গরমের সময় বৃন্দাবনে খুব ঘনঘন লোডশেডিং হয়। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যেতেই রাজা অস্বস্তিতে পড়ে গেল। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মিঠাই, চলো ছাদে যাই।"

মিঠুও উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রায় ওর গা ঘেঁষে। ফিসফিস করে ও বলল, "কী বলে ডাকলে তুমি রাজা?"

"মিঠাই।"

রাজার একটা হাত তুলে নিজের গালে চেপে ধরল মিঠু। এত গরম যে, হাতটা গাল স্পর্শ করতেই রাজা চমকে উঠল। নিধু বনের স্মৃতি আবার ফিরে আসছে। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। বারান্দার ও পাশে কাজের মেয়েটা একটা তেলবাতি জ্বালিয়ে অন্য ঘরের দিকে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে আসা আবছা আলোটা ঘুরে চলে গেল। সেই আলোয় মিঠুর মুখটা দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারল না রাজা। ওকে কাছে টেনে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। ওর ঘাড়ে, গালে, ঠোঁটে, গলায়। মিঠুর শরীরটা এখন

পাখির পালকের মতো। পুরো ভর দেওয়া রাজার শরীরের উপর। ওকে নিয়ে রাজা বসে পড়ল সোফায়। ও ভুলেই গেল, কোথায় রয়েছে এবং কী করছে।

ঠিক সেই সময়, পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। মিঠুকে জড়িয়ে রেখেই ফোনটা অন করে রাজা বলল, "হ্যালো?"

"লালা, বড়িদিদি বলছি রে। ফোন করেছিলি? তোর কী হয়েছে? তুই এত হাঁফাচ্ছিস কেন রাজা?"

চাঁপা ঠিক করেই ফেলেছে, পেটের সন্তান নষ্ট করবে না। ওকে অনেক করে বুঝিয়েছে ননীবালা। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার অর্থ, অনেক দায়িত্ব। কে পালন করবে সেই সব? তা ছাড়া গোঁসাই বা রাজি হবে কেন? কুমারী মেয়ের গর্ভে বাচ্চা এসে গেছে, এই কথাটা চাউর হলে আশ্রমের বদনাম হয়ে যাবে। এই সব কথা কখনও চাপা থাকে না। আজ না হোক, দু'দিন পর কেউ না কেউ বাইরে লোকের কাছে বলে দেবে। কথায় এঁটে উঠতে না পেরে চাঁপা একটু আগে নীচে নেমে গেছে। ওর জেদ দেখে ননীবালা অবাক। এই রকম শান্তশিষ্ট একটা মেয়ের ভেতর যে এমন গোঁ থাকতে পারে, ও তা ভাবতেও পারেনি।

বালিশের নীচে বৈষ্ণব পদরত্নাবলী বইটা রেখে ননীবালা নীচে খেতে গিয়েছিল। মনটা শান্ত করার জন্য ও ফের বইটা টেনে নিয়ে পড়তে লাগল।

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাহি কেউ ॥
দেখ সখী নবীন কণ্ডারী শ্যামরায়
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায় ॥
নেয়ের নাহির ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চায় মোরে
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ...

পদাবলীর নীচে সরল গদ্যে সব অর্থ লেখা আছে। ননীবালা পড়তে লাগল, বৃন্দাবনের মানস হ্রদের তীরে মেঘলা আকাশের নীচে সহচরীদের নিয়ে রাধা উপস্থিত হলেন। ইচ্ছে ওপারে যাবেন। আজ খেয়া পারাপার বন্ধ। মাঝি নেই। কেবল একজন নবীন মাঝি নৌকা নিয়ে এগিয়ে এল। সাহসভরে রাধা সখীদের নিয়ে তাতেই উঠলেন। মাঝ নদীতে পৌঁছে নৌকা যখন টলমল করছে, তখন রাধা ভয় পেয়ে গেলেন। বাতাসে গতিবেগ বেড়ে গেছে। মেঘ আরও ঘনীভূত আকাশে। কৃষ্ণ যেন অপটু মাঝি। কম্পমান রাধাকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ সাহস দেওয়া সত্ত্বেও রাধার প্রমাদ আরও বাড়ে। বেলা চলে গেল, অথচ নৌকা ও পারে পৌঁছল না। এখন কী হবে?

পৃষ্ঠা উল্টে ননীবালা পরের অংশটা পড়তে যাবে, এমন সময় মুখ তুলতেই হঠাৎ ও দেখল, পারুল বুড়ি পায়খানা থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে। বই বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে ও বেরিয়ে এল। ওকে সামনে দেখে পারুল বুড়ি বলল, 'অ ননীবালা, আমাকে কী আম এনে খাওয়ালি? দাস্ত শুরু হয়ে গেচে।"

অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল ননীবালার। দুর্বল গলায় ও বলল, "কয়বার অইল?"

"মনে নেই। জলের মতো বেরুচ্ছে। এখন আর ওঠার ক্ষমতা নেই রে। আমার পয়সা দিয়ে কী আম তুই কিনে আনলি?"

পারুল বুড়িকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গেল ননীবালা। শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। পারুল বুড়িকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই, একটা অপরাধবোধ ননীবালাকে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। অসুস্থ লোকের দেওয়া আম কেন ও এনে দিল? শেঠানির অসুখটাই নিশ্চয় ঢুকে পড়েছে পারুল বুড়ির দেহে। এ সব এখনও পৃথিবীতে হয়। মনে মনে গোবিন্দকে ডাকতে লাগল ননীবালা। চট করে একটা কথাই ওর মনে হল। গোবিন্দজির মন্দির থেকে একটু চরণামৃত নিয়ে এসে খাইয়ে দিলেই বুড়ি উঠে দাঁড়াবে। এর আগে শৃঙ্গারবটে থাকার সময়, ওর নিজেরও একবার দাস্ত হয়েছিল। তখন ওই চরণামৃতই ওকে সুস্থ করে তুলেছিল।

কথাটা মনে হতেই ননীবালা নিজের ঘরে এসে পরনের থানটা বদলাতে লাগল। বেলা পড়ে এসেছে। তবে পুরো অন্ধকার হতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। সন্ধ্যা নেমে গেলে ফেরার সময় অসুবিধা হবে। গুরুকুলে আসার পথে বড় একটা কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে আসতে হয়। সেই নর্দমার পাশ দিয়ে আসার সময় প্রায় দিনই ননীবালার মনে হয়, ও পড়ে যাবে। পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না। কেন এ কথাটা রোজ মনে হয় ও বুঝতে পারে না।

ঘরে পায়ের শব্দে ননীবালা বুঝতে পারল, চাঁপা এসেছে। থান পাল্টাতে দেখে ও জিজ্ঞেস করল, "বাইরাইতাস নাহি মাসি?"

খোটে পাঁচ টাকার নোট গিঁট দিয়ে, কাঁধের উপর ফেলে ননীবালা বলল, "তর কাইজ কাম চুকল? সিঁড়ি দিয়া অত উঠানামা করিস না।"

চারপাইয়ের উপর বসে চাঁপা বলল, "মাসি, আমার একটা কাম কইর‍্যা দিবা?"

ওর অনুরোধ শুনে ননীবালার মন গলে গেল। বলল, "কী রে মা?"

পোস্টোকার্ডডা তোমার কাছে আছে না? দাদার কাছে একডা চিঠি লিইখ্যা দিবা?"

আজ দুপুরেই চিঠি লিখতে মানা করেছিল চাঁপা। হঠাৎ ওকে মত বদলাতে দেখে ননীবালা একটু অবাকই হল। চট করে এখন চিঠিটা লিখে ফেললে মন্দিরে যাওয়ার পথে ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়া যাবে। ঝোলার ভেতর থেকে পোস্টকার্ডটা বের করে ও বলল, "কী লিখুম ক। তর দাদারে কি বৃন্দাবনে আইতে লিখুম?"

চাঁপা বলল, "বৃন্দাবনে আইতে কও, কিন্তু এহানে না। গোসাই ঠাকুর আমারে যাইতে দিব না। আমারে পলাইয়া যাইতে অইব।"

কথাটা শুনে ননীবালা মনে মনে হাসল। বোকা মেয়ে। কারও সাহায্য ছাড়া ও পালিয়ে যেতে পারবে? অসম্ভব। এই চিঠি পাঠানোর পর ওর দাদার এখানে আসতে অন্তত হপ্তা তিনেক লাগবেই। বোনকে উদ্ধার করার সদিচ্ছা যদি থাকে, তবেই। না থাকলে এই চিঠি পড়েই সে ছিঁড়ে ফেলবে। আর এদিকে আশায় আশায় দিন গুণে যাবে চাঁপা।

চট করে এসব ভেবে নিয়েই ননীবালা বলল, "পলাইয়া যাইতে চাইস ক্যান?"

"গোঁসাই অহন কইল, প্যাট পরিষ্কার না কইরলে আমারে শ্যাঠের বাড়ি পাঠাইয়া দিব। অগো স্যাবা কইরতে। মাসি আমি যামু না।"

ননীবালা মুহূর্তেই ওর আশঙ্কার কথা বুঝে জিজ্ঞেস করল, "ঘরে তহন আর কেডা ছিল?"

"জয়া। ও সাউকারি মারে। কইল, অনেক সতী সাজছস। অহন থেইক্যা শ্যাঠের বাড়ি যাবি।"

"তুই কইলি না ক্যান, যাম না?"

"কইলে শুনব? গোসাইয়ের ঘরে যাম না কইসিলাম। জয়া আমারে পিটাইল। তুমি তহনও এহানে আসো নাই। ও জোর কইর‍্যা আমারে গোসাইয়ের ঘরে ঢুকাইয়া দিল। মা রে মা, মইসের মতো ফাল দিয়া, আমারে ধইর‍্যা গোসাই চিত কইর‍্যা ফালাইল। পরথম দিন আমারে চিরা ফ্যালাইসে গো মাসি। রক্তে ভাইস্যা যায় গদি। কয় কী, আইজ থেইক্যা তুইও আমার স্যাবাদাসী হইলি।"

ননীবালার রাগ হচ্ছে শুনে। ধর্ষিতা হওয়ার অভিজ্ঞতা ওরও আছে। ও বলল, "তুই তহন চিক্কুর পারলি না ক্যান?"

"পারসিলাম মাসি। জয়া গিয়া মুখ চাইপ্যা ধরল। আমি এহানে থাকুম না মাসি। তুমি আমারে বাঁচাও। অরা আমার বাচ্চা নষ্ট কইর‍্যা দিব। মীরারে ডাকসে। কাইল আইব। বাড়িতেই প্যাট খসাইয়া দিব।"

মীরার কথা ননীবালা শুনেছে। কখনও নিজের চোখে তাকে দেখেনি। নার্সিংহোমে নার্সের চাকরি করে। কিন্তু সেটা ওর আসল রোজগার না। বৃন্দাবনে এখনও অনেক রক্ষণশীল পরিবার আছে। যারা গর্ভবতী মেয়ে বা বউকে নার্সিংহোম বা হাসপাতালে পাঠায় না। মীরাকে ডেকে আনে বাড়িতে। ওকে দিয়ে প্রসব করায়। মীরা ইদানীং গর্ভপাতও করাচ্ছে। এর জন্য পাঁচশো টাকা করে নেয়। মীরার কথা ভাবার সময় এখন ননীবালার হাতে নেই। চাঁপার দু'তিন লাইনের চিঠিটা লিখে নিয়েই ও দৌড়বে গোবিন্দজির মন্দিরে। পারুল বুড়ির অবস্থা ভাল ঠেকছে না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শুনেই চাঁপা চুপ। কমলা, কনক কথা বলতে বলতে একসঙ্গে উঠে আসছে। এই বেলায় দিবানিদ্রা দেবে। ওদের ঘরে পাখার ব্যবস্থা আছে। একবার এ ঘরের দিকে তাকিয়ে ওরা পাশের ঘরে

ঢুকে গেল। চাঁপার কথা ওরা জানে? মনে হয় না। এখানে কারও জন্য কারও মাথা ব্যথা নেই। তাৎক্ষণিক সুখের জীবন। দীর্ঘশ্বাস চেপে ননীবালা বালিশের তলা থেকে কলম বের করে চিঠি লিখতে বসল। যে করেই হোক, চাঁপাকে এই পাঁক থেকে টেনে তুলতেই হবে। বেশি কথা লেখার দরকার নেই। চাঁপা দেশে ফিরতে চায়। এখন এখানে আছে, বলে তলায় ও বিমলা মাইয়ির ঠিকানা লিখল। আশ্রম নয়, চাঁপাকে ওই ঠিকানা থেকে নিতে হবে। চাঁপার দাদার ঘটে যদি সামান্য বুদ্ধি থাকে তা হলেই বুঝে নেবে, বোন বৃন্দাবনে কী অবস্থায় আছে।

চিঠিটা জপের ঝোলায় পুরে ননীবালা পারুল বুড়ির ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। কেমন যেন নির্জীবের মতো লাগছে। কাছে গিয়ে নাকের তলায় আঙুল দিয়ে ও আন্দাজের চেষ্টা করল, বুড়ির শ্বাস আছে কী না? না, আছে, পড়ছে। আশ্রম থেকে ও দ্রুত বেরিয়ে এল। রোদ পড়ে গেছে। আকাশটা এখন ঘষা কাচের মতো। এই আলো এখন বেশ কিছুক্ষণ থাকবে। গুরুকুলের মেঠো রাস্তা দিয়ে ননীবালা তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। আশপাশে ধানখেত। গেরস্থ বাড়ির চালে ময়ূর দেখে ও বুঝল, বৃষ্টি নামতে আর খুব বেশি দিন দেরি নেই। বৃষ্টির কয়েকদিন আগেই ময়ূর ময়ূরীর দেখা মেলে। কী করে যেন ওরা আগাম খবরটা পেয়ে যায়। বিশ বাইশ বছর আগে প্রচুর ময়ূর দেখা যেত বৃন্দাবনে। সংখ্যাটা এখন অনেক কমে গেছে।

উল্টো দিক থেকে একটা জোয়ান ছেলে মোটর বাইক চালিয়ে এ দিকে আসছে। পরনে সাদা হাফ শার্ট, আর লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি। দেখেই বোঝা যায় ব্রজবাসী। ননীবালার সামনে ফট করে বাইকটা দাঁড় করিয়ে ছেলেটা বলল, "এ্যাই মাইয়ি, তুই এই আশ্রমে থাকিস?"

"হ বাবা।" ছেলেটার চাউনি দেখে সতর্ক ননীবালা। আশ্রমে অনেক যুবতী মেয়ে। কী মতলবে আশ্রমে যাচ্ছে, কে জানে? তবে ছেলেটা মাইয়ি বলে সম্বোধন করেছে। এ্যাই বুঢটি বলেনি। ননীবালা পরের সম্বোধনটা পেতেই অভ্যস্ত।

বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, "মাইয়ি, এই আশ্রমে ননীবালা চক্রবর্তী বলে কেউ থাকে রে?"

নিজের নামটা শুনে ননীবালার ভুঁ কোঁচকাল। বিমলা মাইয়ির ওখানে যাতায়াত করার জন্য ও এখন অনেক অভিজ্ঞ। আগ বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দেবে না। আগে জেনে নেবে, ছেলেটা কী কারণে ওর কাছে এসেছে। একটা জিনিস পরিষ্কার, ছেলেটা যেই হোক, যে দরকারেই আসুক, ওকে চেনে না। শৃঙ্গার বটের কোনও ঝামেলা নয় তো? উৎখাতের দিন সেই ছেলেটার মাথা ফাটানোর কেসও হতে পারে। কথাটা মনে মনে ভেবে নিয়ে ও বলল, "হ থাকে। তারে খুজতাছ ক্যান?"

"ওই মাইয়িকে আমার দরকার আছে। আমার যজমান নবদ্বীপ থেকে খবর পাঠাল। ওই মাইয়িকে নবদ্বীপ নিয়ে যেতে হবে।"

কথাগুলো শুনে ননীবালার বুকের রক্ত চলকে উঠল। এতদিন বাদে, হঠাৎ? কার ওকে দরকার পড়ল? তখনই ওর মনে পড়ল, ক'দিন আগে আচুকি বলেছিল বটে। বাড়ি থেকে তোর ডাক আসবে। কী করে ও জানল? দ্রুত মনের ভাব চাপা দিয়ে ননীবালা বলল, "তুমি যারে খুজতাস, সে অহন নাই। মথুরায় গেসে। অহন পাইব্যা না। দুই দিন পরে পাইব্যা।"

"তোর সঙ্গে ওই মাইয়ির দেখা হবে?"

"ফিইব্যা আইলে।"

"বলবি, ঘনশ্যাম পাণ্ডা এসেছিল। দোয়ারকা পাণ্ডার সব থিকে ছোট ছেলে। ব্যাস, আমার বাপের নামটা করবি। তাহলে বুঝে যাবে।"

"ওহ, এ তা হলে দোয়ারকা পাণ্ডার ছেলে। রাগ চেপে রেখে ননীবালা বলল, ঠিক আসে, কমুনে।"

আর কথা না বাড়িয়ে ননীবালা এগিয়ে গেল। ছেলেটা বাইক ঘোরাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে হবে। রাগে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ও হাঁটতে শুরু করল। এই দোয়ারকা পাণ্ডা নবদ্বীপে গিয়ে ওর সম্পর্কে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। শ্বশুরমশাই নাকি ওর অবহেলার জন্যই মারা গেছেন। ননীবালা জানে, ভাসুর ও জা এই মিথ্যে কথাটা ওকে দিয়ে বলিয়েছিল। পরে জগদীশপ্রসাদের কাছ থেকে ও কথাটা শোনে। ননীবালা তো ঠিক করেই রেখেছিল, নবদ্বীপে আর কোনও দিন ফিরবে না।

তা হলে এই মিথ্যে রটনার কী প্রয়োজন ছিল?

যাক গে, নবদ্বীপের কথা ভাবার অনেক সময় পাবে। এখন ভাবার দরকার নেই।

পারুল বুড়ির জন্য ও এখন মন্দিরে যাচ্ছে। এখন পারুল বুড়ির কথাই ননীবালা ভাবতে চায়। বুড়ির খারাপ কিছু হলে, সারা জীবন ও নিজে অপরাধ বোধে ভুগবে। মথুরা-বৃন্দাবন রোডে পৌঁছে ডাক বাক্সে চাঁপার চিঠিটা ফেলেই ননীবালা দ্রুত হাঁটতে লাগল মন্দিরের দিকে।

বৃন্দাবন থানার কাছে পৌঁছে ও দেখল, প্রচণ্ড ভিড়। প্রায় হাজার দুয়েক নানা বয়সী মহিলা স্লোগান দিচ্ছে। সুষমা গৌতমকে গ্রেফতার কর। অনেকের হাতে প্লাকার্ড। বধূ নির্যাতনকারী সুষমার শাস্তি চাই। বিধবা হত্যাকারী সুষমাকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। সব অবশ্য হিন্দিতে লেখা। বিমলা মাইয়ির বাড়িতে ওই ঢঙি মেয়েটাকে ননীবালা বহুবার দেখেছে। তবে ইদানীং বিমলা মাইয়ির সঙ্গে যে সম্পর্কটা ভাল নেই, সেটা মাইয়ির টুকরো কথাতেই ও বুঝতে পারত। ওই ঢঙি মেয়েটা আবার কাকে হত্যা করল? কৌতূহল মেটানোর জন্য ননীবালা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভিড়ের মাঝে নানা কথাবার্তা হচ্ছে। নার্সিংহোমে গিয়েছিল একজন। কী দেখেছে বা শুনেছে, তার বিবরণ দিচ্ছিল। নিজের জায়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর সুষমা নাকি পুরো ব্যাপারটা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নার্সিংহোমের একজন নার্স মীরা, আগুনে পোড়ানোর কথাটা ফোন করে জায়ের বাপের বাড়িতে জানিয়ে দেয়। মেয়েটার ভাই, বোন আর বাবা ঠিক সময়ে এসে না পড়লে লাশ গায়েব হয়ে যেত। কথাগুলো ননীবালা শুনছে আর নিজের কথা ভাবছে। সম্পত্তি খুব বাজে জিনিস। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ও যদি নবদ্বীপে ফিরে যেত, তা হলে হয়তো ওরও এই দুর্গতি হতে পারত। স্বামী মরে গেলে মেয়েদের আর রইলটা কী? এই প্রথম ননীবালার মনে হল, ভাসুর আর জায়ের আশ্রয়ে না গিয়ে তখন ও ভালই করেছিল।

থানার ভেতর থেকে কে একজন খবর নিয়ে এল, সুষমা গৌতমকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে পুলিশ। দু এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল। একটা বড় তেঁতুল গাছের নীচে লাল সিমেন্টের গোল বেদি দেখে ননীবালা তার উপরে উঠে দাঁড়াল। তখনই থানার গেটের দিকটা ও পরিষ্কার দেখতে পেল। গেটের সামনে বসে রয়েছে বেশ কিছু মহিলা। থানা থেকে কাউকে বোধহয় বেরতে দিচ্ছে না। হঠাৎই ননীবালার মনে হল, সুষমা গৌতমকে নিয়ে এখানে যা ঘটছে, বিমলা মাইয়ি কি তা জানে? নিশ্চয় জেনে গেছে। সকাল থেকে এত ঝামেলা চলছে। কেউ না কেউ বিমলা মাইয়িকে জানিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর বেদি থেকে নেমে যাওয়ার কথা ননীবালা যখন ভাবছে, সেই সময়ই ধুলো উড়িয়ে একটা জিপ এসে থামল গেটের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। শুরু হয়ে গেল সুষমার নামে গালাগাল। জিপের উপর অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিশ লাঠি চালিয়ে মহিলাদের সরিয়ে দিচ্ছে। সুষমাকে জিপ থেকে নামিয়ে আনল পুলিশ। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে ঢঙি মেয়েটা। পুলিশের পিছন পিছন দৌড়চ্ছে। জিপ থেকে নামার আগেই ও নিশ্চয় মানুষের মুখগুলো দেখেছে। বুঝে গেছে, নাগালের মধ্যে পেলে এই মানুষগুলো ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

গেট থেকে পনেরো কুড়ি গজ দূরে বারান্দা। সেখানে পৌঁছনোর আগেই পিছন থেকে উড়ে যাওয়া একটা ইটের আঘাতে সুষমা বসে পড়ল। বেদি থেকে ননীবালা স্পষ্ট দেখতে পেল, ওর কাঁধের কাছটা রক্তে ভিজে গেল। থানার বারান্দা লক্ষ্য করে আরও ইট উড়ে যাচ্ছে। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ এ বার মারমুখি হয়ে বেরিয়ে আসছে। বেদির উপর থাকা আর নিরাপদ মনে করল না ননীবালা। নেমে এসে ও পিছনের গলি ধরল। আর তখনই ওর মনে পড়ল পারুল বুড়ির জন্য ও চরণামৃত আনতে বেরিয়েছে। ইস, অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে। তাই দ্রুত ও মন্দিরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

মন্দিরে পৌঁছে ননীবালা দেখল, তখনও দরজা খোলেনি। অন্য দিন বিকেল পাঁচটা থেকেই সন্ধ্যারতির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। তিন চার জন সেবাইত এসে জোগাড় দিতে থাকে। চরণামৃত নিয়ে বসে থাকে একজন। আজ কেউ নেই। বিশেষ কোনও তিথি আছে বোধহয়। ননীবালা স্মরণ করতে পারল না। বাইরে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। ও বাইরে সিঁড়িতে গিয়ে বসল। দর্শনার্থীদের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়বে এখন। সিঁড়িতে বসার জায়গাটুকুও পাওয়া যাবে না।

আগে এই মন্দিরটা সাত তলা উঁচু ছিল। একেবারে উঁচুতে একটা প্রদীপ জ্বালানো হত। রোজ রাতে এক মণ ঘি দিয়ে। সেই প্রদীপের আলো দেখা যেত দিল্লি থেকে। দিল্লির মসনদে তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব। একদিন রাতে দিল্লির প্রাসাদ থেকে প্রদীপের শিখা দেখে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী দেখা যাচ্ছে? পার্ষদরা বললেন, মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে।

এই মন্দিরের সঙ্গে ওর নিজেরও কম স্মৃতি জড়িয়ে? কত বিপদ থেকে

যে গোবিন্দ ওকে বাঁচিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সে বার যমুনায় ভয়ঙ্কর বন্যা হল। শৃঙ্গার বটে ওদের বাড়ি ঘর সব ডুবে গেল। ননীবালা এসে উঠেছিল মন্দিরের এই সিঁড়িতে। জল এই সিঁড়ি অবধি এল। তারপর এক বেলার মধ্যে নেমে গেল হাঁটু পর্যন্ত। গোবিন্দর অসীম মহিমা।

"অ দিদি, সুষমার কাণ্ড শুনেচ?"

পিছন থেকে কে যেন বলল কথাটা। ননীবালা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কণিকা। বংশী বটের দিকে থাকে। সমবয়সী। অনেক দিন ধরে বৃন্দাবনে আছে। তাই চেনা। কণিকা প্রতি বছর নিয়ম করে দেশে যায়। ছেলের সংসারে মাস খানেক করে কাটিয়ে আসে। মাঝে কিছু দিন কণিকা এখানকার নবনীড় আশ্রমে গিয়ে ছিল। তখন সুষমা মাইয়ির খুব প্রশংসা করত। আর বিমলা মাইয়ির নামে নিন্দা। এখন সুষমা সম্বোধন করে তাচ্ছিল্য করছে! ননীবালা উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, "হ শুনছি।"

"পুলিশ নাকি মারতে মারতে বাড়ি থেকে নিয়ে গেচে। শুনলুম, কালই কোর্টে তুলবে। চব্বি মাগী। ওকে মারাই উচিত। আমাদের কম ট্যাকা মেরেচে?"

"কবে মারল?"

"আর বোলো না, গরমেন্ট থেকে সে বার কুড়িটা সেলাই কল দিল আমাদিগের জন্যি। মাত্তর ছ'টা দিয়ে বাকি ক'টা মেরে দিলে গা? আমাদিগে বলল, গরমেন্ট থেকে যদি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে তোমাদিগে ক'টা কল দিয়েচে, বলবে কুড়িটা। কীরম মেয়েছেলে বলো!"

ননীবালা বলল, "তোমরা তাই কইল্যা বুঝি?"

"কইতে হলো। সুষমার সনে আরেকটা মাগি আছে। অনুশীলা। সেটাও বজ্জাতের হাড়। ওর জন্যিই তো নবনীড় থেকে বেইরে এলুম।"

"ক্যান ও কী করসে?"

"আরে, একাদশীর দিন বললুম, অন্যদের যা দিচ্চ, দাও। আমাদিগের জন্যি একটু সাবু দানার ব্যবস্থা করে দাও। বামুনের ঘরের বেধবা আমরা। খেতে সাধ হয়। তা শুনে আমাদিগে গাল দেয়। শেঠোরা আমাদিগের জন্যি ফল পাটায় সেই ফল চলে যায় ওই সুষমার বাড়িতে।"

"নবনীড় থেইক্যা বাইর হইয়া আইল্যা ক্যান?"

"কী করব বলো। কোত্থেকে তিনটে নেপালি বুড়িকে ধরে আনল। তাদের কত তোয়াজ! ওদের বাইরে বেরুতে দেয়। ভাল ভাল খাওয়ায়। আমাদিগে দেয় না। বললুম, খুত্তোর। এখানে থাকবই না।"

ননীবালা এ সব গল্প অন্যদের মুখে শুনেছে। কণিকা নেপালি বুড়িদের কথা বলছে। আসলে ওরা নেপালি নয়। মনিপুরের। বৃন্দাবনে অল্পসংখ্যক মনিপুরী বিধবাও আছে। বাঙালিদের মতো তারা অবশ্য ভিক্ষা করে না। ওরা কৃষ্ণভক্ত। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত। নবদ্বীপে তীর্থ সেরে এখানে আসে। কেউ কেউ থেকে যায়। কণিকা এত সব জানে না। ওর কাছে সবাই নেপালি।

"অ দিদি, এখেনে বসে আচো কেন?" কণিকার প্রশ্ন শুনে ননীবালার সম্বিত ফিরল।

সত্যিই তো? ও এখানে বসে আছে কেন? আশ্রম থেকে বেরোনোর পর, প্রতি পদে পদে ও বিস্মৃত হচ্ছে। প্রথমে ঘনশ্যাম পাণ্ডা পথ আটকাল। তারপর থানার সামনে ওই ঝামেলা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরে এসে দেখে দরজা বন্ধ। আসল কাজটা এখনও হল না। এগুলো ভাল লক্ষণ না। ননীবালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চরণামৃতর লইগ্যা আইসিলাম। দেহি কেউ নাই।"

"এই দেখো, আজ যে ঠাকুরের চান করার দিন। ভুলে মেরে দিয়েচ নাকি গো দিদি? মন্দির তো খুলবে রাত সেই আটটায়।"

কণিকা মনে করিয়ে দেওয়ার পর ননীবালা গুম হয়ে গেল। এখন বাজে সাতটা। রাত আটটা মানে আরও একটি ঘণ্টা। না, অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। পারুল বুড়ির কপালে চরণামৃত নেই। ও আশ্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিল। মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খুব খারাপ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। গোবিন্দ সেটা জানান দিলেন। বিভ্রান্তের মতো ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

জীবনে যা করেনি, পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে ননীবালা গুরুকুলে ফিরে এল। মাঝে তিনটে ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। পারুল বুড়ি কেমন আছে কে জানে? রিকশা থেকে নেমে লোহার ফটকের কাছে যেতেই ছোট দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল আচুকি। ফিসফিস করে ও বলল, "পারুল বুড়ির আজ গতি হয়ে গেল রে ননীবালা।"

শুনে বুকটা ধক করে উঠল। যা ভেবেছিল, তা হলে তাই হল। ননীবালা নিঃশ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করল, "কহন হইল?"

"এই দশ মিনিট আগে। ডাকদারবাবুকে ডেকে নিয়ে আলো গোঁসাই। কইল, শেষ। খুব ভাল টাইমে গেল রে। উ মাগি কুনও ভাল কাম করেচিল লিচ্চয়।"

নীচে হল ঘরে জড়ো হয়েছে সবাই। কারও চোখে এক ফোঁটা জল নেই। ওকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। পারুল বুড়ি কি বলে গেছে আমের কথা? বললেও হয়তো কেউ বিশ্বাস করবে না। ও সব সময় কারও না কারও ঘাড়ে দোষ চাপাত। কথাটা ভাবতে ভাবতে আচুকির সঙ্গে ছাদে উঠে এল ননীবালা। ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে পারুল বুড়ি। মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি। ননীবালার কান্না পেয়ে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও ফুঁপিয়ে উঠল।

ঘণ্টাখানেক পর যে সমস্যাটা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা হল পারুল বুড়ির দেহটা দাহ করার কী হবে? বাঙালি বিধবার মৃতদেহ মুর্দা ঘাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় কোনও লোক এগিয়ে আসবে না। এখানে বাঁদরদের সৎকার সমিতি আছে। কিন্তু মানুষের জন্য নেই। এক, টাকা দিয়ে আনা যেতে পারে ভাঙ্গিদের। সে পাড়াও অনেক দূর। ডাক্তার জবাব দিয়ে যাওয়ার পর গোঁসাই ঠাকুর সেই যে বিশ্রাম নিতে ঢুকেছেন, আর বেরোননি। এই রাতে বস্তি থেকে কে ডেকে আনতে যাবে ভাঙ্গিদের? আশ্রমে যে ব্যাটাছেলে নেই।

রাত দশটার সময় আচুকি বলল, "চল ননীবালা। পারুলকে হামরাই মুর্দাঘাটে লিয়ে যাই।"

শুনে ননীবালা চমকে তাকাল। আচুকির শরীরে কিছু ভর করল নাকি? এমন অসম্ভব কথা বলছে? বৃন্দাবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে? বিধবারাই মুর্দাঘাটে নিয়ে গেছে বিধবার মৃতদেহ? এদিকে এমন বিপদ, পারুল বুড়ির মড়া বাসি করলেও চলবে না। সূর্য ওঠার আগে নিয়ে যেতে হবে মুর্দাঘাটে। আচুকি একটা অসম্ভব কথা বলেছে বটে, কিন্তু বাধ্য হয়েই বলছে।

"কী রে পারবি না? তু, হামি, সাধনা, শেফালি। চল, চল। মড়া বাসি হইয়ে গেলে মাগি আশ্রম ঠেনে লড়বে না।"

আচুকির শেষ কথাটা শুনে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল অন্যদের মধ্যে। ও যা বলে, পরে তা সত্যি হয়ে যায়। ননীবালা দুর্বল কণ্ঠে বলল, "মুর্দাঘাটে অনেক ট্যাহা লাগব। কে দিবো?"

"আচে।" আচুকি যেন জানে। এমনভাবে বলল, "মাগি জমিয়ে রেকে গেল। হামাকে কুনদিন কয়নি। কিন্তুক হামি জানি। আয়, হামার সাতে তুরা আয়।"

ঘরের ভেতর ঢুকে পারুল বুড়ির বালিশটা তুলে নিয়ে এল আচুকি। তারপর আঙুলের বড় বড় নখ দিয়ে ওয়ার ছিঁড়তে লাগল। তুলোর ভাঁজ থেকে টাকা-পয়সা পড়ছে মেঝেতে। বিস্ফারিত চোখে ননীবালা একবার তাকাল পারুল বুড়ির দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। একবার কি হাসল? ননীবালার যেন মনে হল। বালিশের ভেতর বুড়ি এত টাকা জমিয়ে রেখেছিল! অথচ কেউ জানত না। তা হলে এই কারণেই ও ঘরে কাউকে ঢুকতে দিত না। বিছানায় গিয়ে বসলে মারাত্মক রেগে যেত। মাঝে মধ্যে অত পয়সার গরম দেখাত।

টাকা পয়সা গুণে ওরা দেখল, প্রায় দু হাজার টাকা। মুর্দাঘাটের জন্য এই টাকা যথেষ্ট। বাকি টাকায় কয়েকজন ব্রাহ্মণকেও খাইয়ে দেওয়া যাবে। ঘণ্টা খানেক পর পারুল বুড়িকে মাচায় শুইয়ে ওরা চারজন, স্রেফ তারার আলোয় ভরসা করে রওনা হল মুর্দাঘাটের দিকে।

সকালে জল খাবার খেয়ে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল রাজা। এমন সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সঙ্গীতা ভাবি। মুচকি মুচকি হাসছে। সেটা লক্ষ্য করে রাজা একটু অস্বস্তিবোধ করল। এর আগে ভাবি একদিন মিঠুর কথা জিজ্ঞেস করেছে। আজ আবার প্রসঙ্গটা তুলবে কী না কে জানে? অস্বস্তিটা কাটানোর জন্যই ও বলল, "আমাকে কিছু বলবে ভাবি?"

সঙ্গীতা ভাবি বলল, "না। কিছু শুনব। তোমার কি খবর বলো তো? দোকানে ফোন করে পাওয়া যায় না। সেল ফোনটাও প্রায় সময় অফ করে রাখো। কলকাত্তাওয়ালি তোমার কাছে এখন এত ইম্পরটেন্ট হয়ে গেছে, আমাদের পাত্তাই দিচ্ছ না। তার খবর কি?"

"ভাল।" ছোট্ট উত্তর দিয়ে রাজা পাশ কাটাতে চাইল।

"কাল তাকে দেখলাম। ছোটে বাবার আশ্রমে। চারণদাস বাবাজির সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু মেয়েটা। তোমার সঙ্গে মানাবে। সঙ্গে বয়স্ক এক ভদ্র মহিলাকে দেখলাম। কে, ওর মা?"

'হ্যাঁ। ওদের কখন দেখলে ভাবি?"

"বিকেলে চারটে-সাড়ে চারটের সময়। কাল ওখানে একটা অনুষ্ঠান ছিল। চরণদাস বাবাজি ওদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ওরা নাকি একটা গেস্ট হাউস তৈরি করে দিচ্ছেন আশ্রমে। রাজা ভাইয়া, ওরা খুব বড়লোক বুঝি?"

ভাবির কৌতূহল দেখে রাজা মনে মনে হাসল। তারপর বলল, "হ্যাঁ। আমাদের তুলনায় অনেক বড়লোক। কাল তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলোনি কেন ভাবি? গিয়ে আমার পরিচয় দিলেই পারতে।"

"তোমার মাথা খারাপ? কী ভাবত কে জানে? তার চেয়ে তুমি একদিন এ বাড়িতে নিয়ে এসো। এখানে বসে গল্প করা যাবে।"

"সেই ভাল। দাঁড়াও, আজই এ দিকে একটা জায়গায় আসার কথা আছে আমাদের। সময় পেলে নিয়ে আসব বাড়িতে।"

সঙ্গীতা ভাবির কৌতূহল বাড়ছে। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এই মেয়েটাকে বিয়ে করবে ভাইয়া? কলকাতা ছেড়ে ও এখানে এসে থাকবে?"

"জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। তবে একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। যদি বিয়ে করি, তো এই মেয়েটাকেই।" "মাই গড। রাজা ভাইয়া, তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি। এত প্রেম ভাল না।"

"দুঃখ থাকলে ভোগ করতে হবে। কী আর করা যাবে? পরিস্থিতি যদি তেমন হয়, তা হলে আমিই না হয় বৃন্দাবন ছাড়ব।"

খিলখিল করে হেসে উঠল ভাবি," লোকে মনের দুঃখে বৃন্দাবনে আসে। আর তুমি মনের দুঃখে বৃন্দাবন ছাড়বে? নাহ, তোমার জন্য দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাকেই আসরে নামতে হবে। কত ঘটকালি দেবে বলো?"

"না ভাবি। এ মেয়ে কারও কথায় ইনফ্লুয়েন্সড হওয়ার মতো না। অন্য টাইপের। এখন ওর মাথায় একটা ভূত ঢুকেছে। এখানকার বাঙালি বিধবাদের জন্য কিছু করতে হবে। এই ভুতটা যতক্ষণ না মাথা থেকে নামছে, ততক্ষণ অন্য দিকে মনই দেবে না।"

"কী করতে চায় বিধবাদের জন্য?"

"কী না? প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, স্টাডি করতে এসেছে। লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। এখন দেখছি খুব ইনভলভড হয়ে গেছে। কাল রাতে আমায় কী বলল জানো? যে সব বিধবাকে তাদের আত্মীয় স্বজনেরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের হয়ে তোমাকে মামলা লড়তে হবে। ওদের খোরপোষ আদায় করে দিতে হবে। ওদের জন্য যত খরচা করতে হয়, আমি করব।"

সঙ্গীতা ভাবির চোখ গোল গোল হয়ে যাচ্ছে। বলল, "আচ্ছা জেদি মেয়ে তো। জানা নেই, চেনা নেই, তাদের জন্য খরচা করবে? এ রকম মামলা হয় নাকি? বিধবা মা তার ছেলের কাছে খোরপোষ চাইতে পারে?"

"কেন পারবে না? আমাদের ইলাহাবাদ কোর্ট এই ক'দিন আগে এ রকম একটা জাজমেন্ট দিয়েছে। ছেলের যদি স্টেডি রোজগার থাকে, তা হলে তার একটা অংশ মাকে দিতেই হবে। খুব ইনটারেস্টিং মামলা হয়েছিল সেটা।"

"তুমি কী ঠিক করেছ রাজা ভাইয়া? মামলা লড়বে?"

"তোমার কী মনে হয় ভাবি? লড়া উচিত? উকিলের ড্রেসটা কত দিন আগে স্যুটকেসে তুলে রেখেছি, বলো তো? ভেবেছিলাম আর বেরই করব না। কিন্তু কাল থেকে মনটা ফের টানছে।"

ভাবি বলল, "নিশ্চয় লড়া উচিত। আমাদের দেশে অসহায় মেয়েদের পাশে স্বার্থ ছাড়া তো কেউ দাঁড়ায় না। এই মেয়েটা যদি কিছু করতে চায়, তা হলে একে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তোমার বিজনেস? সেটা কে দেখবে?"

"সেটাই তো প্রবেলম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মিঠু বলল, দু'তিন জন ট্রাস্টেড লোক রেখে দাও। তেমন হলে অফ টাইমে আমিও দেখাশুনো করতে পারব। কিন্তু এই এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে কিছু করা দরকার। জানো ভাবি, এর মধ্যেই দশজন বিধবাকে ও জোগাড় করে ফেলেছে, যাদের কেস নিয়ে নামা যায়। খুব স্ট্রং কেস। বাপ বাপ বলে সম্পত্তি ফেরত দিয়ে যাবে। অথবা খোরপোষ দেবে।"

"ইস, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নেবে রাজা ভাইয়া? বাড়িতে বসে বসে আমি বোর হয়ে যাই। মিঠুর সঙ্গে আজই আলাপ করিয়ে দাও। মেয়েটার কথা যা শুনলাম, তাতে আমারই ভালবাসাতে ইচ্ছে করছে। কখন আনবে ওকে বলো?"

রাজা বলল, "এই ধরো, লাঞ্চের পর। আজ অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে হবে আমাদের। সব কাজ ঠিক সময়ে হলে ওই টাইমে আমরা ফ্রি হয়ে যাব।"

"তা হলে বলো না, ওকে এখানেই লাঞ্চ করে যেতে। খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমি ভাবতেই পারছি না, এ মেয়েটা আমাদের বাড়ির বউ হয়ে আসবে।"

রাজা হাসতে শুরু করল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও। কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব। এত তাড়াতাড়ি কোনও কনক্লুসন টেনো না। লাঞ্চ টাঞ্চের ব্যবস্থা করতে যেও না। মিঠু খুব মুডি। হয়তো সামান্য কোনও কারণে এমন রেগে যাবে, মাথা রাস্তা থেকেই বাড়ি চলে যাবে। ঠিক আসার আগে আমি তোমায় ফোন করে দেব। আচ্ছা, ভাতিজাকে দেখছি না কেন ভাবি? এতক্ষণ বাড়িতে আছি। একবার ও এল না?"

"ও এখন টি ভি-র সামনে বসে। গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে একটা সিরিয়াল হয়। সেটা মন দিয়ে দেখছে। তুমি এখন কোথায় যাবে ভাইয়া?"

'গুরুকুল। ওখানকার একটা আশ্রমে একজন বিধবা মহিলাকে খুঁজে বের করতে হবে। মিঠুর স্যারের হারিয়ে যাওয়া চাচি। এ হে ভাবি... সাড়ে আটটা বাজিয়ে দিলে? আমার অনেক দেরি হয়ে গেল।"

হন্তদন্ত হয়ে রাজা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। ওর প্রথম কাজ ননীবালা চক্রবর্তীকে খুঁজে বের করা। যদি ভদ্রমহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, তো ভাল। খবরটা নিয়ে সেখান থেকে ও যাবে বাঁকেবিহারী কলোনিতে। বড়দিদি ওর অপেক্ষায় বসে থাকবেন। রাধাকুঞ্জে আজ লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে মিটিংয়ে বসার কথা বড়দিদির। আশ্রম করার ব্যাপারে। লাবণ্যপ্রভা খুব দ্রুত আশ্রমের স্কিমটা সেরে ফেলতে চান। রাজা একটু অবাকই ওঁর ব্যগ্রতা দেখে। হয়তো একটা কিছু ভেবে এসেছিলেন মনে মনে। এটা ওঁর হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্ত না।

গুরুকুলের দিকে স্কুটার চালিয়ে রাজা কাল রাতের কথা ভাবতে লাগল। মিঠুকে আদর করার সময় যখন বড়িদিদির ফোনটা এল, তখনই ও জেনে যায় ননীবালা চক্রবর্তীকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে। বড়িদিদি বলল, "ওকে তোরাও দেখেছিস। দেবলীনাকে নিয়ে যেদিন তুই এলি, সে দিন ননীবালা আমার বাইরের চারপাইটার উপর শুয়ে ছিল। তোর সঙ্গেও কথা বলেছে। তুই খেয়াল করতে পারছিস না লালা। কেন রে, ওর খোঁজ করছিস কেন তোরা?"

রাজা সংক্ষেপে সব কথা জানিয়েছিল। সব শুনে বড়িদিদি বলেছিল, "বরাবরই মেয়েটাকে আমার বড় ঘরের মনে হত। যাক, কপাল খুলে গেল মেয়েটার। এক কাজ কর। কাল সকালেই তুই গুরুকুলের ওই আশ্রমটায় চলে যা। ওকে পেয়ে যাবি। আর সকালে যদি আমার কাছে আসে, তা হলে আমি তোদের জন্য বসিয়ে রাখব।"

মিঠু আপ্তার করেছিল, অপারেশন ননীবালায় সামিল হবে। গুরুকুল আসবে। কিন্তু রাজা রাজি হয়নি। ও কথা দিয়েছে, ননীবালাকে পাওয়া গেলে সিধে নিয়ে তুলবে রাধাকুঞ্জে। তারপর ফোনে দিল্লিতে ধরে নেবে স্যারকে। খুশখবরটা দেবে। স্যারকে ওরা বিকালের মধ্যেই এখানে চলে আসতে বলবে। তখন চাচিকে তুলে দেবে স্যারের হাতে। মোটামুটি এই প্ল্যান।

এখন ননীবালাকে পাওয়া নিয়ে সংশয়। ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু কাল রাতের সুখস্মৃতি ওকে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে দেয়নি। রাজা অনেক ভেবেছে। তবুও বুঝে উঠতে পারেনি, এখানকার বিধবাদের নিয়ে মিঠুর হঠাৎ এত মাথা ব্যথা হল কেন? বড়লোকের মেয়ে। ওদের কত রকম খেয়াল। তা, এর ফলে কিছু মানুষের যদি উপকার হয়, ক্ষতি কী?

গুরুকুলে ঢোকার মুখে হঠাৎ ও দেখতে পেল স্বাতীকে। একটা বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে। গোপীনাথ বাজারের সেই ভাড়া বাড়িতে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মেয়েটাকে ও দেখেছিল। তবু ভোলেনি। সেদিন বড়িদিদির সঙ্গে মেয়েটা অসভ্যতা করেছিল। এই সময়ে গেরস্থ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে। তার মানে, ঠিকে কাজ করে। ঘনশ্যাম কি তাড়িয়ে দিয়েছে? মেয়েটাকে কড়া কথা শোনানোর জন্য স্কুটার দাঁড় করিয়ে রাজা বলল, "এই শোন, সেদিন তুই বেতমিজের মতো বাত করছিলি কেন রে?"

মেয়েটা ভয় পেয়ে বলল, "আমি কী করুম? ঘনশ্যাম আমারে যে ভয় দেখাইল।"

"কী ভয় দেখাল তোকে?"

"কইল, তুই যদি অহন চইল্যা যাস, তাইলে তর বাবা আর মারে আমি কাইট্টা যমনার জলে ভাসাইয়া দিমু।"

"তুই কি এখনও ওই বাড়িতে আছিস?"

"না। পলাইয়া আইসি। আমারে বেইচ্যা দিতাসিল। শুইন্যা আমি হেই

দিনই দরজায় তালা লাগাইয়া জ্যাঠার বাড়ি চইল্যা যাই। ঘনশ্যাম জ্যাঠার বাড়িও গেসিল। জ্যাঠা অরে ধইর‍্যা পিটাইসে। তারপর আর যায় নাই।"

রাজা বলল, "তুই জানিস, বড়িদিদি তোর কথায় কত দুঃখ পেয়েছে?"

স্বাতী বলল, "তুমি কইয়া দিও, আমারে য্যান মাফ কইর‍্যা দেয়। আমি নিজে গিয়া পা ধইর‍্যা মাফ চামু।"

বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন এক ভদ্রলোক। দেখে স্কুটারে স্টার্ট দিল রাজা। স্বাতীর কথাটা গিয়ে আজই বড়িদিদিকে বলতে হবে। যা বলছে, হয়তো সত্যি। দীন দয়ালকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে। এই ঘনশ্যামটা খুব বেড়ে গেছে। ওকে একদিন এমন পেটাতে হবে। জিন্দেগিতে যেন কারও সাথে মিসবিহেভ না করে। মনে মনে কথাটা ভেবে রাজা গিয়ার বদলাল।

গুরুকুলের আশ্রমে পৌঁছে বাজা বুঝতে পারল না, ভেতরের লোকজনকে কীভাবে ডাকবে। লোহার বিরাট দরজা। ডোর বেল নেই। দু'এক বার টোকা মারা সত্ত্বেও কেউ দরজা খুলে দিল না। আশপাশে কোনও বাড়িও নেই, গিয়ে জিজ্ঞেস করে। বাধ্য হয়ে ও দরজায় ঘুসি মারতে লাগল। দরজার ডান পাশের জানলাটা খুলে মিঠুর বয়সী একটা মেয়ে বেশ রুক্ষ গলায় বলল, "কে আপনে? কী চান?"

"আমি রাজা। গাদিবিহারে থাকি। দরজাটা একটু খুলবেন? কথা আছে।"

মেয়েটা আর কোনও প্রশ্ন করল না। **কয়েক সেকেন্ড** পর দরজা খুলে দিয়ে বলল, "অফিস ঘরে বসেন। আমি আইতাসি।"

পরনে গেরুয়া রঙের শাড়ি। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। একটা আলগা চটক ফুটে বেরুচ্ছে মেয়েটার শরীর থেকে। হাতের ফুলের ডালা। মেয়েটা বোধহয় মন্দিরের কাজ করতে করতে উঠে এসেছে। আশ্রমের ভেতর নিশ্চয় মন্দির আছে। দ্রুত এ সব ভেবে নিয়ে রাজা ডানদিকে অফিস ঘরে গিয়ে বসল। দেয়ালে গেরুয়াধারী এক মোহান্তর ছবি। সম্ভবত এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। দাড়ি-গোঁফের মাঝে উজ্জ্বল দুটি চোখ। বয়স খুব বেশি বলে মনে হল না রাজার। মধ্য তিরিশ। অবশ্য ছবিটা যদি এখনকার তোলা হয়।

হঠাৎই ফের উদয় হল মেয়েটা। খুব কেজো গলায় বলল, "কী দরকার ক'ন।"

"এখানে ননীবালা চক্রবর্তী বলে কেউ থাকেন?"

"ননীবালা বইল্যা একজন থাকে। অর টাইটেল চক্রবর্তী কী না কইতে পারুম না। ক্যান হের লগে আপনের কী কাম?"

"উনি এখন আছেন?"

"না। মুর্দাঘাটে গেসে। কাইল রাতে আমাগো এহানে একজন দেহ রাখসে। তারে দাহ করতে গেসে।"

"কখন আসবেন উনি, বলতে পারেন?"

"আহনের টাইম তো হইয়া গেসে। দুই জন ফিইর‍্যাও আইসে। ননীবালা আর আ চুকি বইল্যা আরেকজন ফেরে নাই। এট্টু আগে ননীবালার খোঁজে মোটরবাইকে কইর‍্যা একজন পাণ্ডা আইসিল। এহানে চুটপাট কইর‍্যা গেল। ক্যান কী করসে ননীবালা? অরে আপনেরা খোঁজেন ক্যান?"

রাজা এবার চমকাল। আরও একজন ননীবালার খোঁজে এসেছিল! কে সেই পাণ্ডা? এখানে অনেক পাণ্ডারই মোটরবাইক আছে। কৌতূহল মেটানোর জন্য ও প্রশ্ন করল, "ওই লোকটা এসে কী জিজ্ঞেস করল?"

"কইল, ননীবালা আমাগো যজমান। দ্যাশ থেইক্যা লোক আইসে অরে নিয়া যাওয়ার লইগ্যা। মনে হইল, পাণ্ডাডা হত্য কথা কই ত্যাসে না।"

কল্যাণব্রতবাবু কি তাহলে একজন পাণ্ডাকেও ননীবালার খোঁজে লাগিয়েছেন? রাজা ঠিক বুঝতে পারল না। কাল মিঠু বলেছিল বটে, পাণ্ডাদের মারফত খোঁজ করলে ননীবালার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। যাকগে, ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। এখন মুর্দা ঘাটে গিয়ে দেখা যাক, ননীবালা আছেন কী না। আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসার আগে নিজের নেমকার্ড এগিয়ে দিয়ে রাজা বলল, "আমার নাম আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। ননীবালা এলে যোগাযোগ করতে বলবেন।"

স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে খানিকটা এগোনোর পর রাজার মনে হল, মুর্দাঘাটে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। ননীবালা এতক্ষণ নিশ্চয়ই ওখানে বসে থাকবেন না। তার চেয়ে বাঁকেবিহারী কলোনিতে যাওয়া যাক। বড়িদিদির কাছে ননীবালা গেলেও যেতে পারেন। আর যদি নাও যান, ওখান থেকে বড়িদিদিকে রাধাকুঞ্জে পৌঁছে দিয়ে ও ফের না হয় গুরুকুলে যাবে। ভুলে গেলে চলবে না, ননীবালাকে আরও একজন খোঁজ করছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই রাজা বাঁকেবিহারী কলোনিতে পৌঁছে গেল। বড়িদিদি ওকে দেখেই বললেন, "লালা, আজকের কাগজটা দেখেছিস?"

সকালে কাগজ পড়ার সময় হয় না। রাজা কাগজে চোখ বোলায় দোকানে বসে বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটার সময়। বড়িদিদির চোখ মুখ দিয়ে খুশি উপচে পড়ছে। ও একটু অবাক হয়েই বলল, "কাগজে কী বেরিয়েছে বড়িদিদি?"

"উফ, সকালে কাগজ পড়ার হ্যাবিটটা এখনও করতে পারলি না? কী ছেলে রে তুই? সুষমা গৌতম... কাল অ্যারেস্টেড হয়েছে, শুনিসনি?"

"না। পায়েল আর ওর দাদা থানায় যাওয়ার পর আর আমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়নি। সন্ধ্যার পর থেকে অনেক রাত্তির অবধি আমি মিঠুদের বাড়ি ছিলাম। খবরটা কাগজে বেরিয়েছে নাকি? আমি তো ভাবলাম, কাগজের লোকদের ম্যানেজ করে ফেলবে। কই দেখি, কাগজে কী লিখেছে?"

বড়িদিদি কিছু বলার আগেই দৈনিক জাগরণ কাগজটা এনে দিল গীতা। প্রথম পাতায় সুষমা গৌতমের ছবি দিয়ে খবরটা ছাপা হয়েছে। পুলিশের ভ্যানে তোলার সময় সুষমা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টায়। কিন্তু আড়াল করতে পারেনি। রাজা এইবার বুঝতে পারল, এ বাড়ির সবাই কেন এত খুশি। খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার আগেই বড়িদিদি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কাগজটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারিস লালা। আমি দশ কপি আনিয়ে রেখেছি। এইবার ওর কী দশা করি, দেখিস।"

বড়িদিদিকে স্কুটারে চাপিয়ে রাধাকুঞ্জের দিকে রওনা হল রাজা। মিনিট সাত আটেকের পথ। রাস্তাতেই স্বাতীর কথাগুলো ও জানিয়ে দিল। শুনে বড়িদিদি বললেন, "সেদিন আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল। জানিস। ছি ছি, ওর মা বাবাকে আমি সেদিন যা নয়, তাই বলে দিলাম।"

রাধাকুঞ্জে পৌঁছে রাজা দেখল, চরণদাস বাবাজিও হাজির। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে লাবণ্যপ্রভা আপ্যায়ন জানালেন বড়িদিদিকে, "আসুন দিদি। আপনার সম্পর্কে রাজার কাছে এত শুনেছি যে, নিজেই যেতে চেয়েছিলাম আপনার বাড়িতে।"

রাজার চোখ গেল মিঠুর দিকে। পরনে হালকা গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। চুল পিছন দিকে টান টান করে বাঁধা। রূপ খুলে গেছে সামান্য প্রসাধনে। ও ইচ্ছে করেই চরণদাস বাবাজির পাশে গিয়ে বসল। যাতে মিঠুকে ভাল ভাবে দেখতে পায়। কাল রাতের কথা চট করে ওর মনের মধ্যে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। সারা শরীরটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। ওই শরীরটা পুরো ধরা দিয়েছিল কাল রাতে। অনেক নতুন নতুন অনুভূতি দিয়েছে রাজাকে।

সময় নষ্ট না করে বড়িদিদি আশ্রমের কথা জানতে চাইছেন। সেদিকে মনই দিতে পারল না রাজা। বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে মিঠুর দিকে। ঘরের বাকি তিনজন কথা বলায় এমন ব্যস্ত যে, রাজার দিকে কেউ লক্ষ্যও করছেন না। মিঠু ইশারায় বেশ কয়েকবার বলার চেষ্টা করল, ওদের আলোচনায় অংশ নাও। আমার দিকে তাকিও না। কিন্তু রাজার মাথায় ভূত ঢুকেছে। ও পাল্টা ইশারায় জানিয়ে দিল, সম্ভব না। মুচকি হেসে একটু পরেই মিঠু উঠে গেল। রাজা ঠিক বুঝতে পারল না, ওকেও উঠতে বলে গেল কী না।

বড়িদিদি বললেন, "আপনার এই বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা যাবে?"

"নিশ্চয়ই।" লাবণ্যপ্রভা বললেন, "তেমন হলে একটা পার্টিশন দিয়েও আশ্রমটাকে আলাদা করা যাবে। আমি মোটামুটি একটা প্ল্যান করে রেখেছি। চলুন, আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাই।"

চরণদাস বাবাজি উঠে বললেন,"আমি এবার যাই মা। অনেক কাজ আছে। তা হলে ওই কথা রইল। কাল আর্কিটেক্টকে আসতে বলে দিচ্ছি আশ্রমে। আপনি ঠিক সময়ে চলে আসবেন।"

চরণদাস বাবাজি বেরিয়ে যাওয়ার পর বড়িদিদিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন লাবণ্যপ্রভা। ঠিক সেই সময় উল্টোদিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে মিঠু বলল, "এই তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। টিন এজারদের মতো হা করে তাকিয়ে আছ?"

রাজা ওর হাত ধরে কাছে টেনে বলল, "এতক্ষণেও যে তোমাকে গিলে খাইনি, তোমার ভাগ্য।"

"আরে, কী ছেলেমানুষি করছ? বাড়ি ভর্তি লোক। হাত ছাড়ো। সকালে গুরুকুলের আশ্রমে গেছিলে? ননীবালার খোঁজ পেলে?"

ননীবালার ব্যাপারে রাজা সব জানাতেই মিঠু বলল, "স্যার, এখানকার হিন্দি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েই গণ্ডগোলটা করে গেছেন। খোঁজ দিলে দশ হাজার। মনে হয়, সেই কারণেই কেউ ওঁর সম্পর্কে ইন্টারেস্ট নিয়েছে। তোমার কথা শুনে এখন ভয়ই লাগছে। **কোনও দুষ্ট লোকের পাল্লায় যেন না** পড়েন স্যারের কাকিমা।"

প্রসঙ্গ বদলে রাজা বলল, "দুপুরের দিকে তুমি গোকুলে যাবে বলেছিলে। যাওয়ার কি সময় পাবে আজ? তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা

আছে মিঠাই।"

"এখানে বলা যাবে না?"

"না। কিছু কথা আছে, যা যেখানে সেখানে বলা যায় না।"

কথাটা শুনে চুপ করে রইল মিঠু। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "আমি জানি, তুমি কী বলবে আমাকে। কিন্তু তা সম্ভব না। রাজা তুমি আমার সম্পর্কে সব কিছু জানো না। জানলে হয়তো যা বলতে চাও, তা বলতে চাইবে না। পিছিয়ে যাবে।"

রাজা বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। এর আগেও মিঠু একদিন এই কথাটা বলেছে। কী ঘটে গেছে ওর জীবনে? ও বলল, "দেখো মিঠাই, পিছিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যাই ঘটে থাকুক তোমার জীবনে, আমি যা বলতে চাই, বলবই। প্লিজ, চলো আজ গোকুল যাই। ওখানে বসে যা শোনার শুনব।"

মিঠু কী ভেবে বলল, "তা হলে আজ নয়, কাল। তুমি এসো বেলা দশটার সময়। মাম যাবে ছোটে বাবার আশ্রমে। সারাটা দিন আমি একা থাকব। প্লিজ রাজা, সব ভেবেচিন্তে ডিসিশন নিও। হঠকারিতা কোরো না।"

হঠকারিতা কথাটার মানে রাজা বুঝল না। কিন্তু মানেটা জিজ্ঞেস করার সাহস ও পেল না। মিঠু রেগে যাবে। শব্দটা ও মনে রেখে দিল। বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে নেবে ভাবির কাছ থেকে। ভাবির কথা মনে হতেই রাজা বলল, "জানো মিঠাই, আজ ভাবি খুব করে বলেছিল, তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতে। ছোটে বাবার আশ্রমে কাল তোমায় দেখেছে। খুব ইম্প্রেসড। তোমার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে। চলো, যাবে?"

মিঠু বলল, "আজ নয় রাজা। আজ কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি সারাদিন বসে আজ ভাবব। আমাকে ডিসিশন নিতে হবে। কাল রাতে আমাদের মধ্যে যা হয়েছে... তারপর থেকে মনটা খুব ডিস্টার্বড। প্লিজ, তুমি কিছু মনে কোরো না।"

বারান্দা দিয়ে কথা বলতে বলতে বড়িদিদি আর লাবণ্যপ্রভা ঘরের দিকে আসছেন। মিঠু উঠে গিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। ঘরে ঢুকে বড়িদিদি বলে উঠলেন, "ফ্যান্টাস্টিক। আশ্রমের জন্য একেবারে আইডিয়াল জায়গা রে লালা বুঝলি ভাবছি, এই বাড়িতেই আমাদের নবনীড় তুলে আনব। জ্ঞানগুদড়ির ভাড়া বাড়িতে ওই আশ্রম রেখে লাভ নেই। এখানে অনেক খোলামেলা।"

বড়িদিদির চোখ মুখ থেকে আনন্দ ঠিকরে বেরোচ্ছে। ওরা সবাই চেয়ারে বসতেই রাজা বলল, "অন্যরা রাজি হবেন?"

"হবে না মানে? এ রকম জায়গা আর পাবে কোথায়? কাল রাতে এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররা আমার বাড়িতে এসেছিল। সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করল, দিদি নবনীড়ের দায়িত্ব আপনি নিন। সুষমা যা করেছে, ওকে সাত আট বছর জেলে পচতে হবে। ওর কথা ভাবার কোনও দরকার নেই। প্রতিষ্ঠানটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তা, আজই আমি সবাইকে ডেকে নিচ্ছি। যত দ্রুত শিফট করা যায়, করব।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "রাজা, তুমি তো ল'ইয়ার। তুমি একটা ডিড তৈরি করে ফেলো। বাড়ির বেশিরভাগ অংশই নবনীড়কে আমি দান করতে চাই। মন্দিরসহ বাকি অংশে থাকব আমি। আর ফিরতে চাই না বাবা কলকাতায়। ওখানকার সম্পত্তি সব ভাগ করে দেব বউমা আর মিঠুকে। ওরা যা ইচ্ছে করুক।"

বড়িদিদি বললেন, "দিদি, সামান্য রিনোভেশন কিন্তু করতে হবে। সে দায়িত্ব আমাদের। আপনি যা দিচ্ছেন, যথেষ্ট। আর একটা কথা। একটা ট্রাস্টি বোর্ড করা দরকার। তিন অথবা পাঁচ জনের। আপনাকে থাকতে হবে সেই বোর্ডে।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "আমি না। আমার হয়ে থাকবে দু'জন। মিঠু আর রাজা। বাকি তিনজন আপনি যাকে খুশি নিতে পারেন।"

মিঠু বলল, "আমায় রাখছ কেন মাম? আমি এখানে থাকব নাকি? তার চেয়ে তুমি ট্রাস্টি হও। অনেক কাজে লাগবে।"

"বা রে, দু'দিন আগেই তো অন্য কথা বললি। মাম, বৃন্দাবনে যদি পার্মানেন্টলি থেকে যাই, তা'লে কেমন হয়?" লাবণ্যপ্রভা সস্নেহে বললেন, "তুই বড্ড ফ্রিকল মাইন্ডেড হয়ে গেছিস। ঘনঘন মত বদলাস। আগে তো এরকম ছিলিস না?"

"না মাম। এখন আমার একদম ভাল লাগছে না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। ভাল না লাগলে, ফিরে যাস। আশ্রমের ব্যাপারে তুই আমাকে নামালি। বিধবাদের নিয়ে এত কথা বললি। আর এখন পিছিয়ে যাচ্ছিস? মামকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে যদি থাকতে পারিস, চলে যা। কে আটকাচ্ছে তোকে?"

বড়িদিদি বললেন, "দেবযানী, তোমায় একটা কথা বলি। এই বৃন্দাবন শহরটার আলাদা একটা মায়া আছে। বুঝলে। আমাকেই দেখো না। হরিদ্বার থেকে এই শহরটায় বেড়াতে এসে আর ফিরতেই পারলাম না। মায়ার বন্ধনে এমন পড়ে গেলাম, প্রায় পঁয়ত্রিশটা বৎসর কাটিয়ে দিলাম। এখানেই থেকে যাও। ভাল একটা পাত্তর দেখে দিচ্ছি। ফের নতুন করে জীবন শুরু কর।"

কথাটা শুনে মিঠু চমকে তাকাল বড়িদিদির দিকে। তারপর বলল, "আমার রিপোর্টটা আগে সাবমিট করি। তারপর ভাবব।"

"তোমার রিপোর্টে কি কোনও সাজেশান থাকবে? যদি রাখো, তা হলে আমার সঙ্গে একবার কথা বলেনিও। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। বিধবা মেয়েদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য আশ্রম খুলে লাভ নেই। দরকার ওদের রিহ্যাবিলেটশনের ব্যবস্থা করা। মানে, যারা পারবে, তাদের দিয়ে প্রোডাক্টিভ কিছু করানো। এখানে আমরা যাদের রাখব, তাদের দিয়ে কিছু কাজও করাব। দান খয়রাত ওদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। আমার হাতে যদি প্রশাসন থাকত, তা হলে প্রথমেই এই ভিক্ষাবৃত্তিটা বন্ধ করে দিতাম।"

লাবণ্যপ্রভা জিজ্ঞেস করলেন, "অভ্যাসটা কি বদলাতে পারবেন দিদি?"

"চেষ্টা করতে হবে। বিধবা হওয়ার আগে এই মেয়েগুলোর অনেকেই দেশের বাড়িতে খেটে খেত। আমার কাছে একটা মেয়ে আসে, কণিকা। মেছুড়ে পরিবারের মেয়ে। চমৎকার জাল বুনতে পারে। আর একটা মেয়ে শান্তি, বেত দিয়ে দারুণ মোড়া বানায়।

এই যে হাতের কাজগুলো ওরা জানে, সব ভুলে যাচ্ছে। ওদের দিয়ে এসব তৈরি করিয়ে আমরা তো তা বিক্রিও করতে পারি।"

মিঠু বলল, "বাহ! দারুণ আইডিয়া। আমরা র'মেটিরিয়াল সাপ্লাই করলাম। ওরা আশ্রমে বসে সব বানাল। তারপর আমরা মার্কেটিং করলাম।"

"এই জন্যই তো তোমার মতো ইয়ং মেয়েকে এখানে থাকতে বলছি। তোমার মা বা আমার পক্ষে কি সম্ভব এ সব এক্সিকিউট করা?"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "আপনি নবনীড়ের সবাইকে নিয়ে কবে আসছেন বিমলাদি?

"ফিফটিনথ অগাস্ট টার্গেট করুন না। একটা ভাল দিনে আশ্রমটা চালু করা যাক।

আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

বড়িদিদি হেসে বললেন, "অন্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। একটা নতুন সেট আপ। যতটা সম্ভব ফুলপ্রুফ করা যায়। আমি পরশু ফের আপনার কাছে আসছি। তেমন হলে কয়েকজনকে নিয়েও চলে আসতে পারি।"

"খুব ভাল হয়। দিদি, একটা রিকোয়েস্ট রাখবেন? দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সেরে যান না?"

"না ভাই, তা সম্ভব না। আমার কর্তা ইন্সটিটিউট থেকে ফিরবেন। একসঙ্গে বসে খাওয়ার অভ্যেস। ওকে তো আপনি দেখেছেন। এ বাড়িতে প্রাচীন পুঁথি নিতে এসে ছিলেন। অন্য একদিন না হয় লাঞ্চ করা যাবে। চল রে লালা। আমাকে একটা রিকশায় তুলে দে। এই রোদ্দুরে তোর স্কুটারের পিছনে বসে যেতে পারব না।"

বড়িদিদি উঠে দরজার দিকে এগোলেন। হেলমেট বেঁধে নেওয়ার অছিলায় রাজা একটু দেরি করে উঠল। লাবণ্যপ্রভা আর বড়িদিদি চৌকাঠ পেরোতেই মিঠু ফিসফিস করে বলল, "কাল বেলা দশটায়। এসো কিন্তু তোমার জন্য ওয়েট করব।"

মিঠুর মুখটা চট করে দু হাতে টেনে নিয়ে একটা চুমু খেয়ে রাজা বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, "অবশ্যই আসব।" ঘুরে ও আর মিঠুর দিকে তাকালই না।

বড় রাস্তায় রিকশা স্ট্যান্ডের কাছে এসে রাজা হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগল এদের বড়িদিদি?"

"খুব ভাল রে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মা আর মেয়ে দুজনেই খুব দুঃখী।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "কেন বড়িদিদি?"

"তুই জানিস না? মিঠু মেয়েটা তো বিধবা। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। ওর মা খুব কাঁদছিল আমার কাছে। নিজে বিধবা বলে মেয়েটা বিধবাদের জন্য কিছু করতে চাইছে রে।"

পারুল বুড়িকে নাকি সন্ধেবেলায় ছাদে দেখা গেছে। বর্ণনা দিচ্ছিল সাধনা। ও নিজের চোখে দেখেছে। বেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখে অন্ধকার নেমে এসেছে। পাশ ফিরে শোওয়ার সময় ওর চোখে পড়ে, কোমর ভাঙা অবস্থায় পারুল বুড়ি দাঁড়িয়ে। দরজার সামনে থেকে খোঁনা গলায় জিজ্ঞেস করছে, "অ সাধনা, আমার বালিশটা কই রে। দেকতে পাচ্চি না তো?" ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল সাধনা। অনেকক্ষণ পর কার সঙ্গে যেন নীচে নেমে এসেছে। আর উপরে যেতে চাইছে না।

সারাটা দিন গোবিন্দর মন্দিরে কাটিয়েছে ননীবালা। বিকেলটা ভজনাশ্রমে। রাত আটটার সময় আশ্রমে ফিরে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় ও এই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা শুনল। নীচে হলঘরে অনেকেই আতঙ্কিত। পারুল বুড়ির আত্মা নাকি অতৃপ্ত রয়ে গেছে। আশ্রমের চারপাশে ঘুরে বেড়াবে এখন থেকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে সাধনার। ওর সঙ্গে প্রায়ই খটামটি লাগত বুড়ির। সব শুনেও ননীবালা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। কাল রাতে মুর্দাঘাটে দাহ করার সময় ও নিজের হাতে ব্রজের রজ ছড়িয়ে দিয়েছিল পারুল বুড়ির মৃতদেহে। ব্রহ্মবস্তুর গুণ কখনও বিফলে যাবে না। মোক্ষ লাভ করে বুড়ি এখন স্বর্গে।

জপের থলি চারপাইয়ের উপর রেখে, কলতলায় গিয়ে ননীবালা জলের তলায় মাথা পেতে দিল। সারা দিন ও দরদর করে ঘেমেছে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শরীরের ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। মনটাও স্নিগ্ধ হতে থাকল। গোবিন্দর মন্দিরে বসে আজ ও অনেক কিছু ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে, পঁচিশ বছর ব্রজধামে থেকেও যখন ওর কিছু লাভ হয়নি, তখন আর থাকার কোনও মানে হয় না। গোবিন্দর চরণে মাথা কুটে ও কী পেল? লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবহেলা, অনাদর। কেউ এসে কোনও দিন ওকে মা বলে ডাকবে না। কেউ এসে ওর মুখের সামনে একথালা ভাত তুলে দিয়ে বলবে না, তুমি খাও। অলীক মোহে বৃন্দাবনে পড়ে থাকার জন্য ননীবালার খুব আফশোস হতে লাগল।

অন্যদিন এই সময়টায় ননীবালা হয় জপের মালা নিয়ে বসে, না হয় তো অফিস ঘর থেকে কোনও ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এসে পড়ে। আজ ওর কোনও ইচ্ছেই করল না। পরিষ্কার থান পরে নিয়ে ও ছাদে এসে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদ। কেমন যেন হলদেটে। দূরের গেরস্ত বাড়িগুলোকে ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছে। এক ফোঁটা হাওয়া নেই। অন্যদিন ছাদে এই সময়টায় আরও কয়েকজন এসে পায়চারি করে। অথবা মাদুর পেতে বসে জপ করায় ব্যস্ত থাকে। আজ কেউ নেই। পারুল বুড়ির ভয়ে কেউ ছাদে ওঠেনি। আরে যে নেই, তাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কী আছে? এই সরল সত্যটা কেন অন্যেরা বুঝতে পারছে না?

ছাদে হালকা পায়ের শব্দ শুনে ননীবালা ফিরে তাকাল। জয়ামঞ্জরী। ও বলল, "হারাটা দিন কুন চুলায় ছিলা ননীবালা? লোকে আইস্যা খুঁইজ্যা যায়।"

মেয়েটার প্রশ্ন করার ধরনে খুবই বিরক্ত হল ননীবালা। ও রুষ্ট গলায় বলল, "ক্যাডা আইসিল? ঘনশ্যাম পাণ্ডা?"

"হেয় তিনবার আইল। আর একজনও আইসিল। নাম ঠিকানা দিয়া গেসে। তোমারে যুগাযুগ করতে কইসে।"

ঘনশ্যাম ছাড়া আবার কে এল ওর খোঁজে? ননীবালা ঠিক বুঝতে পারল না। নবদ্বীপের ওরা, এতদিন পর, হঠাৎই বা কেন দোয়ারকার পাণ্ডা ছেলেকে খোঁজ করতে পাঠাল, ওর মাথায় ঢুকছে না। ভাসুর-জা ছাড়া নবদ্বীপে আর ছিল ওদের ছেলে গোপাল। তখন তার বয়স ছিল চার-পাঁচ বছর। ননীবালাকে সে এখন মনে রেখেছে কী না সন্দেহ। নিশ্চয়ই সে বাপের মতোই হবে। সে কেন খোঁজ করতে যাবে খুড়িমার?

জয়ামঞ্জরী আশ্রমের অন্যদের কাছ থেকে উত্তর পেতে অভ্যস্ত। ননীবালা চুপ করে থাকায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "হোনো, যে পাণ্ডা তোমার খোঁজ করতাসে, হেয় গোঁসাই ঠাকুরেরে কইয়া গেসে, কাইল হকালে আইয়া তোমারে লইয়্যা যাইব। বার হইয়া যাইও না য্যান। তোমারে না পাইলে কইসে, আশ্রম জ্বালাইয়া দিব। জলে বাইস কইয়্যা আমরা কামোটার লগে কাইজ্যা করতে পারুম না। কী কথা কও না ক্যান? শুনছি নি আমার কথা?"

ঠাস করে এক চড় মারতে ইচ্ছে করল ননীবালার। রাগ চেপে, কোনও উত্তর না দিয়ে ও ছাদের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। আজ কাউকে ওর পরোয়া করার নেই। ও ঠিকই করে ফেলেছে বৃন্দাবনে আর থাকবে না। খুব কষ্ট হচ্ছে মনের মধ্যে। মানুষ স্বার্থ ছাড়া চলে না। নবদ্বীপের ওদেরও নিশ্চয়ই কোনও স্বার্থ আছে। না হলে পিছনে পাণ্ডা লাগাত না খোঁজ করে ঘনশ্যাম পাণ্ডা যখন আশ্রম পর্যন্ত এসেছে, তখনধরা ওকে পড়তেই হবে। আজ না হোক কাল।

কাল রাতে মুর্দাঘাটে যখন আচুকির কঠিন মুখে, চিতার আগুন খেলা করছিল তখন ও প্রশ্ন করেছিল, "কিসের মোহে আমরা এহানে পইড়্যা আছি রে আচুকি?"

যমুনার ধার থেকে হু হু করে বাতাস এসে চিতায় গ্রাস করছিল পারুল বুড়ির ছোট্ট দেহটাকে। আশ্চর্য, চিতায় তোলার পর ওই কোমর বাঁকা বুড়ি কিন্তু টানটান হয়ে গেছিল। ওর ছেলেকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। খবর দিলেও আসত বলে মনে হয় না। পিশাচ, একটা পেটে ধরেছিল পারুল বুড়ি। না হলে গর্ভধারিণী মাকে কেউ ত্যাগ করতে পারে?

ওই ছেলের কাজটাই কাল রাতে করল আচুকি। শবযাত্রায় একটা কথাও বলেনি। ঘাটে পৌঁছনোর পর লোকজনদের ঘুম থেকে ও-ই তুলে এনেছিল। টাকা পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। চিতা জ্বলার পর আচুকি চুপ করে গিয়ে বসেছিল একটা পাথরের উপরে। ননীবালার প্রশ্নটা শুনে ও বলেছিল, "কুন দিন ভাবি নাই রে। তু ভাবিস না।"

দাহ কাজ শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে গেছিল। যমুনার ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে যখন ওরা চারজন সূর্য ওঠার অপেক্ষায়, তখন আরও একটি শবদেহ মুর্দাঘাটে এল। একটা সস্তা খাটিয়ায় মৃতদেহটি নিয়ে এসেছে পাঁচ ছ'জন। খাটিয়াটা অবহেলায় ফেলে রেখে মুর্দাঘাটের লোকজনকে ডাকতে গিয়েছে শববাহকরা। সেই সময় মৃতের মুখটা দেখে চমকে উঠেছিল ননীবালা। বনোয়ারীলাল! ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠেছিল। লোকটা মারা গেল!

ছাদের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন খুব কষ্ট অনুভব করছে ননীবালা, ওই বনোয়ারীলালের জন্য। লোকটাকে শেষ দেখেছিল দোলের সময়, প্রতি বছরের মতো, ও অজান্তে, দোলের দিন সকালে ফাগ আর মিষ্টি রেখে গেছিল শৃঙ্গারবটে ওর ঘরের দোরগোড়ায়। কখন আসত, লোকটা নিঃশব্দে কখন চলে যেত, ননীবালা টেরও পেত না। বিকেলে গোবিন্দজির মন্দিরে উৎসবের সময় দূর থেকে বনোয়ারীলাল ওকে দেখত। প্রথম প্রথম রাগ হত। পরে অনুকম্পা। লোকটা জানত, ও বিধবা। ফাগ খেলার অধিকার ওর নেই। তবুও পাঠাত।

বনোয়ারীলাল ওকে কখনও অসম্মান করেনি। গত বাইশ তেইশ বছর ধরে ওকে শুধু অনুসরণ করে গেছে। বিমলা মাইয়ির মাধ্যমে একবার বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। সে বছর কুড়ি আগে। বিমলা মাইয়ি নানাভাবে বোঝানো সত্ত্বেও ননীবালা রাজি হয়নি। একেক সময় ও নিজেকেই প্রশ্ন করত, কী দেখেছিল লোকটা আমার মধ্যে? যৌবন? সে তো চলে গেছে। আসক্তিটা যদি শুধু যৌবনের টানে হত, তা হলে এই ক'দিন আগেও লোকটা ফাগ রেখে যেত না। লোকটা কি সত্যিই ভালবাসত? ভালবাসা কখনও এমন গভীর হয়?

বুকটা হুহু করছে ননীবালার। লোকটার জন্য। সেবাকুঞ্জে থাকার সময় একাবর প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাশায়ী। ঘরে জলটুকু নেই। আশপাশের মানুষগুলো কেউ উঁকি মেরেও দেখত না, ও শুয়ে আছে কেন? ননীবালা ভেবেছিল, বোধহয় আর বাঁচবে না। আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে হঠাৎ ও টের পেয়েছিল আচুকি এসে ওর সেবা শুশ্রূষা করছে। তিনদিন পরে উঠে বসে ও প্রশ্ন করেছিল, "তরে কে খবর দিসে, আমার জ্বর?"

আচুকি বলেছিল, "গোবিন্দজির মন্দিরের পাশে একটো দুকান আছে। উস আদমি নে হামকো বোলা।"

শুনেই ননীবালা বুঝে গেছিল, লোকটা কে? এক আধবার নয়। গত কুড়ি বাইশ বছরে অনেক অনেকবার বনোয়ারীলাল দূর থেকে ওকে মদত দিয়ে গেছে। একটা সময় আচুকি খেপাত, তুর আশিক ভাল আদমি আছে রে। হামার আশিক থাকলে হামি ব্রজধাম থিকে ভেগে গিয়ে শাদি করতাম।"

শুনে ননীবালা রেগে যেত। আচুকি হা হা করে তখন হাসত। সব মনে পড়ছে। নিজেকে কুরুপা করে তোলার জন্য ননীবালা প্রথম যেবার অত বড় চুল কেটে কদম ছাঁট দিল। সেবার গোবিন্দজির মন্দিরে মুখোমুখি হয়ে গেছিল বনোয়ারীলালের। আড় চোখে তাকিয়ে ননীবালা স্পষ্ট দেখেছিল, ওই মুখটায় বিস্ময় ও আক্ষেপ মেশানো। আর আহত হওয়ার যন্ত্রণা।

ভুল.....ভুল করেছিল সেদিন ননীবালা। সেদিন যেটা পাপ বলে মনে হয়েছিল, আজ সেটাকে মনে হচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা। আব্ধকার রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে পাপ-পুণ্যের বিচার করছে ননীবালা। তেইশ বছর বয়সে, অতৃপ্ত যৌবনে, ও যদি বনোয়ারীলালের ঘরে গিয়ে উঠত অথবা বিমলা মাইয়ির প্রস্তাব মতো বিয়ে করতে রাজি হত, তা হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? তা হলে ওর জীবনটা এমন অনিশ্চিত বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেত না। আর বনোয়ারিলাল নামে ওর একনিষ্ঠ প্রেমিকটিকেও আমৃত্যু একটা অতৃপ্তি নিয়ে মরতে হত না। কথাটা মনে হতেই ওর চোখের কোলে জল ছাপিয়ে এল। আজন্মলালিত সংস্কার ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। শুচিতা, পবিত্রতা, সতীত্ব অর্থহীন বলে মনে হল ননীবালার।

সারাটা দিন গোবিন্দজির মন্দিরে বসে থাকার সময় ওর চোখ বারবার ছুঁয়ে গেছে বনোয়ারীলালের দোকানটার দিকে। দরজা বন্ধ। কে জানে হয়তো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কী না? লোকটার সম্পর্কে কোনওদিন কোনও আগ্রহ জাগেনি ননীবালার। বিমলা মাইয়ির মুখেই ও শুনেছিল, বিপত্নীক। স্বজাতি। দীর্ঘদিন বৃন্দাবনের বাসিন্দা। মোতিবাগে ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি আছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। মন্দিরে বসে থাকার সময় মনে মনে একেকটা সময় ও একেকটা ছবি এঁকে গেছে। অনেকগুলো প্রশ্ন ওকে কুরে কুরে খেয়েছে।

বেলা তিনটে নাগাদ মন্দির থেকে হঠাৎ ননীবালা বেরিয়ে পড়েছিল ভজনাশ্রমের দিকে। আর পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে হালকা হওয়ার জন্য। দরজার সামনে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল চিটিওয়ালির। ফের সেই চিমটি কাটা প্রশ্ন, "কী রে ননীবালা, তোকে যে আজকাল এখানে দেখি না?"

মনটা বিক্ষিপ্ত, তাই ননীবালা বলেছিল, "টাইম পাই না।"

"কী করছিস আজকাল? এত ব্যস্ত? গতরও তো নেই যে, ভাঙিয়ে খাবি।"

মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল চিটিওয়ালির স্পর্ধা দেখে। জিভে ঝাল মিশিয়ে ননীবালা বলেছিল, "গতর যহন ছিল, তহনও ভাঙাইয়া খাই নাই। তোমাগো মতো!"

"খুব কথা শিখেছিস, তাই না?"

আর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি ননীবালা। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেছিল। কীর্তন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। হলঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত মুখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল ও। প্রায় সবাই ওর চেনা। দিনের পর দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ননীবালা নিজেও এই ক'দিন আগে ওখানে গিয়ে বসেছে। ডান দিকে একটা থামের পাশে ঋসা সীতার মাকে ওর চোখে পড়েছিল। কোঁচড় থেকে মুড়ি-জিলিপি বের করে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে। বোধহয় কোনও ধর্মশালা থেকে পেয়েছে। কালও এই দৃশ্যটা চোখে পড়লে ওর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত। সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসত। আজ চোখ খুলে গেছে। তাই সীতার মায়ের পাশেই বসে ও গল্প জুড়ে দিয়েছিল।

দিন কয়েকের জন্য দেশে গিয়েছিল সীতার মা। নাতনির অন্নপ্রাসনে। সেই গল্পই করে গেল সারাক্ষণ। হঠাৎ পিঠে লাঠির খোঁচা খেয়ে ননীবালা চমকে উঠেছিল। সামনেই জমাদারনি। ভজনাশ্রমে বসে গল্প করার শাস্তি জমাদারনির লাঠি। সীতার মা সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি উধাও করে দিয়েছিল আঁচলের তলায়। ঠিক সেই সময় সামনের দিকে কে যেন উলু দিয়েছিল। সমস্বরে উলুধ্বনির মাঝে হঠাৎ ননীবালার চোখে পড়েছিল উল্টো দিকে জমাদারনি দাঁড়িয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তখনও ওর মতলবটা বুঝতে পারেনি। বুঝেছিল কীর্তন শেষ হওয়ার পর উঠতে গিয়ে। কোঁচড়ে দুটি চাকতি। লাঠির খোঁচা দেওয়ার সময় জমাদারনি কখন যে চাকতি দুটো ফেলে দিয়ে গেছে ও টেরই পায়নি।

সেই মুহূর্তেই ননীবালা বুঝে গেছিল। ভজনাশ্রম থেকে দামি কোনও কিছু আজ বিলি করা হবে। চাকতি দুটো হাতের তালুতে রেখে ও ফের বসে পড়েছিল। স্পষ্ট ইঙ্গিত। যা দেওয়া হবে, তার একটা জমাদারনি নেবে। অন্যটা ওর। লেনদেনের ব্যাপার না থাকলে অযাচিতভাবে চাকতি দুটো জমাদারনি ফেলে দিয়ে যেত না। চোখাচোখি হতে ননীবালা ঘাড় নেড়েছিল। অর্থাৎ দিয়ে যাবে। সেটা বোঝা মাত্রই জমাদারনি সরে গিয়েছিল। অন্য দিন এই অন্যায় ননীবালা প্রশ্রয় দিত না। আজ অন্য রকম দিন। যা কোনওদিন করেনি, তা করতে চেয়েছে। ভজনাশ্রম থেকে দুটো শাল পেয়ে, একটি জমাদারনিকে দিয়ে, অন্যটি মাত্র তিনশো টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে কেডিয়া স্টোর্সে। টাকাটা ওর দরকার।

"মাসি খাইতে যাইবা না?"

নরম গলার প্রশ্নটা শুনে ননীবালা ফিরে তাকাল। চাঁপা নীচে খাওয়ার পর্ব চলছে। তাই ডাকতে এসেছে। ও বলল, "না রে মা, খামু না। ভাল লাগতাসে না।"

চাঁপা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হইসে মাসি?"

"কিসু না। ভাবতাসি এহানে থাকুম না। দ্যাশে ফিইরা যামু।"

"তাইলে আমার কী অইব মাসি?"

"তুই আমার লগে যাবি? চল, আমার কাছে মাইয়ার মতো থাকবি।"

"কিন্তু দাদা যদি আমারে লইতে আসে?"

পোড়ারমুখি, মনে মনে ননীবালা বলল, তরে আর লইতে আইছে। জগতে সব পুরুষ মানুষই সমান। স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও একটু পিছু হটল। সত্যিই কি তাই? বনোয়ারীলালের মুখটা চকিতে ভেসে ওঠে ওর মনে। ওই লোকটার তো কোনও স্বার্থ ছিল না? তা সত্ত্বেও কেন সারা জীবন ওর উপকার করে গেল? উত্তর শোনার অপেক্ষায় চাঁপা তাকিয়ে রয়েছে। তাই ননীবালা বলল, "তর দাদারে আরএকডা চিঠি লিইখ্যা দিমু। এহানে য্যান না আহে।"

"আমারে লইয়্যা কোনহানে যাইব্যা মাসি? আমারও এহানে ভাল লাগে না। গোসাইরে দ্যাখলে মন কয়, বটি দিয়া কুপাইয়া থুই। তুমি কবে যাবা মাসি?"

"পরে কইয়া দিমু। তুই গুছাইয়া রাখিস। পলাইতে অইব।"

"তোমারে একডা কথা কমু মাসি? এ হানে সবাই তোমারে দুষতাসে। পারুল বুড়িরে নাহি তুমি বিষ দিসো।"

অত দুঃখের মধ্যেও ননীবালা হেসে বলল, "কয় বুঝি? কউক। তুই এক কাম কর। ঘর থেইক্যা গদিডা আইন্যা দেয় আইজ ছাদে শুমু।"

রোজ সন্ধে বেলায় ছাদে জল ছিটিয়ে ঝাঁট দেয় চাঁপা। ধুলো জড়ো করে রাখে এক কোণে। পরিষ্কার ছাদে এমনিতেই শুয়ে পড়া যায়। তবও ঘর থেকে চাঁপা তোষক এনে দিল। তার উপর চাদর বিছিয়ে বলল, " তুমি শোও মাসি। আমি প্যাটে কিছু দিয়া আসি।"

হালকা বাতাস বইছে। ক্লান্ত ননীবালা টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখের সামনে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। শৃঙ্গার বটে ঘুপড়ি ঘরে থাকার সময় ও কোনও দিন তারাভরা আকাশ দেখার সুযোগ পায়নি। শরীরটা হালকা করে দিয়ে ও আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশে চলে যায়। পারুল বুড়িও নিশ্চয় ওখানে কোথাও চলে গেছে। আর কোনও দিনও কারও বিরুদ্ধে ও অভিযোগ করতে আসবে না। খেয়ে বলবে না, আমাকে খেতে দিল না। আশ্চর্য, কাল দুপুরেও মানুষটা ঘ্যানঘ্যান করেছিল। "অ ননীবালা, আমায় কী আম এনে দিলি?" আজ আর অস্তিত্ব নেই। ব্রজের রজে মিশে গেছে চিরদিনের মতো।

...অনেক রাতে চাপা হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই ননীবালা উঠে বসল। ছাদের লাগোয়া সব ঘরের দরজা বন্ধ। কাল পর্যন্ত সবাই দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়েছে। পারুল বুড়ির আতঙ্কে আজ কেউ খোলা রাখতে সাহস পায়নি। হাসির শব্দটা কোথা থেকে আসছে, দেখার জন্য উঠে ননীবালা কার্নিশের কাছে গেল। নীচে মন্দিরের দরজা বন্ধ। কার্নিশের অন্য প্রান্তে যেতেই ও দেখল গোঁসাই ঠাকুরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। জানলাটা হাট করে খোলা। হাসির শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। নিজেকে আড়াল করে, একটু উবু হয়ে ননীবালা দেখার চেষ্টা করল, এত রাতে ঘরের ভেতর কে হাসছে। জানলা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই ও পাথর হয়ে গেল। খাটে আধশোয়া জয়ামঞ্জরীর কোলে গোঁসাই ঠাকুর শুয়ে রয়েছে। ওর পরিপুষ্ট দুটো স্তন উন্মুক্ত। গোঁসাই খেলা করছে স্তন দুটো নিয়ে। কখনও চুষছে। কখনও আঙুল ছুঁইয়ে নাড়াচাড়া করছে বৃন্ত দুটিকে নিয়ে। সুড়সুড়ি দিচ্ছে। জয়ামঞ্জরী হেসে উঠে গোঁসাইয়ের হাত ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বৃন্ত নিয়ে খেলা নয়। ও চাইছে, গোঁসাই স্তন মুখে তুলে নিক। মা যেমনভাবে বাচ্চাকে স্তন পান করায়, ঠিক সেই ভাবেই নিজের স্তন গোঁসাইয়ের মুখে তুলে দিল জয়ামঞ্জরী।।

ছাদ থেকে এই দৃশ্য দেখে ননীবালার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রায় পঁচিশ বছর আগে, নিজের বিবাহিত জীবন, ভাল ভাবে শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেছিল ওর। বৈধব্যের কারণে এত দিন যৌন ইচ্ছা জোর করে দমিয়ে রেখেছিল। অন্যের যৌন ক্রিয়া দেখা আজ ওর পাপ বলে মনে হল না। ও কার্নিশের ডানদিকে সরে এল। জয়ামঞ্জরীর স্তন দুটো গোঁসাই দু হাতে টিপে ধরেছে। বিস্ফারিত চোখে ননীবালা দেখল, পিচকারির মতো সাদা দুধ বেরিয়ে আসছে। জয়ামঞ্জরী তা হলে সন্তানবতী। কই, ওকে দেখে তো কখনও তা মনে হয়নি?

চোখের সামনে একজন পূর্ণ যুবতীর ওই কামভাব দেখে ননীবালার সুপ্ত কামনা এবার জেগে উঠছে। এখনও অনিয়মিতভাবে ও রজস্বলা। ধীরে ধীরে ও উত্তেজিত হতে লাগল।

এত দিন অপার্থিব জগতের টানে ননীবালা এত মোহগ্রস্থ ছিল যে, জাগতিক সুখ ভোগের কথা চিন্তাও করেনি। আজ ওর মনে হল, ভুল করেছে। বনোয়ারীলালের আহ্বানে সাড়া দিলেই ও বোধহয় ভাল করত। নিজের যোনি পথ পিচ্ছিল হতে শুরু করেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ও নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। না, এত বছর পর বেপথু হওয়ার কামনাকে ননীবালা তাড়াতে পারল না। ফের ও উঠে দাঁড়াল, জানলায় চোখ রাখার জন্য।

ননীবালার হঠাৎই কনকমঞ্জরীর বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। গোঁসাই কখনও গোপাল, আমরা মা যশোদা। কখনও উনি রাধামাধব, আমরা সেবাদাসী। এখন তা হলে জয়ামঞ্জরী সেবাদাসীর ভূমিকায়।

ঠিক এই সময় ছাদে খুট করে একটা শব্দ শুনতে পেল ননীবালা। বাথরুমে যাওয়ার জন্য কেউ বোধহয় দরজা খুলেছে। অস্বস্তিকর একটা

মুহূর্ত। ধরা পড়ার আশঙ্কায় ও উবু হয়েই রইল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঝর্না। বাইরে পা দিয়েই ও মা গো বলে ফের ভেতরে ঢুকে গেল। সেই সুযোগে ননীবালা পা চালিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজা আবার খুলেছে। ঝর্না এবার একা নয়। ঘুম চোখে উঠে এসেছে কমলা ও প্রিয়া। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে ননীবালা।

"আমি নিজের চোখে দেকেচি। পারুল বুড়ি কার্নিশ ধরে দাইড়ে আচে।"

বিশ্বাস হচ্ছে না কমলার। "কী দেখতে কী দেখেচিস। যা তলপেটে খালি করে আয়। পারুল বুড়িকে আমরা সামলাচ্ছি।"

ওর কথায় হাসছে প্রিয়াও। হাই তুলে ও বলল, "ছাদেই কইর‍্যা ফ্যাল। কে আর দ্যাখব? গন্ধ হইলে কাইল জল দিয়া ধুইয়া দিমু।"

কমলা বলল, "গোঁসাই ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বলচে, দেকেচিস?"

"দেখসি। জয়া সাধন করত্যাসে। যাইস না মুখপুড়ি। দ্যাখলে পাপ অইব। গোঁসাই ঠাকুর কইসে, এই পাপে লক্ষ যোনি কীট হইয়া জন্মাইতে অইব।"

ওদের কথা শুনে রাগ হচ্ছে ননীবালার। অল্পবয়সী এই মেয়েগুলোর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে গোঁসাই। তাই কী? কমলা, ঝর্নারা অনেকেই স্বামী পরিত্যক্তা। কেউ আবার গোঁসাইয়ের টানে স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, অবাধ যৌনাচার। তাতেই খুশি। চাঁপাটাই হতভাগী। সতীত্ব দেখাতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছে।

রাতে আর ঘুমোতে পারল না ননীবালা। গোঁসাই ঠাকুরের রতিক্রিয়ার কথা ওর যখনই মনে পড়ছে, সারা শরীরে তখনই ও জ্বালা অনুভব করেছে। ভোরবেলায় আকাশের তারাগুলো লুকিয়ে পড়ার আগেই ও উঠে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে স্নান সেরে নিয়ে দ্রুত ও নিজের জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে নিল। মন ঠিক করে ফেলেছে। এই আশ্রমে আর থাকবে না। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে ননীবালা ফিসফিস করে ডাকল, "এই চাঁপা, উঠ। যাবি না?"

চাঁপা ঘুম চোখে উঠে বসল। তারপর ধড়মড় করে চারপাই ছেড়ে নীচে নেমে বলল, "দাঁড়াও মাসি। গুছাইয়া লই।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে চাঁপাও তৈরি। দু'জনের হাতে দুটো পুঁটলি। গেট খুলে সন্তর্পণে ওরা বেরিয়ে এল। সকালে সবাই বুঝে যাবে। ননীবালার জন্য কেউ আক্ষেপ করবে না। কিন্তু চাঁপাকে খোঁজার একটা চেষ্টা নিশ্চয়ই এরা করবে। আকাশ ফর্সা হওয়ার আগেই দু'জন গুরুকুল পেরিয়ে এল। ননীবালা এবার নিশ্চিন্ত।

মথুরা-বৃন্দাবন রোডে পৌঁছনোর আগে ননীবালা একটা মোটর বাইকের আওয়াজ শুনতে পেল। দূর থেকেই ও দেখতে পেল ঘনশ্যাম পাণ্ডাকে। ওর খোঁজে আসছে। হাঁটতে থাকলে মুখোমুখি হয়ে যাবে। ডানপাশেই এক গেরস্ত বাড়ি। চাঁপার হাত ধরে ননীবালা চট করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

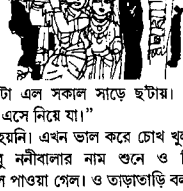

বড়িদিদির ফোনটা এল সকাল সাড়ে ছ'টায়। লালা, ননীবালা এখন আমার বাড়িতে। তুই এসে নিয়ে যা।"

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এখন ভাল করে চোখ খুলতে পারছে না রাজা। কটকট করছে। তবু ননীবালার নাম শুনে ও বিছানায় উঠে বসল। ভদ্রমহিলাকে তা হলে পাওয়া গেল। ও তাড়াতাড়ি বলল, "আমি আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি বড়িদিদি। আপনি ওকে ছাড়বেন না।"

বড়িদিদি হেসে বললেন, "না, না। ও কোথাও যাবে না। আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছে। কী প্রবলেম দ্যাখ। একটা ইয়ং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আনম্যারেড। প্রেগনেন্ট। ওকেও সঙ্গে রাখতে চায়।"

"আপনি কি সব বলে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। যতটুকু জানি। শুনে ও তো অবাক। শোন, ঘনশ্যাম পাণ্ডা ওকে খুঁজছে কেন বল তো? আজ ভোরেও নাকি ওদের আশ্রমে গেছিল।"

রাজা কালই জেনেছে ঘনশ্যামের কথা। পরে মিঠু ওকে কারণটা আন্দাজ করে জানায়। দৈনিক জাগরণে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কল্যাণব্রত। ননীবালাকে যে খুঁজে দেবে, সে দশ হাজার টাকা পাবে। হয়তো সেই লোভে হতে পারে। বড়িদিদিকে ও বলল, "কিছু না। দাদাগিরি। যাকগে, আমি আসছি। ওকে রেডি করে রাখুন।"

ফোনটা ছেড়েই রাজা দ্রুত তৈরি হতে লাগল। কাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত ও দু' চোখের পাতা এক করতে পারেনি। মিঠুকে নিয়ে দুপুর থেকেই অদ্ভুত চিন্তায় পড়েছে। জীবনে এই প্রথম কোনও মেয়েকে ভালবাসল। অথচ...। বড়িদিদির মুখে মিঠুর বৈধব্যের কথা শোনা ইস্তক ও দ্বিধার মধ্যে পড়েছে। একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে বৃন্দাবন শহরে বাস করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে। মানসিকতায় এখনও এই শহরের লোকেরা দ্বাপর যুগে পড়ে আছে। নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা আসবে। সেটাও না হয় সামলে নেওয়া যাবে। কিন্তু মাম্মি? যদি না মানে, তা হলে?

কাল বিকালে দোকানে বসে রাজা যখন এ সব কথা ভাবছিল, তখন আড্ডা মারতে এসেছিল ধর্মেন্দ্র। কথায় কথায় ও বলল, " তোর কলকাতাওয়ালির খবর কী রে? সেদিন দেখলাম, টাইট জিনস পরেছে। ছোটে বাবার আশ্রমের দিকে যাচ্ছে।"

ধর্মেন্দ্রর কথায় জিনস নিয়ে হালকা শ্লেষ। ও এমন পরিবারের ছেলে, যেখানে এখনও সবাই ধুতি পরে। স্কুলে ও হাফ প্যান্ট পরে আসত। স্কুল ছাড়ার পর ধুতি ধরেছে। ওদের পরিবার এখনও খুব রক্ষণশীল। ধর্মার সঙ্গে ওর এত বন্ধুত্ব। অথচ ওদের বাড়িতে গেলে ওর মা-কাকিমারা ছাড়া রাজার সামনে আর কেউ আসে না। ধর্মা ওদের বাড়িতে এসে সঙ্গীতা ভাবির সঙ্গে আড্ডা মেরে যায়। কিন্তু ধর্মার ভাবিকে রাজা মাত্র একটা দিনই সামনাসামনি দেখেছিল। সেই বিয়ের দিন। ধর্মা চিন্তাই করতে পারে না, ওদের বাড়ির কোনও মেয়ে জিনস পরে রাস্তা ঘুরবে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ধর্মা জিজ্ঞেস করেছিল, "রাজা, তুই কি কোনও প্রবলেমে পড়েছিস?"

রাজা কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলেছিল। "হ্যাঁ রে। তোকে বলতে কোনও সংকোচ নেই। ইটস এ রিয়েল প্রবলেম। আমি কালই জানতে পারলাম, মিঠু উইডো।"

"মাই গড। ও তোকে জানাল? না, অন্য সোর্স থেকে জানলি?"

"অন্য সোর্স থেকে। কী করি বল তো? আমার কপালটাই খারাপ।"

ধর্মা দৃঢ়ভাবে বলল, "দেন ফরগেট দিস গার্ল। জুঠা মেয়েকে কেন তুই বিয়ে করতে যাবি?"

রাজা প্রচণ্ড আহত হয়েছিল জুঠা শব্দটা শুনে। ও গুম হয়ে গেছিল। একটা মেয়ের জীবনে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটতেই পারে। জুঠা বলা মানে তাকে অপমান করা। ও জোর দিয়ে বলেছিল, "মিঠুকে আমি ছাড়তে পারব না ধর্মা। ওকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না।"

ধর্মা রেগে গেছিল। "টিপিকাল বাঙালিদের মতো কথা বলিস না তো? প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এ সব ফালতু সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই বুঝলি। পৃথিবীতে এত কুমারী মেয়ে থাকতে তুই একজন বিধবা মেয়েকে শাদি করতে যাবি কেন?"

রাজা পাল্টা রেগে বলেছিল। "তুই তো নাইনটিনথ সেঞ্চুরির লোকেদের মতো কথা বলছিস ধর্মা। একজন পুরুষ তো কখনও জুঠা হয় না?"

"পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের তুলনা করিস না। তুই তোর নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করিস। দ্যাখ, ওরা রাজি কী না? রাজা, এ সব পাগলামি ছাড়। তুই খুব প্রবলেমে পড়ে যাবি। মেয়েটার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন যদি তোর হয়েই থাকে, এনজয় ইট। কিন্তু ঘরে তোলার কথা মাথাতেও আনিস না।"

রাজা প্রচণ্ড রেগে গেছিল ধর্মার কথা শুনে। মিঠুকে ও কী ভেবেছে? বাজে মেয়েছেলে? তবুও নিজেকে সামলে ও বলেছিল, "একটা কথা তোকে জানিয়ে রাখি ধর্মা। দরকার হলে আমি বৃন্দাবন ছাড়ব। তবুও মিঠুকে ছাড়ব না।"

"ওয়ান্ডারফুল। অ্যাজ ইউ উইশ। চলি রে। আমার অনেক কাজ আছে। ফালতু চিন্তার সময় নেই। গুড লাক।" বলেই দোকান থেকে নেমে গেছিল ধর্মা।

কাল ওকে দেখেই রাজা বুঝে গেছে, কী ধরনের বাধা আসতে পারে. মিঠুকে ও যদি বিয়ে করে। মাম্মি, ভাবি, নবীন ভাইয়া, পাশের বাড়ির সুনীল, শর্মাজি... সবার মুখগুলো ওর চোখের সামনে পাক দিয়ে গেল একবার। মিঠুর অতীত জীবনের কথা কাউকে না জানিয়ে ও বিয়ে করতে পারে। কিন্তু এসব কথা চাপা থাকে না। বাড়ির লোকেরা জেনে যাবে চরণদাস বাবাজির কাছ থেকে। বাকি সবাইকে জানিয়ে দেবে কানাই পাণ্ডা। সারা বৃন্দাবনে অবাক চোখে মিঠুকে সবাই দেখবে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে ওরা যেতে পারবে কী না সন্দেহ। বড়িদিদি, একমাত্র বড়িদিদিই ওকে মদত দিতে পারেন। কথাটা ভেবে স্বস্তি পেল রাজা।

কাল রাত থেকে এসব কথা অনেকবার ভেবেছে ও। ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন ওর সামনে আসছে। আর একই যুক্তি দিয়ে ও তা খণ্ডন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। একটা টি শার্ট গলিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। রাজা হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাইনটা কেটে গেল। ঘড়িতে প্রায় সাতটা। এইসময় কে ফোন করতে পারে? নিশ্চয়ই সুমন নয়। আর এক ফোন করতে পারে মিঠু। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছেই আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। ও কেন এত সকালে ফোন করতে যাবে? আবার যদি রিঙ হয়, এই আশায় রাজা একটু দাঁড়িয়ে গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফের ক্রিং ক্রিং শুনে রাজা রিসিভারটা তুলে ইচ্ছে করেই মেয়েলি গলায় বলল, "কাকে চাই?"

সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্ত থেকে নোংরা গালাগাল। তারপর লোকটা হিন্দিতে বলল, "এ্যাই তোর দেবর কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে? যদি বেরিয়ে এসে থাকে তা হলে জেনে রাখ, আজকের মধ্যেই তার লাশটাতোদের কাছে পৌঁছে যাবে।"

রাজার মাথা গরম হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। ফোনটা যে করেছে, সে ভাবছে সঙ্গীতা ভাবির সঙ্গে কথা বলছে। কে এই লোকটা? নাহ্ ফোনটা নামিয়ে রাখা ঠিক হবে না। লোকটার মতলব জানতে হবে। নিশ্চয়ই ভদ্রঘরের নয়। শুরুতেই যে গালাগালটা দিল, সেটা শুনলে সঙ্গীতা ভাবি কেঁদে ফেলত। ও ফের মেয়েলি গলায় বলল, "কেন আমার দেবরজি তোমাদের কী ক্ষতি করেছে?"

"শোন... আবার গালাগাল দিল লোকটা, তোর দেবর একট। গুরুকুলের একটা আশ্রম থেকে ও একটা ইয়ং মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ একটু পরেই তোর দেবরজির খোঁজে বেরবে। ওকে লক আপে পুরবে।"

রাজার মুখ থেকে হাসি উবে গেল। একটু আগে বড়িদিদির মুখে ও শুনেছে, ননীবালা একজন ইয়ং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তার মানে, ফোন করার আগে লোকটা আশ্রমে গেছিল। এ নির্ঘাৎ ঘনশ্যামের লোক। হয়তো ভোর বেলায় ননীবালার খোঁজে আশ্রমে গেছিল। পায়নি। আশ্রমের কেউ হয়তো বলেছে, আরেকজন ও ননীবালার খোঁজ করছে। এমনও হতে পারে, সে রাজার নেমকার্ডটা দেখিয়েছে। তাতে বাড়ির ফোন নম্বর-টম্বর সব আছে। এ বার ভয় দেখাচ্ছে। লোকটাকে রাজা চিহ্নিত করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। ও নিজের গলায় বলল, "এ্যাই, সাহস থাকে তো বল, তুই ঘনশ্যামের লোক কী না? তা হলে আমি এখনই তোদের ডেরায় যাচ্ছি। ঘনশ্যামকে বলবি, বাড়ির মেয়েদের ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই।"

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিল। রাজা স্কুটার নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। ও প্রথমে যাবে বড়িদিদির বাড়িতে। ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে তারপর যাবে রাধাকুঞ্জে। ওখান থেকে ফোন করতে হবে দিল্লিতে। মিঠুর স্যারকে সব জানাতে হবে। উনি যদি নিজে এসে নিয়ে ননীবালাকে যেতে চান, ভাল। আর যদি দিল্লিতে পৌঁছে দিতে আসতে বলেন, তা হলে মিঠু আর ও গিয়ে স্যারের কাকিমাকে দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ননীবালার কথা ফোনে একবার মিঠুকে জানিয়ে দিলে হত। পরক্ষণেই রাজা ভাবল, না, দরকার নেই। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই ও রাধাকুঞ্জে পৌঁছে যাবে। এখন ফোন করলে মিঠুকে চমকে দেওয়া যাবে না।

গাদিবিহার থেকে রঙ্গনাথজির মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ই রাজা টের পেল, একটা মোটর বাইক ওকে ফলো করছে। ঘনশ্যাম তাহলে পিছনে লোক লাগিয়ে দিল। খুব মরিয়া হয়ে গেছে। বাইকে কে বসে, তা বোঝার জন্য রাজা স্কুটারের গতি কমিয়ে আনল। পিছন ফিরে একবার তাকাল। ওহ্, সুরজ পাণ্ডে। ঘনশ্যামের ডান হাত। স্কুটার চালাতে চালাতেই রাজা ঠিক করে নিল, এখনই বড়িদিদির বাড়ি যাবে না। ননীবালা কোথায় আছেন, ওদের জানতে দেওয়া উচিত না। ও আখড়ার রাস্তা ধরল। আখড়ায় গিয়ে বড়িদদিকে একটা ফোন করে দেবে। জানিয়ে দেবে পৌঁছতে একটু দেরি হবে। সুরজ পাণ্ডেকে ধোঁকা দেওয়া দরকার। তারপর অন্য রাস্তা ধরে সিধে বাঁকেবিহারী কলোনি।

আখড়ার কাছাকাছি পৌঁছনোর পরই পিছন ফিরে রাজা দেখল, বাইকটা নেই। সুরজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে। আখড়ার ছেলেদের হাতে গণপিটুনি খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তার চেয়ে কেটে পড়া ভাল। স্কুটার দাঁড় করিয়ে রাজা মুচকি হাসল। এখান থেকে অলিগলি দিয়ে বাঁকেবিহারী কলোনিতে যাওয়া যায়। কিন্তু রাজা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কে জানে, ঘনশ্যামের লোক বড়িদিদির বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে কী না? আখড়ায় ঢুকে ও মোবাইল সেট থেকে ফোন করল। ও প্রান্তে বড়িদিদি। ঘনশ্যামের কথা তুলতেই বড়িদিদি বলল, "আরে, এ রকম একটা উড়ো ফোন তো সকালে আমার বাড়িতেও এসেছিল। শোন লালা, তোর এখানে আসার দরকার নেই। আমি নিজেই ননীবালাকে পৌঁছে দিচ্ছি রাধাকুঞ্জে। যদি কোনও ঝামেলায় পড়ি, তা হলে তোকে জানিয়ে দেব।"

কথাটা রাজার মনঃপুত হল না। তবুও কিছু ও বলল না। আখড়া থেকে বেরিয়ে ও স্কুটার চালিয়ে দিল রামন রেতির দিকে। দোকানে একবার যাওয়া দরকার। সোজা পথে না গিয়ে ও একটু ঘুরপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বৃন্দাবনের রাস্তাঘাট হাতের তালুর মতো ওর চেনা। বেশ কয়েকটা গলি পেরিয়ে ছোটে বাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকেই ও দেখতে পেল, একটা রিকশা থেমে নামছেন লাবণ্যপ্রভা। দেখে ওর খারাপই লাগল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চরণদাস বাবাজি। রাজাকে স্কুটারে দেখতে পেয়ে বললেন, "আরে রাজা তুমি! তোমাকেই ফোন করেছিলাম এখুনি। তোমায় কে খবর দিল? সঙ্গীতা মা? নেমে এসো। খুব জরুরি আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে।"

দশটার সময় মিঠুর কাছে যাওয়ার কথা। এখন আটটাও বাজেনি। আশ্রমে ঘণ্টা খানেক বসলেও কোনও ক্ষতি নেই। রাজা স্কুটার দাঁড় করানোর ফাঁকে লক্ষ্য করল, লাবণ্যপ্রভা সস্নেহে তাকিয়ে রয়েছেন ওর দিকে। ভদ্রতা করে ও বলল, "আপনি রিকশায় এলেন কেন মাম? আমাকে বললে, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।" মাম কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। মিঠুকে ও মাম বলেই ডাকতে শুনেছে।

লাবণ্যপ্রভার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "রিকশায় আমার কোনও কষ্ট হয়নি বাবা। তুমি আসায় ভালই হয়েছে। চরণদাস বাবাজিকে আগে বলে রেখেছিলাম। কাল তোমায় বলতে উনি ভুলে গেছিলেন।"

"আমাকে কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ বাবা! চলো ভেতরে চলো। আমি একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছি। আমায় উদ্ধার করার দায় তোমার।"

রাজা ভেতর ভেতর একটু অবাক হচ্ছে। কী বলতে চান লাবণ্যপ্রভা? কাল বাড়িতে বসেও বলতে পারতেন। কী এমন কথা আছে, যা চরণদাস বাবাজির সামনে বলা দরকার? লাবণ্যপ্রভার পিছু পিছু ও রিশেপসনে এসে বসল। এ আশ্রমে রাজা অনেকবার মাম্মির সঙ্গে এসেছে। সব কিছুই ওর চেনা। বাড়ির সবাই দীক্ষা নিয়েছে। ও ছাড়া।

মাম্মি অনেকবার বলা সত্ত্বেও রাজি হয়নি। উল্টো দিকে বসা লাবণ্যপ্রভার দিকে তাকিয়ে রাজার মনে হল, উনি যদি একবার বলেন, ও দীক্ষা নিতে রাজি।

চরণদাস বাবাজি ঘরের ভেতরে ঢুকে বললেন, "মা, আপনারা দু'জন কথা বলে নিন। আমি কন্ট্রাক্টরদের একটু পরে ডেকে নিচ্ছি। দরজটা বন্ধ করে দিলাম। কেউ ডিসটার্বড করতে আসবে না এখন।" কথাটা বলেই উনি বেরিয়ে গেলেন।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "রাজা, তোমাকে একটা কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম এতদিন। সত্যি বলতে কী ফাঁকায় পাচ্ছিলাম না। আমি এখানে পার্মানেন্টলি থেকে যাওয়াই মনস্থ করলাম।"

রাজা খুব খুশি হল কথাটা শুনে। ও বলল, "ঠিক ডিসিসন নিয়েছেন।"

"টুনডলা থেকে যেদিন তুমি আমাদের আনতে গেছিলে, সেদিন একটা কথা তোমায় বলেছিলাম তোমার হয়তো মনে নেই, আমার পায়ে এখন একটাই বেড়ি। মিঠু। ওর জন্যই এতদিন মনস্থির করতে পারছিলাম। মিঠুর ব্যাপারেই একটা কথা সরাসরি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

রাজা বলল, "কী জানতে চান বলুন।"

"দেখো, মিঠুর সঙ্গে কথা বলে, ওর মুখে ভাসা ভাসা কিছু কথা শুনে ইদানীং আমার মনে হয়েছে, ও তোমাকে খুব পছন্দ করে। আমাদের সম্পর্কটা মা-মেয়ের হলেও, মিঠু কিন্তু কিছুই লুকোয় না আমার কাছে। আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তোমাদের সম্পর্কটা ঠিক কতটা গভীর। আমি যদি তোমায় মিঠুকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিই, তুমি কি তাতে রাজি? না, না, এখনই তোমার হ্যাঁ বা না বলার দরকার নেই। আগে মিঠু সম্পর্কে কিছু কথা তোমাকে জানাতে চাই। সেটা শুনে জবাব দিও।"

রাজা বলল, "মাম, জানি আপনি কী বলতে চাইছেন? মিঠু আমাকে সব বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি শুনতে চাইনি। অতীতে কী হয়েছে, সে কথা শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।"

"না, তবুও তোমার জানা দরকার বাবা। দুঃখের কথা কী আর বলব, বছর তিনেক আগে ভাল একটা ছেলে দেখেই ওর বিয়েটা দিয়েছিলাম। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। কী জানি কী হল, বউভাতের রাত্তিরটা কাটতে না কাটতেই মিঠু আমার বাড়িতে ফিরে এল। আসলে ছেলেটাকে প্রথম থেকেই পছন্দ ছিল না ওর। আমার ছেলে ইনসিস্ট করল। আত্মীয় স্বজনদেরও অনেকে চাইল। তাই ওর অমতেই বিয়েটা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই যে

বউভাতের পর মেয়েটা ফিরে এল, আর শ্বশুর বাড়িতে গেলই না। আমরা অনেক বোঝালাম। ওর স্যার ওকে বোঝাল। এমনিতে ও স্যারকে খুব ভক্তি করে। কিন্তু তাঁর কথাও ও শুনল না।"

রাজা জিজ্ঞেস করল, "কেন, অ্যাডজাস্ট করতে পারল না?"

"জানি না। ছেলেটা একটু বেশি ড্রিঙ্ক করত। জাহাজের চাকরি। ড্রিঙ্ক করাটাই স্বাভাবিক। বিয়ের আগে অবশ্য সেটা জানতাম না। পরে শুনলাম, ওর নাকি আরেকটা বউ ছিল সুইডেনে। সেটা প্রথম দিনই মিঠু জানতে পেরেছিল কার কাছ থেকে। কনফার্মড হওয়ার পরই ওই বাড়ি থেকে ও বেরিয়ে আসে।"

"আপনারা আগে থেকে খোঁজ নেননি?"

"নিয়েছিলাম। কেউ বলেনি। পরে জানলাম, আমার ছেলে জানত। মিঠুকে জব্দ করার জন্য, ও জেনেশুনেও চুপ করে ছিল। পরে আমার এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছিলাম, বিয়ের রাতে ড্রিঙ্ক করে আমার ছেলে নাকি হাসতে হাসতে বলেছিল, মিঠুর যা সর্বনাশ করার আমি করে দিলাম।"

রাজা অবাক হয়ে শুনছে মিঠুর অতীত কাহিনী। আইনের কথাটাই ওর মাথায় প্রথম এল, "আপনারা ছেলেটার এগেনস্টে কোনও লিগাল স্টেপ নিলেন না কেন? বেশ কয়েক বছর জেল হয়ে যেত।"

"কী করে নেবো বলো? সুইডিশ মেয়েটার কোনও হদিশই করতে পারলাম না। আমরা যে কোর্টে প্রমাণ করতে পারতাম না। মিঠু তখন ডিভোর্স চাইল। দু'তরফের উকিলে কথা হল। ছেলেটা আমাদের কাছ থেকে কুড়ি লাখ টাকা চেয়ে বসল।"

শুনে হাসি পেল রাজার। ও বলল, "টাকাটা আপনারা দিলেন?"

"আমি দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু মিঠু বেঁকে বসল। ও প্রচণ্ড জেদি মেয়ে। সবে উইমেন্স ফোরামে ঢুকেছে। ও বলল, মাম তুমি আমার জন্য টেনশনে ভুগো না। যা করার আমি করছি। মাথার উপর মদনমোহন আছেন। উনিই আমাদের রক্ষা করলেন, জানো বাবা। এখানে গোলমাল পাকিয়ে ছেলেটা প্রথমবার ভয়েজে গেল চার মাসের জন্য। আর ফিরল না। এগজ্যাক্টলি কী হয়েছিল জানি না। জাহাজে ড্রিঙ্ক করে কার সঙ্গে যেন মারামারিতে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত খুন হল।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "খুন হল মানে?"

"হ্যাঁ খুন। ডেডবডি এখানে পাঠিয়েছিল। আমরা কেউ দেখতে যাইনি। যাক, ও সব পুরনো কথা। তোমাকে সব জানানো, প্রয়োজন মনে করছিলাম। সেটা জানিয়ে দিলাম। কাল রাতেও মিঠু চাইছিল না, এ সব কথা আমার মুখ থেকে তুমি শোনো। তুমি যদি ওকে না করে দাও বাবা, মেয়েটা আমার মারাত্মক আঘাত পাবে।"

রাজা বলল, "কোয়েশ্চেনই ওঠে না। আপনি এ কথা ভাবলেন কী করে?"

"কী জানি বাবা। তোমারা আজকালকার ছেলে। আমিও একটু ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু তোমার বড়িদিদি আমাকে সাহস দিলেন। কাল বললেন, স্কুলের ছাত্রদের আমি অন্যভাবে শিক্ষা দিয়েছি। রাজা কখনও পিছিয়ে যাবে না। চরণদাস বাবাজিও একই কথা বললেন। উনি বোধহয় তোমার মায়ের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন কাল। শুনলাম উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। কাল সকালেই উনি রওনা হচ্ছেন কলকাতা থেকে।"

ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, অথচ ও কিছুই জানতে পারেনি, এই কথাটা ভেবে রাজা অবাকই হল। কাল সারাটা দিন ও ফালতু টেনশনে কাটাল। লাবণ্যপ্রভা উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। রাজা বলল, "মাম, আমি এখনই রাধাকুঞ্জে যাচ্ছি। মিঠুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি কি মাইন্ড করবেন?"

"না, না, বাবা। তুমি যাও। আমি এখন কথা বলব, কনট্রাক্টরদের সঙ্গে। ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে যাবে।"

রাজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। লাবণ্যপ্রভাকে প্রণাম করার ইচ্ছেটা ও সংবরণ করল, কেন না সেটা হিন্দি সিনেমার মতো হয়ে যাবে। বাইরে বেরিয়ে ও স্কুটার চালিয়ে দিল পাথেরপুরার দিকে। ননীবালাকে দিয়ে বড়িদিদি এতক্ষণে নিশ্চয়ই রাধাকুঞ্জে পৌঁছে গেছেন। ও এখন সোজা মিঠুর ঘরে যাবে। ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে আদর করবে। রাজার খুব ভয় ছিল মাম্মিকে নিয়ে। মাম্মি যখন অরাজি হয়নি, তখন আর কারও পার্মিশন নেওয়ার দরকার নেই।

বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে রাজা দেখল, সেই মোটর বাইকটা ফের ওর পিছু নিয়েছে। তার মানে এতক্ষণে তক্কে তক্কে ছিল। ডান দিকের গলি দিয়ে একটু এগোলেই বৃন্দাবন থানা। স্বচ্ছন্দে ও থানায় ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু মন থেকে কে যেন ওকে বাধা দিল। ওর মনে হল, থানায় ঢোকাটা কাপুরষতার লক্ষণ হবে। ঘনশ্যামের সাহস আরও বেড়ে যাবে। পরে ও মুখ দেখাতে পারবে না ঘনশ্যামের কাছে। পরক্ষণেই মিঠুর মুখটা ওর মনে ভেসে উঠল। ও অপেক্ষায় মিঠু বসে আছে রাধাকুঞ্জে। কী দরকার, ঝামেলায় গিয়ে?

থানার দিকে রাজা টার্ন নিতেই একটা বাইক এসে পিছন থেকে ওকে ধাক্কা মারল। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়। কাঁধের কাছটায় খিচ করে উঠল। ও উঠে দাঁড়ানোর আগেই দু'দিক থেকে বাইকের দুটো চাকা এসে থামল ওর সামনে। একটা বাইকে বসা ঘনশ্যামকে তখনই ও দেখতে পেল। কাঁধের একটা জায়গায় খুব টনটন করছে। সেখানে হাত দিয়ে ও উঠে দাঁড়ানোর সময় ঘনশ্যাম বলল, "এ্যাই বাঙালির বাচ্চা, আশ্রমের বুড়িটাকে তুই কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?"

দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজা। ঘনশ্যামের সম্বোধনটা শুনে রাগে ওর কাঁধের ব্যথা উবে গেল। সেই স্কুলের দিনগুলোতেও ঘনশ্যাম যখন ওর সঙ্গে পারত না, তখন এই সব কথা বলেই গায়ের ঝাল মেটাত। একবার চোয়াল কষে রাজা বলল, "তোর কী দরকার রে বাস্টার্ড?"

বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ঘনশ্যাম। এখানে ওকে আর ওর দলবলকে সবাই চেনে। মারপিটের আশঙ্কায় আশপাশের দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গলির ও প্রান্তে কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। দুটো বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে তিনটে ছেলে। রাজা প্রশ্নটা করেই আড়চোখে আশ পাশটা দেখে নিয়েছে। ডানদিকে একটা মন্দিরের দেয়াল। ছোটবেলায় এ সব মারপিট ও অনেক করেছে। জানে, পিছন থেকে কাউকে আক্রমণের সুযোগ দিতে নেই। তাই চট করে দেয়ালটাকে পিছনে রেখে ও ডান দিকে সরে দাঁড়াল। ঘনশ্যামরা সংখ্যায় বেশি। যে কোনও দিক থেকে আঘাত করতে পারে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘনশ্যাম। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "টাকাটা তুই নিজেই নিবি, তাই না?"

"টাকা! রাজা ঠিক বুঝতে পারল না। ও জিজ্ঞেস করল, কার টাকা?"

"ওই বুড়িটাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা। তুই জানিস না?"

রাজা বলল, "ওহ, এই জন্য তুই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বেরাচ্ছিস? তা হলে তো তোকে আরও বলব না, উনি কোথায় আছেন।"

"তোর বাপ বলবে।" এক পা এগিয়ে এসে ঘনশ্যাম ওর চেলাদের বলল, 'এই শালাকে আমাদের ডেরায় নিয়ে চল। ওর পেট থেকে কীভাবে কথা আদায় করতে হয়, সেটা আমি দেখাচ্ছি।"

বাঁ দিক থেকে একটা ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখে রাজা চট করে সরে গিয়ে ঘুষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের নর্দমায়। এরপর আর অপেক্ষা করা যায় না। রাজা অ্যাকশন শুরু করে দিল। সোজা লাফ দিয়েই ঘনশ্যামের তলপেট লক্ষ্য করে লাথিটা মারল। নির্ভুল নিশানা। ঘনশ্যাম হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর বাইকের উপর। ঠিক সেই সময় রাজা টের পেল কানের পাশ দিয়ে গরম তরল কী যেন নামছে। হাত দিয়েই ও বুঝতে পারল, রক্ত।

পলকের অন্যমনস্কতা। পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল অন্য একটা ছেলে। মালাধারী আখড়ায় ছোটবেলা থেকে ওদের আত্মরক্ষার অনেক কৌশল শিখিয়েছেন রামানন্দজি। পিছন থেকে জাপটে ধরা লোককে কীভাবে কাবু করতে হয়, তা রাজার জলভাত। পিঠ উঁচু করেই ও বুঝে গেল, ছেলেটার ওজন বেশি না। একপ্যাঁচে ও ছেলেটাকে আছড়ে ফেলল। ঠিক সেই সময় ফের ওর কাঁধের কাছটায় খিচ করে উঠল। রাজা আন্দাজ করতে পারল না, ব্যথাটা মাসলে, না বোন জয়েন্টে? জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সময় নেই। ঘনশ্যাম নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওরও কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। যে কোনও মুহূর্তে ও আক্রমণ করতে পারে।

উল্টো দিকের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে বজ্রবাসী এক বৃদ্ধ গালাগালি দিচ্ছেন ঘনশ্যামকে। একজনের বিরুদ্ধে তিনজন। উনি সহ্য করতে পারছেন না। শুনে রাজা আরও টগবগ করে উঠল। ও এক পা এগিয়ে বলল, "এ্যাই লড়াই করার সাধ তো মিটেছে, নাকি আর দুটো লাথি খেয়ে বাড়ি যাবি।"

সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত গালাগালি করে উঠল ঘনশ্যাম। তারপর বলল, "কুত্তার বাচ্চা, তুই একটা বিধবা মাগিকে ভোগ করছিস। আর আমি স্বাতীর জন্য ঘরভাড়া নিলে দোষ, তাই না? ওই রেন্ডি মাগিটাকে রাধাকুঞ্জ থেকে তুলে এনে আমি যদি...." কুৎসিত কথাটা বলতে বলতেই ঘনশ্যাম ফতুয়ার পকেট থেকে কী যেন বের করে আনল। ক্লিক করে একটা শব্দ। রাজা দেখতে পেল, দশ-বারো ইঞ্চির একটা চাকু ঝলসে উঠল ওর হাতে।

ছেলেটা তা হলে পুরোপুরি অ্যাক্টি সোস্যাল হয়ে গেছে। এমন কিন্তু ছিল না। বরাবরই মাথা মোটা। ওকে দিয়ে অনেক বাজেবাজে কাজ করিয়ে

নিত অন্যরা। শুয়োরের বাচ্চার নজর তা হলে মিঠুর উপরও পড়েছে। ঘনশ্যামকে এবার মারাত্মক একটা আঘাত করতে হবে। যাতে চাকু দেখানোর সুযোগ ও আর কোনওদিন না পায়। রাজা প্রায় উড়ে গিয়ে দু'হাতে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রবল একটা ধাক্কা দিল। ঘনশ্যাম ছিটকে গিয়ে পড়ল মন্দিরের সিঁড়িতে। ওকে সময় দেওয়া যাবে না। কেননা ওর হাতের মুঠোয় এখনও শক্ত করে চাকুটা ধরা আছে। শরীর দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘনশ্যামের সাদা ফতুয়াটা লাল হয়ে গেছে। রক্ত দেখে রাজা থমকে গিয়েছিল। কিন্তু মিঠুকে উদ্দেশ্য করে গালাগালটা মনে পড়া মাত্রই ওর হাত ফের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল। অনেক দিন এই লোফারটার অত্যাচার ও সহ্য করেছে। আজ ছাড়বে না। তিন চার পা দৌড়ে গিয়ে রাজা ফের লাথি চালাল।

টাইমিংয়ের কি কোনও গণ্ডগোল হল? ঘনশ্যাম চিত হয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। তবে কেন রাজা ডান হাতটা তুলতে পারছে না। কেন শরীরটা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল? কানের কাছটায় ভো ভো করছে। চারপাশ থেকে কিছু লোক দৌড়ে আসছে। একটু পরেই চোখের সামনে বেশ কয়েকটা অচেনা মুখ। শ্রীবাস্তব না? আরে, বৃন্দাবন থানার ও সি-কে খবরটা কে দিতে গেল? ঘনশ্যামকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও তো একাই একশো। কারা যেন ধরে ধরে ওকে তুলতে চাইছে। খুব অপমানকর। ওদের গুরু রামানন্দজি জানতে পারলে রাজাখুব লজ্জায় পড়ে যাবে। তা হলে কী শরীরচর্চা করলে এতদিন আমার আখড়ায়? যাও, কঙ্কণ পরে বসে থাকো গিয়ে বাড়িতে। না কারও সাহায্য নেবে না রাজা।

হঠাৎই ওর মিঠুর কথা মনে হল। ইস, বেচারি বসে থাকবে রাধাকুঞ্জে। বেলা দশটার মধ্যে না পৌঁছলে, ও ধরেই নেবে বিয়ের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত রাজা পিছিয়ে গেছে। অভিমানী মেয়ে। শুধু, শুধু ভুল বুঝবে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসার আগে, রাজা বিড়বিড় করে বলল, "মিঠাই তুমি চিন্তা কোরো না। আমি আসছি।"

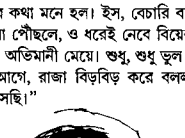

"স্যার, আপনার কাকিমা এখন আমাদের বাড়িতে।" মেয়েটা টেলিফোনে কাকে যেন বলছে। গলায় খুশির ছোঁয়া। "হ্যাঁ স্যার, আমাদের বাড়িতেই উনি এখন বসে আছেন। আপনি কি ফেনে একবার কথা বলবেন?"

বিমলা মাইয়ির বাড়িতে আগে একবার মেয়েটাকে দেখেছে ননীবালা। সে দিন পরনে ছিল সালোয়ার কামিজ। আজ টিলে স্কার্ট আর ব্লাউজ। চুলে অদ্ভুত খোঁপা। খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু মেয়েটাকে। আজকালকার মেয়েরা নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারে। ননীবালার বেশ ভাল লাগে দেখে। ওর পাশের চেয়ারে বসে আছে চাঁপা। তার ডান দিকে বিমলা মাইয়ি। চাঁপা খুব জড়সড় হয়ে রয়েছে এ বাড়িতে ঢুকে।

প্রায় চব্বিশ বছর পর এ বাড়িতে এল ননীবালা। সকালে বিমালা মাইয়ি যখন সব কিছু খুলে বলল, ওর তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ভাসুরের ছেলে গোপাল নবদ্বীপের সব সম্পত্তি ওকে দিয়ে আমেরিকা চলে যাবে! ভাবাই যায় না। ননীবালা ওকে শেষবার, দেখেছিল বৃন্দাবনে চলে আসার সময়। তখন কত বয়স হবে ওর? চার অথবা পাঁচ। এখন নিশ্চয়ই তিরিশ-একত্রিশ। দেখলে চিনতেও ধারবে না ননীবালা। তখন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল মাথায়। আর ছিল অদ্ভুত মেধা। সেই ছেলে নাকি অনেক পড়াশোনা করেছে। করাটাই স্বাভাবিক।

গোপালের চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে ননীবালা বাইরের দিকে তাকাল। জানালা দিয়ে মদনমোহনের মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। ওই মন্দিরের মেঝেতে ননীবালা দিনের পর দিন হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে। এই বাড়ির সঙ্গে কম স্মৃতি জড়িয়ে? বেশিরভাগটাই দুঃখজনক স্মৃতি। দ্বারকা পাণ্ডা ওকে যেদিন প্রথম এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, সে দিন ঠিক এই চেয়ারে বসেছিলেন বাবামশাই। বৈভব দেখে সেদিন ওর চোখ মুখের সেই অবস্থা হয়েছিল, আজ চাঁপার যা হয়েছে। অন্দর মহলের বাঁ দিকের কোণের ঘরটা ওর জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। সেই ঘরে একবারে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে হতে লাগল ননীবালার।

"স্যার তা হলে কী করব আপনি বলুন। আর একটু পরেই রাজা আসবে আমাদের বাড়িতে। ওর গাড়িতেই আপনার কাকিমাকে কি দিল্লিতে পাঠিয়ে দেব? যা আপনি বলবেন স্যার।" ফোনে গোপালের সঙ্গে কথাই বলে যাচ্ছে মেয়েটা। ননীবালা ঠিক বুঝতে পারছে না, মেয়েটা বিবাহিত, না কুমারী। ওকে নিয়ে এখন কী করা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এখানে আসার আগে ও বলে নিয়েছে, যেখানেই যাক, চাঁপা কিন্তু ওর সঙ্গে থাকবে। নবদ্বীপের বাড়িতে প্রায় কুড়ি খানা ঘর। মন্দির, অত বড় দালান। ওই রাক্ষুসে বাড়িতে গিয়ে ননীবালা এখন থাকবে কী করে ভেবে উঠতে পারছে না। বিমলা মাইয়ি বলল, প্রায় তিরিশ লাখ টাকার সম্পত্তি। তা হবে। পোড়া মা তলার অত কাছে। জমির দামই এখন প্রচুর।

ফোন ছেড়ে এসে মেয়েটা বিমলা মাইয়িকে বলল, "স্যার এঁদের দিল্লি পৌঁছে দিতে বললেন, পারলে আজই। ওখান থেকে উনি কলকাতায় নিয়ে যাবেন। সেখান থেকে নবদ্বীপ। আগে রাজা আসুক। তারপর মায়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যাবে, কখন রওনা হতে পারব? ভাবছি, রাজার সঙ্গে আমিও দিল্লি ঘুরে আসব।"

বিমলা মাইয়ি বললেন, "রাজার তো এতক্ষণে এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। ও আবার ঘনশ্যামের চক্করে পড়ল না তো?"

ননীবালা দেখল, মেয়েটার মুখ হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল। রাজাকে ও অনেক দিন ধরেই চেনে। বিমলা মাইয়ির খাস ছেলে। ওর সঙ্গে কী সম্পর্ক এই মেয়েটার? নিশ্চই গভীর সম্পর্ক। নাহলে হঠাৎ মুখটা শুকিয়ে গেল কেন মেয়েটার?

বিমলা মাইয়ির বাড়িতে একদিন দু'জনকে ও এক সঙ্গে দেখেওছে। সেদিন ওদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভুল করেছিল। পরে কথাবার্তায় বুঝতে পারে, না তা নয়। রাজা বিয়ে করলে নিশ্চয়ই ও জানতে পারত। বিমলা মাইয়ি অবশ্যই বাড়িতে আলোচনা করতেন। এ সব কথা ভাবার ফাঁকে ননীবালা সিদ্ধান্তে এল, যদি এই দু'জনের বিয়ে হয়, তা হলে কিন্তু খুব সুন্দর মানাবে।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বিমলা মাইয়ি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "মিঠু রাজার মোবাইলে একবার ফোন করে দেখো তো, ও এখন কোথায় আছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমার কর্তা একটু পরেই অফিসে যাবেন। আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে।"

মেয়েটার নাম তা হলে মিঠু। উঠে গিয়ে ও নম্বর ঘোরাতে লাগল। হঠাৎই ননীবালার মনে হল, মিঠু মেয়েটা আসলে কে? এ বাড়িতে থাকার সময় জগদীশ প্রসাদের মুখে ও শুনেছিল, রুদ্রপ্রসাদের একটা মেয়ে আছে। এই মিঠুই কি সেই মেয়ে? হতে পারে? তা হলে রুদ্রপ্রসাদের স্ত্রী কোথায়? পাশ ফিরে মিঠু নম্বর ঘোরাচ্ছে। ওর মুখ দেখে ননীবালা কিন্তু কোনও মিল খুঁজে পেল না সেই পিশাচটার। সে কি এখনও বেঁচে আছে? নিশ্চয় আছে। দুষ্ট লোকেরা সহজে মরে না।

বার কয়েক চেষ্টা করে মিঠু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "মিসেস বাসু, রাজার মোবাইলটা বোধ হয় অফ করা আছে। ওকে ধরতে পারছি না।"

শুনে উঠে দাঁড়ালেন বিমলা মাইয়ি। বললেন, "আমি তা হলে বাড়িতে একটা ফোন করে দিই। গীতাকে বলে দিই, ও যাতে আপিসের ভাতটা বেড়ে দেয়।"

বিমলা মাইয়ি ফোন করতে ওঠার পর মিঠু বলল, "কাকিমা, আপনাদের দু'জনকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তেমন হলে চান-খাওয়া সেরে নিতে পারেন। মায়ের আসতে একটু দেরি হবে।"

কাকিমা ডাক শুনে ননীবালার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। কত দিন পর আত্মীয়তা সম্বোধন! এত দিন ও ছিল নিছকই ননী... ননীবলা। ও বলল, "আমরা চাইন কইর‍্যা বাইরইসি। চাঁপারে তুমি কিছু খাইতে দাও।"

মিঠু বলল, "আপনি কিছু খাবেন না?"

"না, মা। ভাল লাগতাসে গোপালরে তুমি এহানে আইতে কইল্যা না ক্যান? অরে কতদিন দেহি না

"কে গোপাল? কার কথা নি বলছেন?"

"ওই... যার লগে তুমি এঁ গে ফোনে কথা কইল্যা।"

"ওহ, স্যারের কথা বল ? আসতে পারবেন না। মিটিংয়ে ব্যস্ত। চলুন, আপনাদের ঘরটা আমি খুলে দিই। রেস্ট নেবেন।"

মিঠুর পিছনে পিছনে ননীবালা সেই ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল, চব্বিশ বছর আগে এক ভোরে যে ঘরটায় সব খুইয়ে ও বেরিয়ে গিয়েছিল। পালঙ্ক, আর আসবার সব একই রকম আছে। শুধু দেয়ালে নোনা ধরে গেছে। বোধহয় পরিচর্যা হয় না। অনেক দিন কেউ থাকেনি। ঘরের ঠিক বাইরে বিরাট একটা তুলসীমঞ্চ ছিল। সেটা নেই। এই শহরে তুলসীর অমর্যাদা কেউ করে না। মুখ ফসকে ও বলে ফেলল, "তুলসীমঞ্চডা এহানে ছিল। অহন নাই ক্যান মা?"

মিঠু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি জানলেন কী করে কাকিমা?"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল ননীবালা। বানিয়ে বলল, "আমার মনে হইল, তাই কইলাম। আয় রে চাঁপা। ভিতরে আয়।" বলে ও চট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হাতের পুঁটলিগুলো টেবলের উপর রেখে ও চাঁপাকে বলল, "ডাইন দিকে এট্টু গেলে কলতলা। হাত-পায়ে জল দিয়া আয় মা। কোন বিহানে বাইরইছস। অহন এট্টু গড়াইয়া নে। আইজ অনেকদূর যাইতে অইব।"

কথাটা শুনে এ বার চমকাল চাঁপা। নিচু গলায় বলল, "তুমি জানলা কী কইরা মাসি, এহানে কলতলা আসে?"

ননীবালা হাসল। তারপর বলল, "অহন কিসু কমু না। পরে শুনিস।" কথাটা বলেই ও পালঙ্কে কাত হয়ে শুলো। আজ ভোরবেলায় ওদের অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে। মাজা ধরে গেছে। শোয়ার পর ওর একটু আরাম বোধ হল। ননীবালা কোনওদিনই দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে না। এখানকার বিধবাদের ভাবার দরকারও হয় না। ওদের প্রাত্যহিক চাহিদা খুবই অল্প। কিন্তু এ বাড়িতে এসে নরম গদির উপর শুয়ে ও ভবিষ্যতের কথাই ভাবতে বসল।

নবদ্বীপে ফিরে সম্পত্তি বুঝে নিয়ে ও প্রথমেই মন্দিরটা সংস্কার করবে। আর ক'দিন পরেই ঝুলন। খুব ধুমধাম করে ও অনুষ্ঠান করবে। লোকজন খাওয়াবে। পুরনো দিনের লোকজন এখন আর আছে কী না জানে না। অবশ্যই তাদের খোঁজ খবর নেবে। ধনার মা, বলাই, আঙুরবালারা তখন কাজ করত ও বাড়িতে। এত দিন ওদের নামগুলো, আশ্চর্য, মনেই পড়েনি। আজ হুড়হুড় করে ওরা সবাই মনের মধ্যে ভিড় করে এল। স্বামী মারা যাওয়ার পর ভাসুর আর জা যখন ওকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, তখন ধনার মা-ই রোজ চুপিচুপি এসে ওকে খুব সান্ত্বনা দিত।

বিছানায় শরীরটা আলগা করে দিতেই ননীবালার ঘুম পেয়ে গেল। না, ও এখন ঘুমোবে না। জীবনের বেশির ভাগ সময়, ও কষ্টের মধ্যে কাটাল। এখন ওর সুখের দিন। টাকা পয়সা নিয়ে ও বেরিয়ে পড়বে। অনেক তীর্থে ঘুরবে। তীর্থ কথাটা মনে হওয়া মাত্র হঠাৎ ওর চোখের সামনে আচুকির মুখটা ভেসে উঠল। ননীবালা ঠিক করল, প্রথমেই তীর্থ করতে ও যাবে জগন্নাথধামে। আচুকির খোঁজে লোক লাগাবে। দেখা হলেও বলবে, 'তুই ঠিকই কইসিলি আচুকি। নবদ্বীপে আমার ডাক পড়সে।" দুঃখের দিনে ওকে একটা আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছিল আচুকি। জগন্নাথধামে দেখা হলে, ওকে জোর করে নিয়ে যাবে নবদ্বীপে। নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় দেবে।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে মিঠু আর বিমলা মাইয়ি। ননীবালা ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে। রাধাকুঞ্জে বিধবাদের রাখার ব্যবস্থা হবে। কথা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে। আর কয়েকদিন পরেই মিস্তিরি লেগে যাবে। রঙ টঙ করে ঘরগুলোর ভোলই পাল্টে দেওয়া হবে। বিমলা মাইয়ি বলল, "বিধবাদের রোজ মেডিকেল চেক আপ-এর জন্য বড় একটা ঘর চাই। বসার ঘরের ডান দিকে পরপর দুটো ঘর আছে। মাঝখানের দেওয়াল ভেঙে দিলেই সেটা হলঘরের মতো হয়ে যাবে। ডাক্তারির কিছু যন্ত্রপাতি বসানো হবে ওইখানে।

শুনে ননীবালা উঠে বসল। না, ওই ঘর ভাঙা ঠিক হবে না। সামনের দিকের ঘরটা ছিল বাবামশাইয়ের। দিনের বেলায় অনেকটা সময় উনি কাটাতেন ওখানে। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই ঘরে। মিঠুরা কি জানে, ওই ঘরে একবার রাত কাটিয়ে গেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু? ননীবালার কাছে সেই গল্পটা একদিন করেছিলেন বাবামশাই। না, না, ওদের বারণ করা দরকার। উত্তেজনায় ননীবালা পালঙ্ক থেকে নেমে এল। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই ও থেই হারিয়ে ফেলল। কী করে ও এসব কথা জানল, এই প্রশ্নটা যদি কেউ করে, তা হলে ও কী উত্তর দেবে? বিমলা মাইয়ির চোখে পড়ার আগেই ননীবালা তাই ফের ঘরের ভেতরে ঢুকে এল।

কলঘর থেকে চাঁপা ভিজে কাপড়ে বেরিয়ে এসেছে। শাড়ি লেপ্টে রয়েছে ওর শরীরে। ওর তলপেটটা উঁচু উঁচু ঠেকছে। যাতে অন্য কারও চোখে না পড়ে, সেই ভয়ে পুঁটলি থেকে তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি বের করে দিল ননীবালা। চাঁপার গল্পটা ও তৈরি করে ফেলেছে। আর তো মাত্র দু'তিনটে দিন। নবদ্বীপে পৌঁছে গেলেই চাঁপাকে ও পরিচয় করিয়ে দেবে, পালিতা মেয়ে হিসেবে। মেয়েটা বাচ্চার মা হতে চাইছে, হোক। পরে ওকে একটু আধটু লেখাপড়া শেখাবে ননীবালা। এমনভাবে তৈরি করে নেবে, যাতে একদিন বাইরের জগতে সঙ্গে ও নিজেই যুঝতে পারে।

"কহন আমরা বাইরামু মাসি?" শাড়ি পাল্টাতে পাল্টাতে প্রশ্নটা করল চাঁপা।

ননীবালা নিজেও জানে না, কখন বেরোবে। ও বলল, "কইতে পারুম না। কইল তো আইজগার মধ্যই দিল্লি যাইতে অইব। ক্যান, জানতে চাইতাছস ক্যান। খিদা পাইসে নাহি।"

চাঁপা হেসে ফেলল, "কী যে কও মাসি। অহন খাওনের টাইম নাহি। আশ্রমে তো অহন প্যাটে কিসু দিতামই না। আশ্রমে কী যে অহন হইতাসে, কে জানে? কে রানবে, কে ভাত বাইড়া দিব, কে জানে?"

হায় গোবিন্দ! আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেও নিস্তার নেই। মেয়েটা বুড়িগুলোর কথা ভাবছে। সকাল থেকে সবাই চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কখন খাবারের থালা মুখের সামনে তুলে ধরবে। সত্যিই তো, রান্নার কাজটা তা হলে আজ কে করবে? কনকমঞ্জরী? না, ওর দ্বারা সম্ভব না। মরুক গে যাক। আশ্রমের কথা ভেবে লাভ কী? ননীবালা বলল, "তর ভাবার তো দরকার নাই। তরে আর ভাত রানতে অইব না। তুই আমার মাইয়ার মতো থাকবি। কেউ জিগাইলে কইবি, মায় আমারে ছুটোবেলা থেইক্যা পালসে। কী কইতে পারবি না?"

বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল চাঁপা। বলল, "হ পারুম। মাসি, তোমার অহন অনেক ট্যাহা, না? আমারে একডা জিনিস দিবা?"

ওকে ছোট মেয়ের মতো আবদার করতে দেখে খুশি হল ননীবালা। বলল, "কী জিনিস চাইতাছস, ক।"

"একডা বেনারসী শাড়ি কিইন্যা দিবা?"

"একডা ক্যান, তরে দশডা কিইন্যা দিমু।" পালঙ্কে উঠে আধশোয়া হল ননীবালা। আমার অনেক ছিল, জানস? বিয়ার আগে শহুরমহাই আমাগো বাড়ি আইয়া কইলেন মা রে, তর জন্য দশডা বেনারসী আনসি। তর যয়ডা মন চায় রাইখ্যা দে। তহন আমি তর চেয়ে ছুটো। বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নাই। কইলাম, আমি সব কয়ডা নিমু। শহুরমহাই কইল, তাইলে রাইখ্যা দে।"

চাঁপা অবাক, "সব কয়ডা রাইখ্যা দিলা? তোমারে দিল?"

"হ। আমারে যে খুব ভালবাসত। বাড়ি গিয়া যদি দেহি সব আসে, তরে দিয়ে দিমু। খান পঁচিশ তো হইবই।"

মা আর মেয়ের মতো ওরা গল্প করতে লাগল। চাঁপার মুখে কলকল করে কথা বেরিয়ে আসছে। ওর কৌতূহল দেখে মাঝে মাঝে ননীবালা হাসছে। গরীব ঘরের মেয়ে। জীবনে কিছুই দেখেনি। রাধাকুঞ্জ নিয়েও ওর আগ্রহ। ননীবালা শেষ পর্যন্ত ওকে বলেই ফেলল, বৃন্দাবনে আসার পর কেন ওকে এই বাড়িতে আসতে হয়েছিল। নিজের সম্পর্কেও বলল, "তহন আমার গায়ের রঙ ফাইট্যা পড়ত। লুকে একবার দ্যাখলে মুখ ফিরাইতে পারত না। অহন তো কিছুই নাই। নিজেরে আমি চিনতে পারি না।"

চাঁপা বলল, তা কইও না মাসি, তোমারে অহনও সোন্দর লাগে। তুমি যেদিন আইল্যা, হেই দিন জয়ামঞ্জরী আমারে কইসিল, দ্যাখলেই মুনে হয় হয় বড় ঘরের বউ। বেহিদিন থাকব না। তাই থাইকতে দিলাম। এত দিন কই নাই। আইজ তোমারে হেই কথা কইলাম।"

ননীবালা বেশ মজা পাচ্ছে চাঁপার কথা শুনে। আরও কিছুক্ষণ গল্প করে চাঁপা ক্লান্ত। "এট্টু জিরাইয়া লই" বলে পাশ ফিরেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। সারা বাড়ি এখন নিস্তব্ধ। হঠাৎ ননীবালার খেয়াল হল, অন্যরা সব গেল কোথায়? পালঙ্ক থেকে নেমেও বাইরে বেরিয়ে এল। এ বাড়িও প্রতিটা ইট কাঠ ওর চেনা। প্রায় দিন এই সময়টায় খড়মের শব্দ তুলে বাবামশাই এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা পায়চারি করতেন। সাদা ধুতি খালি গা পৈতেটা প্রথমেই চোখ পড়ত। ননীবালা সেই সময় তামাক এগিয়ে দিত। পায়চারি করার ফাঁকে সস্নেহে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "পেটে কিছু দিয়েছ তো মা? সকাল থেকেই তো দেখছি, ঠাকুর দালানে পড়ে রয়েছ।"

সেই পিতৃস্নেহের কথা ভেবে ননীবালার মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে এল। বারান্দা পেরিয়েই ডান কোণে পাক ঘর। তখন রান্না করত বিশুর মা। কলকাতা থেকে তাকে নিয়ে এসেছিলেন বাবামশাই। সে কখনও বাড়ি গেলে রান্নার দায়িত্ব পড়ত ওর উপর। পাক ঘরের কাছে এসে ননীবালা দেখল, একটা অল্পবয়সী মেয়ে বসে রান্না করছে। ওকে দেখেই বলল, অহন খাইবেন নাহি? বাইড়া দিমু?"

ননীবালা বলল, "না, না। অহন না। তুমি ক'দিন কাম করতাস?"

"আষাঢ় মাসে ঢুকসি। আপনে বহেন।" বলে একটা টুল এগিয়ে দিল মেয়েটা। টুলে বসে পাক ঘরের চারদিকে একবার চোখ বোলাল ননীবালা। নাহ, সেই একই রকম আছে। বিরাট বিরাট বাসন। পেতল ও কাসার। দেখেই বোঝা যায়, এই রান্না ঘরে একটা সময় অনেকের জন্য রান্না হত। একবার পেতলের একটা ঘড়া নামাতে গিয়ে, সেটা পায়ে পড়ে গেছিল। কেটে রক্ত বেরিয়ে যায়। বাবামশাই হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিয়ে ছিলেন সেই ঘটনা নিয়ে। কেন বাড়ির কাজের লোক ঘড়াটা নামিয়ে দেয়নি, এই অপরাধে বাড়ি থেকে তিনি সেদিনই দূর করে দিয়েছিলেন, বংশী বলে একজনকে। ননীবালা লজ্জায় সেদিন কোনও কথা বলতে পারেনি।

চট করে সেদিনের কথাটা ওর মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে রান্নার মেয়েটা জড়সড় হয়ে বসে আছে। ননীবালা জিজ্ঞেস

করল, "রুজ কয়জনের রান্না করো?"

"দুই জন। কর্তা মা আর মাইয়া। খাওনের লুক নাই।"

"মাইয়ার বিয়া হয় নাই?"

"হা। হইসিল। বিধবা হইসে। মা আর মাইয়া দুইজনেই বিধবা। কানাই পাণ্ডা আমারে কইসে। আপনে জানেন না?"

কথাগুলো শুনে ননীবালা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এটা কি ওর সেই অভিশাপের জন্য? তা কী করে হয়? ও খুব সাধারণ মানুষ। আচুকির মতোও না। রাগের মাথায় কি বলেছিল, সেটা খেটে যাবে? সম্ভব নাকি আজকালকার দিনে? মিঠুর মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আহা রে। এত অল্পবয়সী মেয়ে। বাপের পাপ। তার জন্য মাশুল দিতে হবে ওকে? এটা ঠিক না। অদ্ভুত মমতায় ওর মনটা ভরে উঠল। কাজের মেয়েটা কী যেন জিজ্ঞেস করছে। কথাটা ওর কানেই ঢুকল না। ননীবালা উঠে মদনমোহনের মন্দিরের দিকে এগোল। নিজের উপরই এখন ওর রাগ হচ্ছে। মন্দিরে গিয়ে এখনই মদনমোহনকে ও বলবে, ঠাকুর তুমি এ কী করলে?

বাইরের ঘর দিয়ে মন্দিরে যাওয়ার সময়ই ননীবালা শুনতে পেল, সিঁড়িতে দাড়িয়ে মিঠু কার সঙ্গে যেন কথা বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে লাবণ্যপ্রভাকে ও দেখতে পেল। চাতালটা আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। মিঠুর কাঁধে এক হাত। কী যেন বোঝাচ্ছে। আরও এক পা এগোতেই মিঠুর গলা শুনতে পেল ননীবালা। রাজা কেন এল না, তা নিয়ে কথা হচ্ছে মা আর মেয়ের মধ্যে। বিমলা মাইয়ি নেই। তার মানে উনি চলেগেছেন।

মিঠু বলছে, "রাজার জন্য আর তো অপেক্ষা করতে পারব না মাম। দুপুরের দিকে একটা ট্রেন আছে দিল্লি যাওয়ার। ওই ট্রেনেই কাকিমাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। ভাবছি, এখানকার কাজ তো আমার শেষ হয়েই গেছে। দিনকতক কলকাতায় গিয়ে কাটিয়ে আসি।"

লাবণ্যপ্রভা বললেন, "রাজার সঙ্গে কথা না বলেই চলে যাবি মা?"

"এ রকম ইরেসপন্সিবল ছেলের সঙ্গে কী কথা বলব, বলো? তুমি আগ বাড়িয়ে ওকে সব জানাতে গেলে কেন? তোমার উপরও আমার রাগ হচ্ছে মাম। আমাকে ইনসাল্ট করার কোনও অধিকার ওর নেই।"

"তুই ভুল করছিস মিঠু। ওর বাড়িতে একবার ফোন কর। তোর যদি মানে লাগে, না হয় আমিই করছি। আমার মন বলছে। নিশ্চয়ই কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। না হলে যে ছেলেটা এখানে তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য আশ্রম থেকে রওনা দিল, সে কোথায় গায়েব হয়ে যাবে?"

"কিৎসু হয়নি মাম। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি। তুমি কাকিমার সঙ্গে গিয়ে কথা বলো। ওদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করো। আমার কথা ভেবো না।" রাগে বড় বড় পা ফেলে মিঠু বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল।

...ঘণ্টা দেড়েক পর মথুরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই ননীবালার চোখের কোণ হঠাৎ ভিজে উঠল। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মে যেদিন ও প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন ওদের সঙ্গে অনেক লোক। সেদিন ও তরুণী। মনে আছে, দ্বারকা পাণ্ডা এক্কা গাড়িতে করে এখান থেকে বৃন্দাবন নিয়ে গেছিল। মথুরায় তখন এত বাড়িঘর কিছুই ছিল না। চারপাশের গাছগাছালি, জঙ্গল অবাক চোখে দেখতে দেখতে ওরা ধর্মশালায় গিয়ে উঠেছিল। পঁচিশটা বছর হু হু করে কোথা দিয়ে কেটে গেল। ননীবালা টেরই পেল না।

মিঠু টিকিট কিনে এনে বলল, "কাকিমা আপনারা বেঞ্চে গিয়ে বসুন। আমি একটা ফোন করে আসছি। ট্রেন এক্টু লেট আছে। স্যার যাতে দিল্লি স্টেশনে থাকেন, আগে তার ব্যবস্থা করি। এখানে ট্রেন মিনিট পনেরোর মতো দাঁড়াবে। আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না।"

মিঠু দরদর করে ঘামছে। ওর মুখের প্রসাধন ঘামে ভিজে গেছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ননীবালার একটু খারাপ লাগল। এই ঠা ঠা রোদে বেচারার কোনও দরকার ছিল না দিল্লি যাওয়ার। ওর জন্যই এই কষ্টটা করতে হচ্ছে। ননীবালা ঘাড় নাড়ল। তারপর চাঁপাকে নিয়ে ফাঁকা একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোকজন নেই। এদিক ওদিক যারা আছে, প্রায় সবাই গরীবগুর্বো মানুষ। অলস চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ননীবালা হঠাৎ আবিষ্কার করল কার্তিক বোস্টমকে। উবু হয়ে বসে আছে। পরনে আলপি, বোরিব্রাস। পাশে একটা শত তালি দেওয়া ঝুলি। কিন্তু বোস্টম একা কেন? বোস্টমী, সে কোথায়?

উঠে গিয়ে কার্তিক বোস্টমের সামনে দাঁড়াল ননীবালা। জিজ্ঞেস করল, "দ্যাশে যান নাহি?"

উদাস চোখে বোস্টম তাকিয়ে ছিল। ওকে দেকে মুখে এক চিলতে হাসি ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপর বলল, "ইচ্ছে তো আছে। দেখি, মনের ভেতরের অচিন পাখিটা কোথায় নিয়ে যায়। আপনার সব কুশল তো মা? যান কোথায়?"

"নবদ্বীপ। শ্বশুর বাড়িতে। ডাক আইসে।"

কার্তিক বোস্টম গেয়ে উঠল, "কাল যেখানে ছিলে না গো, আজ সেখানে যাও না চলে, কৃষ্ণের রাধা গেলে মাঠে, চন্দ্রাবলী উঠবে জ্বলে।"

ননীবালা হেসে বলল, "মাতা-মারে দেহি না যে? যাইব না?"

মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল কার্তিক বোস্টমের। বলল, "না গো। রয়ে গেল। বৃন্দাবনের গোপিরা তাকে ছাড়ল না। তিন দিনের জ্বর। তাতেই শেষ। পূণ্যবতী ছিল গো। ব্রজধামে দেহ রাখল।"

কথাটা শুনে ননীবালা স্তম্ভিত। এই তো সেদিন বোস্টমীকে দেখল অখণ্ডানন্দ মন্দিরে। রসে টইটম্বুর সব সময়। কতই বা বয়স হয়েছিল? এর মধ্যেই মরে গেল! কার্তিক বোস্টম খুব ভালবাসাত বোস্টমীকে। এই দুঃখ সইবে কী করে? ও সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেল না। কার্তিক বোস্টম অনুচ্চ স্বরে গানে ধরেছে,

'প্রেম করা সই আমার হল না
পুরা বিধি আমার বাদি হল
কৃষ্ণ প্রেম হতে দিল না
প্রেম করা সই আমার হল না...
কেবল অঙ্কুর বেঁধেছিল
অঙ্কুরেই প্রেম ভেঙে গেল
যুগল পল্লব হতে দিল না
কৃষ্ণ প্রেম অমিয় ফল
এ বার মম ভাগ্যে হল না
প্রেম করা সই আমার হল না...'

গান শুনে ননীবালার চোখে জল এসে গেল। কার্তিক বোস্টমকে নমস্কার জানিয়ে বেঞ্চে ফিরে এল। কে জানে আর কোনও দিন দেখা হবে কী না? বোস্টম আবার নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে আসবে। সঙ্গে অন্য কোনও সাধিকাকে নিয়ে। কিন্তু একবার নবদ্বীপে ফিরে গেলে ননীবালার আর আসা হবে না। সত্যিই বোস্টমী ভাগ্যবতী ছিল। পারুল বুড়িও। ব্রজের রজে মিশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এমন কপাল কার হয়?

বেঞ্চে বসার সঙ্গে সঙ্গে ননীবালা আশ্চর্য সেই বাঁশির সুরটা আবার শুনতে পেল। রেল লাইনের অনতিদূরেই দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত। সুরটা সেখান থেকে ভেসে আসছে। আশপাশে তাকিয়ে ও বোঝার চেষ্টা করল, আর কেউ মোহন বাঁশি ভেসে পাচ্ছে কী না? না, ট্রেনের অপেক্ষায় যাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। বাক্স প্যাটরা নিয়ে লোকজন ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না, বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে গেছে। চাঁপার দিকে পাশ ফিরে তাকাল ননীবালা। দুটি সদ্যবিবাহিত মেয়ের দিকে হাঁ করে ও তাকিয়ে রয়েছে। চাঁপা ও্র জগতেই রয়েছে।

বুকের ভেতরটা আনন্দে কুলকুল করে উঠল ননীবালার। হঠাৎই ওর মনে হল, এও কী করছে? বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছে? গোবিন্দ মন্দিরের ওই লাল খিলান, সিঁড়ি চাতাল, বিগ্রহ, দোল পূর্ণিমার অনুষ্ঠান— সব কিছু এক পলক ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। নিবিষ্ট মনে ও মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে লাগল। বিগ্রহকে স্নান করানোর জন্য বাইরে বের করে আনা হয়েছে। সেই দুলর্ভ দৃশ্যটা আর কখনও দেখতে পাবে ননীবালা? ভজনাশ্রমের গলি দিয়ে হাঁটার সময় মন্দির থেকে ভেসে আসা কৃষ্ণ নাম কীর্তন? অথবা গোপীনাথ বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুধ জাল দেওয়া ওই সুন্দর গন্ধ, আর পাবে? রেললাইনের ওপারে ধুলোর ঝড় উঠেছে। ধান খেত আর দেখা যাচ্ছে না। ব্রজের রজ যেন আকাশ ঢেকে দিয়েছে। যমুনার ওপার থেকে ধুলোর ঝড়টা এসে আছড়ে পড়ছে এপাশে। প্ল্যাটফর্মে একপ্রান্তে একটা টিউবওয়েল। ননীবালার হঠাৎই মনে হল, আচুকি সেখানে আজলা করে জল খাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই ও হাসল। তারপর যেন ঘাড় নেড়ে মানা করল, "পাগলপন করিস না। ব্রজ মাইয়িকে ছেড়ে তু যাস না।" উত্তেজনায় ননীবালা উঠে দাঁড়াল। ও স্পষ্ট দেখল, লাল শাড়ি পরা আচুকি জল খেয়েই ঢুকে গেল ধুলোর ঝড়ে। আর ঠিক তখনই একটা দানবের মতো গজরাতে গজরাতে ট্রেনটা এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে।

ঠিক সময়েই এসে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় ননীবালা আর চাঁপাকে তুলে দিল মিঠু। জানলার ধারে ও বসে পড়েছে। ওর মুখটাও অসম্ভব গম্ভীর। আর কয়েক মিনিট পরে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। কথাটা মনে হতেই ননীবালার গলার কাছে কী যেন একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আটকে গেল। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। বুকটা খা খা করছে। ওই বিমলা মাইয়ি, সাধনা, জানুবালা, জমাদারনি, দিলীপের বউ... সবাইকে ছেড়ে ও কোথায় যাচ্ছে? ননীবালা কী করবে বুঝতে পারল না। গোবিন্দর মন্দিরটা ওকে প্রবলভাবে টানতে লাগল। ও মনে মনে প্রার্থনা করল, "ঠাকুর আমারে

ত্যাইগ কইরো না।"

হঠাৎ জানলার সামনে পরিচিত একটা গলা পেয়ে ননীবালা ফিরে তাকাল। রাজা! এ কী হয়েছে ওর! ওকে ভালভাবে দেখার জন্য আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিল ননীবালা। কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডান হাতে প্লাস্টার। হাতটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। জামায় রক্তের দাগ। ওকে ওই অবস্থায় দেখেই মিঠু দৌড়ে নীচে নেমে গেছে।দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে প্ল্যাটফর্মে। কী হয়েছে, শোনার জন্য ননীবালা জানলার সামনে উঠে এল। মিঠু থরথর করে কাঁপছে। ঘনশ্যাম পাণ্ডার সঙ্গে মারপিটের ঘটনাটা রাজা বলছে। নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল। সেখানেই বড়িদিদির মুখে ও শোনে মিঠু রাগ করে একাই ননীবালা কাকিমাকে নিয়ে মথুরায় এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে নার্সিংহোম থেকে ও পালিয়ে এসেছে।

....মিনিট পনেরো পর অ্যাম্বাসাডারে করে বৃন্দাবনের দিকে ফিরে আসছে ননীবালা। চাঁপাকে নিয়ে ও সামনের সিটে বসেছে। পিছনে মিঠুর কাঁধে মাথা দিয়ে আধশোয়া রাজা। খুব চাঁপা স্বরে কথা বলছে দু'জনে। টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছে ননীবালা।

"মাম আমাকে বলল, তুমি নাকি রাগ করে কলকাতায় যাচ্ছিলে?"

"মামের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল?"

"আমি তো তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মাম বলল, এখুনি তুমি মথুরা স্টেশনে যাও রাজা। না হলে আমার বোকা মেয়েটা জীবনে আরেকটা ভুল করে বসবে।"

"তোমার এ অবস্থার কথা মাম জানে?"

"না, বলিনি। পরে বড়িদিদি বলে দিয়েছেন কী না আমি জানি না।"

"ইস, চলে গেলে কী ভুল করতাম বলো তো? এখন স্ট্রেট নার্সিংহোমে চলো।"

"তোমার বাড়ির লোকেরা জানে?"

"আমি বলিনি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্যানিক শুরু হয়ে গেছে।"

"ঘনশ্যামের কী হলো গো?"

"নার্সিংহোমে শ্রীবাস্তব এসেছিল। এখন লকআপে। শুনলাম, প্রচণ্ড পিটিয়েছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং খবর শোনো। তোমাদের কানাই পাণ্ডাকেও পুলিশ আজ অ্যারেস্ট করেছে। যজমানদের মন্দির থেকে মূর্তি এবং অর্নামেন্টস চুরির র‍্যাকেটে থাকার জন্য। ঘনশ্যামই ওর নাম বলে দিয়েছে।"

"এ কী উঠে বসছ কেন? না, না, আমাকে জড়িয়ে থাকো। আমার শরীরের কাঁপুনিটা এখনও যায়নি। উফ, স্টেশনে তোমাকে দেখার পর আমার হার্টবিট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। সত্যি কী বোকামিই না করতাম, আজ চলে গেলে। এখান থেকে স্ট্রেট তোমায় নিয়ে যাবো নার্সিংহোমে। একবার চেক আপ করিয়ে তবে বাড়িতে।"

"তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়?"

"খুব শখ, তাই না? ভাল জিনিস পেতে গেলে যে একটু ধৈর্য্য ধরতে হয় খোকামণি। আমি কিন্তু রাজা বলে দিচ্ছি, তোমাকে আর এখানে রাখব না। কলকাতায় নিয়ে যাবো। বৃন্দাবনে এখন মাফিয়ারাজ হয়ে গেছে।"

পিছনে বসে দু'জনে কথা বলেই যাচ্ছে। ননীবালা বাইরের দিকে তাকাল। পাগলা বাবার আশ্রম এসে গেছে। আর একটু এগোলেই বৃন্দাবন। স্টেশনে কী বলে মিঠু ওকে আর চাঁপাকে ট্রেন থেকে নামিয়েছিল ননীবালার এখন আর মনে পড়ছে না। ওর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, দিন তিন চারেকের মধ্যে নড়বে না। একবার যখন ট্রেনে উঠেও ফিরে এসেছে, ননীবালা নিশ্চিত, বৃন্দাবন ছেড়ে ওকে আর যেতে হবে না। নবদ্বীপের সব সম্পত্তি ও বিক্রি করে দেবে। সেই টাকা ও বিমলা মাইয়ির হাতে তুলে দেবে। টাকাটা না হয় দশের কল্যাণেই লাগুক।

রাধাকুঞ্জে লাবণ্যপ্রভা কি একটু জায়গা দেবেন না? ওর আর ওর মেয়ে চাঁপার জন্য? নিশ্চয় দেবেন। কথাটা মনে হতেই ননীবালা নিশ্চিন্তে জপের থলি বের করল।